এত রক্ত কেন ?

মৈত্রেয়ী দেবী

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রন্থাগার
সাভার ঢাকা

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

13 SEP 198

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮৫
শ্রাবণ ১৩৯২
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
অজিতকুমার দত্ত
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

954.92 / DEE
1985

BPATC LIBRARY
Accession No. 41350
Class No. 954.92 / দেবীব্র
Source
Cost

২৫ টাকা

পরম বরেণ্যা অপরূপা অতুলনীয়া—
ইন্দিরা গান্ধীকে

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ঘটনা, ১৯৮৩ সালে লিখতে শুরু করেছি। কাজেই এর মধ্যে কিছু ভ্রম সময় তারিখের থাকতে পারে। লেখাটা কতকটা ঐতিহাসিক যদিও আমার নিজের ঐতিহাসিক রচনা লেখার অভ্যাস নেই। আমি প্রধানতই স্মৃতিচারক। অন্তত লোকে তাই বলে। কিন্তু স্মৃতি কখনই ঘটনার ফটোগ্রাফি নয়। যার স্মৃতি তার আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সেই সৃষ্টি রূপ নেয়। যেহেতু আমি কবিও তাই, সেই সব ঘটনাই আমার মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, রস আছে, বেদনা আছে।

যখন ঘটনাগুলি ঘটছিল তখনই ভেবেছি এ বিষয়ে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা লিখব। লেখা হয়নি। ভালই হয়েছে। যে দূরত্ব থেকে সত্যকে স্পষ্ট দেখা যায়— সেই দূরত্বে না গিয়ে লিখলে তার অভাবে রচনা সত্য-ভ্রষ্ট হত। তখন আমার আবেগই সত্যকে চালিত করত।

তবে এটা ঠিক হয়ত অনেক প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ হয়নি। তাছাড়া অনেকের কথাই লেখা হয়নি যা লেখবার যোগ্য ছিল। এসব ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি চেষ্টা করেছি ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ কমই করতে। কারণ একজনের করলে অন্য অনেকের করতে হবে। সে সব হয়ত আমার ঠিকমত জানা নেই। তার উপরে নাম উল্লেখ করলেই সরাসরি কিছু লেখা যায় না। ছলনার আশ্রয় নিতে হত। বইটা ভয়ে ভয়ে বের করেছি। আমাদের থেকে অনেক বেশী কাজ করেছে এ রকম প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি। তবে তাদের অভিজ্ঞতা তো তাদেরই। আমি লিখব কি করে? বইটা তাই অসম্পূর্ণ। কিন্তু অসম্পূর্ণ হলেও তখনকার একটা মোটামুটি ইতিহাস রয়ে গেল। পরবর্তী বংশধরেরা পড়ে অন্ততঃ কিছুটা জানতে পারবে যে, ভারত সরকার ও ব্যক্তিগত ভাবে ভারতীয়েরা বাংলাদেশের বেদনাকে, যন্ত্রণাকে কতখানি নিজের করে নিয়েছিল।

যে সময়ের বর্ণনা এ বইয়ের মধ্যে আছে সেই ঘটনা যার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই ফলপ্রসূ হত না, আমার জীবনের এই পরম অভিজ্ঞতার সম্পদও যাঁর দান, যার জন্য আমার শেষ জীবনের চোদ্দ বছর গৃহহারা শিশুদের নিয়ে এক অলৌকিক আনন্দে কাটাতে পারলাম—তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতার এই সামান্য চিহ্নটুকু

রাখলাম। তিনি খেলাঘরে আসতে চেয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তা ঘটেনি। তাই তাঁর শেষ চিঠিটি এখানে দেওয়া হল।

प्रधान मंत्री भवन
PRIME MINISTER'S HOUSE
NEW DELHI
In flight
Nagpur-Delhi
September 13, 1984

Dear Maitreyi devi

Your letter of the 19th January has been with me all these months. I did not write earlier as it did not seem to need a reply. But as I have come across it again, I thought I should use the opportunity to send my good wishes to you and to your little "Santiniketan".

With regards

Indira Gandhi

Smt. Maitraye Devi,

সব শেষে জানাই যে আমার পক্ষে এই বই লিখে ওঠা কখনই সম্ভব হত না যদি না আমার স্নেহাস্পদ ভাই অংশুপাতি দাশগুপ্ত ও কল্যাণীয়া আরতি সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। শ্রীমান শতদলের সাহায্যও ভোলবার নয়।

মৈত্রেয়ী দেবী

এত রক্ত কেন ?

যুদ্ধের পূর্বে যশোরে আওয়ামী লীগের মিছিল

বয়রার পথ দিয়ে শরণার্থীরা আসছে

১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবিরের পাশে শিশুর মৃতদেহ

বাংলাদেশে খেলাঘর

মুজিবর রহমান ও লেখিকা

কাউনসিল ফর প্রমোশন অফ কমিউন্যাল হারমনির সভায়
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে লেখিকা—১৯৬৫

এত রক্ত কেন ?

অনেক দিন ধরে ভাবছি ১৯৭১ সাল অর্থাৎ যে বছর বাংলা দেশের জন্ম হল সেই বছরের অভিজ্ঞতার বিষয়ে কিছু লিখব। সেই অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র, এত অকল্পনীয়, বিশেষত আমাদের মতন ঘরোয়া গিন্নী-বান্নী মহিলার কাছে তার আস্বাদ এত অভূতপূর্ব যে ভাল করে প্রকাশ করতে পারব কিনা সে সন্দেহ আছে। অনেক দিন তো হয়ে গেল, স্মৃতি ফিকে হয় নি, অনুভূতির গাঢ়তা কমে এসেছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ সম্বন্ধে কলম ধরতে ভয় করে। কোথায় কাকে আঘাত দিয়ে ফেলব। কিংবা কেউ বলবেন এসব বাজে কথা, এমনটি ঘটেই নি। কলম ধরার আরও একটা ভয় আছে। একজনের সারা জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতা কাগজের পাতায় তুলে ধরলেই তা' খুদে খুদে অনভিজ্ঞ সমালোচকদের কলমের ধার পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়।

একজনের অভিজ্ঞতার সত্য অন্যের কাছে অলীক বস্তু। নিজের সীমার বাইরের কথা আমরা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখি। শুধু সন্দেহ হলে ক্ষতি ছিল না, অনেক অর্বাচীন সমালোচক সন্দেহের সঙ্গে কটূক্তিও জুড়ে দেন। বিষয়টি জানেন না বলেই তাঁরা নিরঙ্কুশ ভাবে মন্তব্য করতে পারেন। এই সম্বন্ধে 'স্বর্গের কাছাকাছি' বইটা লিখে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি বলতে পারতেন, কখন কি ভাবতেন, সে সম্বন্ধে যাঁদের কোন ধারণাই নেই বা থাকতে পারে না, তাঁদের কলমই দেখছি সবচেয়ে ধারালো।

আমি জানি এ চাপল্য গ্রাহ্য করা উচিত নয়। তবু মানুষকে মূল্য দিই বলে ভাবি, যে কেন অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝবার বা জানবার ইচ্ছা হয় না। বরং কলম হাতে পেলেই কেন অবিশ্বাসের কালি বেরিয়ে আসে, কেনই বা খোঁচা মারবার ইচ্ছা হয়।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে বই লেখা অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস লেখা। আর সেই সময়ে সেই কাজের সঙ্গে আমাদের কতখানি একাত্মতা ঘটেছিল সে কাহিনী লিখতেই আমি কলম ধরেছি। সে কথাই এখানে প্রধান তবু আমাকে শুরু করতে হবে আরো কিছুটা আগে থেকে।

দেশ ভাগ হবার পর থেকে দুই বাংলায় কোন দিন পূর্ণ শান্তি আসেনি। তার কারণ পূর্ববঙ্গে এক কোটি হিন্দু এবং ভারতে পাঁচ কোটি মুসলমান

রয়ে গিয়েছিল। ফলে ক্রমাগত দাঙ্গা ও শরণার্থীর অনুপ্রবেশ অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। তিক্ততার অবসান হচ্ছিলই না। এই উপমহাদেশে বরাবরই মুসলমানদের ধারণা হিন্দুরা কুসংস্কারী, সাম্প্রদায়িক ও ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী। আর হিন্দুদের ধারণা মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক তা বটেই, ধর্মীয় অন্ধতায় ভরা এবং সর্বদা সুযোগ খুঁজছে কি করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবে। এসব অভিযোগের মধ্যে কিছু সত্য হয়ত আছে তবু আর একটা দ্বিতীয় স্তর আছে যেখানে উভয় সম্প্রদায়ই মানুষ। সে কথা উত্তেজনার সময় কারো মনে পড়ে না। দাঙ্গার সময় উভয় পক্ষের কাগজ পড়লে একেবারে ভিন্ন রকম চিত্র পাওয়া যায়। ভয়ে ভয়েই বলছি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার ব্যাপারে পত্র পত্রিকার ভূমিকা যারা লাঠি হাতে নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করছে তাদের চেয়েও অনেক গুণ বেশী। দেশ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও এ রোগের ধ্বংস হল না।

বাংলা দেশের জন্মকথা লিখতে গেলে এই উপমহাদেশের পুরনো ইতিহাস একটু বিশদ করে লিখবার দরকার আছে। যদিও এ সব কথা অনেকের জানা তবু নতুন প্রজন্মের কাছে অপরিচিত।

দেশ ভাগ করার কারণ রূপে বলা হয়েছিল যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই জাতি। অর্থাৎ **Two Nations**। জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা বা মুসলমানরা এই দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি কোন দিনও। যারা এই দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল তারা ধর্মান্ধ বা ধর্মভীরু মুসলমান নয়। জিন্নাহ্‌র মত, সুরাবর্দীর মত ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান। জিন্নাহ তো মুসলমান ধর্মের কোন নিয়মই পালন করতেন না। ধর্ম নিয়ে জাতিত্ব নির্দেশ তাই ধর্মের জন্য হয়নি, হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট নই তাদের মনে ক্রমাগত বিদ্বেষ ভাব খুঁচিয়ে তুলেই জনসাধারণকে পরস্পরের শত্রু করে তোলা হয়েছিল। দেশ ভাগটা তত বিপজ্জনক হত না যদি না এই বিদ্বেষের বিষবাষ্পে ভারত ও পাকিস্তানের আকাশ বাতাস ভরে যেত। সবই ভাগ হিন্দু ভাবে যে সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানের সৃষ্টি। অপরদিকে মুসলমানরা ভাবে এর জন্য দায়ী হিন্দুরাই। কয়েক বছর অন্তরই একটা না একটা অজুহাতে দাঙ্গা লাগে পূর্ব পাকিস্তানে। দলে দলে শরণার্থী ভারত ভূমিতে প্রবেশ করে এবং প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। স্বাধীনতার পরে এরকম একটা বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল ১৯৫০ সালে। হাজার হাজার শরণার্থী এসে কলকাতার উপকণ্ঠে অন্যের জমি দখল করে বসবাস শুরু করে। টালিগঞ্জের অশোক এ্যাভিনিউ, বাঙ্গুরের জনবসতি ছিল কম, ভীড় নেই, প্রায় গ্রাম বললেই চলে। সেখানে বহু মুসলমান

চাষী দীর্ঘ দিন ধরে চাষবাস করছে। তাদের পুকুর বাগান তছনছ হয়ে গেল। শরণার্থীরা জাল ফেলে, মাছ তুলে নিজেরা নিজেদের কাছে বিক্রি করত, ক্ষেতের শশা, মূলো, কলা ইত্যাদি সবই অসময়ে অপক্ক অবস্থায় উৎপাটিত হতে লাগল। আমি তখন অশোক এ্যাভিনিউর পিছনে একটি আমবাগানে বাড়ি করাচ্ছিলাম। আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে এখানেও যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। তখন বুঝতে পারলাম লোভে পড়লে, সুযোগ পেলে পরের জিনিসপত্র, পরের জমি দখল করতে পারলে অর্থাৎ দস্যু বৃত্তি নির্বিঘ্ন হলে সব মানুষই একরকম ব্যবহার করবে। এর মধ্যে ধর্মের কারণে ভেদাভেদ হবে না, মানুষ তার দোষ-গুণ নিয়ে অন্তরে একই, তা তার ধর্ম যাই হোক। প্রত্যক্ষ দেখে এ কথাটা সেদিন যত স্পষ্ট ভাবে বুঝেছিলাম অনেক সেমিনার ও লেকচার শুনেও তা হতে পারত না।

১৯৫০ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামতেই চায় না। শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা এক দিক থেকে মানুষের জঘন্যতম নীচতার দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে চূড়ান্ত মহত্বের। একজন ইংরেজ তাঁর মুসলমান চাপরাশীকে বাঁচাতে গিয়ে জনতার হাতে নিহত হলেন। কোনও একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে গাড়ি থেকে সাহেবের খানসামাকে দাঙ্গাকারীরা টেনে বের করে যখন মারতে থাকে তখন তিনি তাকে রক্ষা করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং নিহত হন। যে দাঙ্গা দীর্ঘদিন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলছিল এইবারে তার ওপর ঠাণ্ডা জল পড়ল। সরকারের টনক নড়ল। অর্থাৎ পুলিসকে কর্তব্যে প্রণোদিত করা হল। একজন বিদেশী, বিশেষ করে ইউরোপীয়ান এভাবে নিহত হয়েছেন সেটা এ দেশের শাসনতন্ত্রের পক্ষে লজ্জার কথা। যে দেশেই হোক দাঙ্গা যখন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এবং কিছুতেই থামতে চায় না তখন ধরেই নিতে হবে যে পুলিস নিষ্ক্রিয় হয়েছে। কারণ দাঙ্গার সময় স্বভাবতই পুলিসরাও হিন্দু ও মুসলমান হয়ে যায়। ফলে কর্তব্য করা আর হয়ে ওঠে না। আমাকে একজন বয়স্ক ওসি বলেছিলেন, "একদল মুসলমান এসে বলল, ঐ ছেলেগুলোকে arrest করুন ওরা মসজিদে প্রস্রাব করেছে, মসজিদ অপবিত্র করেছে। আমি বললুম, তাতে হয়েছে কি বাপু, তোমাদের ঈশ্বর তো মসজিদে বাস করেন না, তার তো মূর্তিই নেই, তিনি তো সর্বত্রই আছেন—তা তোমাদের মসজিদই বা কি আর পায়খানাই বা কি।"

১৯৬৪ সালে আবার একটা দাঙ্গা বাধল। কাশ্মীরে হজরৎ মহম্মদের একগাছা চুল একটা মসজিদে রাখা আছে। হজরৎ বালের মসজিদ। শ্রীনগর

যাওয়ার পথে এই পুণ্য স্থানটির খ্যাতি খুব। হঠাৎ একদিন খবর বেরুলো মহম্মদের মাথায় ঐ কেশটি স্বস্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। অর্থাৎ চুরি গেছে। কিছুদিন ধরে কাগজে পত্রে গবেষণা চলল যে কে বা কারা এই দুষ্কীর্তি করেছে। ক্রমেই উত্তেজনা বাড়তে লাগল। মুসলমানদের বিশ্বাস হল যে কোন হিন্দুই নিশ্চয় হজরৎ মহম্মদকে অপমান করবার জন্য এবং সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি ঘৃণা দেখাবার জন্য এই কাণ্ডটি করেছে।

যত দূর শুনেছি খুলনাতে একজন তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (সবুর খাঁ) এই দাঙ্গা লাগাবার জন্য দায়ী। ঘটনাটা এই : কিছুকাল পূর্বে তিনি একজন হিন্দুর প্রভূত জমিজমা আত্মসাৎ করেছিলেন। পরে আইয়ুব খাঁর রাজত্বে এলে মিলিটারী শাসনের নিরপেক্ষতা বোঝাতে তিনি নাকি বলেছিলেন কোন হিন্দুর জমি বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া হলে ফিরিয়ে দিতে হবে। অতএব সবুর খাঁকেও তাই করতে হয়েছিলো। তাতে মনে বড় ব্যথা লেগেছিল। জোর করে নেওয়া হিন্দুর জমি, তাও আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। এইবার তিনি সুযোগ পেলেন হজরতের একটি চুলের জন্য লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবার। সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় জুটমিল থেকে যখন দলে দলে শ্রমিক বেরিয়ে আসছে তখন তাদের সামনে তিনি একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। অর্থাৎ হনুমানের লেজে মশাল বেঁধে দিলেন—হিন্দুরাই যে হজরতের চুলটি নষ্ট করেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। মুসলমান জনতা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আশেপাশের হিন্দু বসতির ওপর। শুরু হয়ে গেল এক প্রলয়ঙ্করী দাঙ্গা। একে কিন্তু দাঙ্গা বলে না। এখানে দু'পক্ষ নেই। সংখ্যাগুরু যখন সংখ্যালঘুর ওপর আক্রমণ চালায় তখন তা একতরফা খুন মাত্র। এ দাঙ্গা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঢাকাতে তা' ভয়ঙ্কর রূপ নিল, আর তার চেয়ে ভয়ংকরতর কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের কাগজে কাগজে পল্লবিত হতে লাগল।

দাঙ্গা ও গুজব একসঙ্গে বাড়ে। ১৯৬৪ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন গড়িয়াহাটার মোড়ে গাড়ি আটকেছে, হঠাৎ দেখা একজন পরিচিতা মহিলার সঙ্গে। তিনি উচ্চশিক্ষিতা এবং কমিউনিস্ট বাড়ির মেয়ে তো বটেই, নিজেও কমিউনিস্ট। তিনি গাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বললেন—"আজকের খবর শুনেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ট্রেন এসেছে, তা রক্তে ভাসছে, (ধরেই নেওয়া হয়েছে তা মানুষের রক্ত) আরমাছের ঝুড়ি খুলে দেখা গেছে শুধু মানুষের মাথা, মাছ নেই, ঝুড়ি ঝুড়ি মানুষের মাথা।" আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞাসা করলাম এরকম ভাবে নিজেদের অপরাধের চিহ্ন পাঠাবে কেন, কি লাভ? তারপরে যে প্রশ্নগুলি আমার মনে এলো সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে সচেতন থাকলে গুজব আগুনের মত ছড়াতে পারে না। প্রশ্নগুলি এই—"আপনি একথা জানলেন কি করে? নিজের চোখে দেখেছেন কি? কিংবা যে দেখেছে এমন লোক আপনাকে বলেছে কি?" কিন্তু কোন গুজব কখনও কেউ দেখে না। ঠিক যেমন ভূত কেউ কখনও দেখে না। অথচ ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করলে ভূত-বিশ্বাসী রেগে যায়। তেমনই গুজবে সন্দেহ করলে গুজব-বিশ্বাসী রেগে যায়। গুজব কখনও কেউ দেখে না, সবাই শোনে এবং যার কাছ থেকে শোনে সেও আরও কারো কাছ থেকে শুনেছে। এইভাবে গুজবের লেলিহান শিখা ডাল থেকে ডালে অর্থাৎ জিভ থেকে জিভে লাফিয়ে লাফিয়ে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার কাছে এবং আমাদের মতো অনেকের কাছে বাংলা দেশের কাহিনী এই সময় থেকে শুরু। তার আগে বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। এবং দেশভাগের কলঙ্কে কলঙ্কিত। বার বার পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আসছে এবং এসে তারা ভয়াবহ গল্পকাহিনী বলছে। এ দেশে আসবার জন্য তারা এত ব্যস্ত, ওদের সম্বন্ধে তাদের মন এত বিমুখ যে তাদের কাছ থেকে কোন দিনই আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে যে একটা "মেটামরফসিস" চলেছে, একটা সমূহ পরিবর্তনের বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে এ খবর বিশেষ পাইনি। দু'একজন যদি বলেও থাকে তা অন্যদের নিন্দাকোলাহলে একেবারেই ডুবে গেছে। অথচ আজকে আমরা সবাই জানি যে দেশ ভাগ হবার অব্যবহিত পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। এবং পরে ভাষা-আন্দোলন নামে যে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সূত্রপাত হয় পাকিস্তানের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই।

অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে ভারতীয় জনসাধারণের আর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। দেশভাগের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সকলেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে দফায় দফায় শরণার্থী এসে জমি দখল করে নিচ্ছে। শেয়ালদায় এসে পড়ে থাকছে হাজার হাজার নরনারী। বালকবালিকারা কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মানুষ উত্তেজিত হয়েছে বারবার। ফলে সমস্ত দায় ও দোষ পড়েছে পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর। তার মধ্যে কতটা সরকারের দায়িত্ব কতটাই বা সাধারণ

জিজ্ঞাসা করলাম এরকম ভাবে নিজেদের অপরাধের চিহ্ন পাঠাবে কেন, কি লাভ? তারপরে যে প্রশ্নগুলি আমার মনে এলো সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে সচেতন থাকলে গুজব আগুনের মত ছড়াতে পারে না। প্রশ্নগুলি এই—"আপনি একথা জানলেন কি করে? নিজের চোখে দেখেছেন কি? কিংবা যে দেখেছে এমন লোক আপনাকে বলেছে কি?" কিন্তু কোন গুজব কখনও কেউ দেখে না। ঠিক যেমন ভূত কেউ কখনও দেখে না। অথচ ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করলে ভূত-বিশ্বাসী রেগে যায়। তেমনই গুজবে সন্দেহ করলে গুজব-বিশ্বাসী রেগে যায়। গুজব কখনও কেউ দেখে না, সবাই শোনে এবং যার কাছ থেকে শোনে সেও আরও কারো কাছ থেকে শুনেছে। এইভাবে গুজবের লেলিহান শিখা ডাল থেকে ডালে অর্থাৎ জিভ থেকে জিভে লাফিয়ে লাফিয়ে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার কাছে এবং আমাদের মতো অনেকের কাছে বাংলা দেশের কাহিনী এই সময় থেকে শুরু। তার আগে বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। এবং দেশভাগের কলঙ্কে কলঙ্কিত। বার বার পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আসছে এবং এসে তারা ভয়াবহ গল্পকাহিনী বলছে। এ দেশে আসবার জন্য তারা এত ব্যস্ত, ওদের সম্বন্ধে তাদের মন এত বিমুখ যে তাদের কাছ থেকে কোন দিনই আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে যে একটা "মেটামরফসিস" চলেছে, একটা সমূহ পরিবর্তনের বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে এ খবর বিশেষ পাইনি। দু'একজন যদি বলেও থাকে তা অন্যদের নিন্দাকোলাহলে একেবারেই ডুবে গেছে। অথচ আজকে আমরা সবাই জানি যে দেশ ভাগ হবার অব্যবহিত পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। এবং পরে ভাষা-আন্দোলন নামে যে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সূত্রপাত হয় পাকিস্তানের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই।

অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে ভারতীয় জনসাধারণের আর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। দেশভাগের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সকলেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে দফায় দফায় শরণার্থী এসে জমি দখল করে নিচ্ছে। শেয়ালদায় এসে পড়ে থাকছে হাজার হাজার নরনারী। বালকবালিকারা কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মানুষ উত্তেজিত হয়েছে বারবার। ফলে সমস্ত দায় ও দোষ পড়েছে পাকিস্তানের জনসাধারণের ওপর। তার মধ্যে কতটা সরকারের দায়িত্ব কতটাই বা সাধারণ

গেল। আমি নিরুপায় ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম, ঘন কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আকাশের পবিত্র নীলকে মানুষের দুষ্কৃতির কলঙ্কে কালো করে দিচ্ছে। সাদা মেঘের উপর ধোঁয়ার কালো ঢাকনা আমাকে একটা দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিল। আমি ভাবতে লাগলাম যেদিন আমার ছোট বাড়িটায় আগুন লাগল. শামসের সেই জ্বলন্ত বাড়িটায় ঢুকে অনেক জিনিসপত্র বাঁচিয়েছিলো। জিনিসপত্রর জন্য অতটা ঝুঁকি নেবার প্রয়োজনই ছিল না। তবুও সে নিয়েছিল। সেই বিশ্বস্ত মানুষটির প্রাণের জন্য আজ আমি কোন ঝুঁকিই নিতে পারলাম না। দুঃখটা আমাকে খুঁচিয়ে তুলল। সারা রাত ধরে মনে হতে লাগল কিছু করতে হবে, কিছু করতে হবে। কিন্তু করব কি? কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয় না, কারফিউ। আত্মীয়স্বজনেরা এ পাড়া ছেড়ে হিন্দু পাড়ায় যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। কারণ খবরের কাগজ পড়ে তারা ধরেই নিয়েছে যে দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা হচ্ছে। যারা অন্য পাড়ায় থাকে তাদের বোঝানোই দায় এখানেও দাঙ্গাকারী তারাই, পুলিস যাদের স্বপক্ষে।

ইতিমধ্যে দেখি কিছু পাঞ্জাবী ট্রাক নিয়ে নিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকছে ও জিনিষপত্র বোঝাই করে বোরখা ঢাকা নারী ও রোরুদ্যমান শিশুদের সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এদের ওপারে পাঠিয়ে দেবে। এই সব দৃশ্য দেখে দাঙ্গার চরিত্র ও শরণার্থীর অনুপ্রবেশের সমস্ত আকৃতিপ্রকৃতি আমার কাছে প্রতি-মুহূর্তে যেমন স্পষ্ট হচ্ছিল এমন পূর্বে হয়নি। আমি বুঝতে পারলাম এই রকম সব উন্মাদনার মুহূর্তে কিছু মানুষ পাগল হয়। আর কিছু আরো চালাক হয়ে ওঠে। তারা সুযোগ নেয়। কোন কিছু বুঝতে পারাই একটা প্রেরণা। সেদিন সে প্রেরণা পেয়েছিলাম। দিন রাত্রি ক্রমাগত ছাদে পায়চারী করতে করতে কেবল ভাবছিলাম যে কাজে মহা মহা শক্তিধর মানুষরা বিফল হয়েছেন সেখানে আমাদের মত সামান্য মানুষ কিই বা করতে পারে? পাশাপাশি ছাদে অনেকে পায়চারী করছি। সকলেই শঙ্কিত। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ডাকলেন, "কি করবেন ভাবছেন? ওরা কি আক্রমণ করবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কারা?"

"তাইতো, কারা কি করবে বলা শক্ত।"

এই সময় একদিন শেষ রাত্রে হই হই চিৎকার শুনে নিচে নেমে দেখি আমাদের পাড়ার থেকে দলে দলে মুসলমান লাঠি নিয়ে ছুটেছে। তার মধ্যে আমাদের পুরনো রাজমিস্ত্রী করিমকে দেখলাম। "ও করিম, যাচ্ছ কোথায়?"

"ও পাড়ায় ঘাসবাগান বস্তি আক্রমণ করেছে, তাই যাচ্ছি।"

"তোমরা গিয়ে কি করবে ? এ পাড়ায় বিপদ ডেকে আনবে ?" সে বলল, "তাই কি হয় ? ওরা মার খবে, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ?" এই বলে সে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই দেখি একটা ছোট্ট সাত আট বছরের ছেলে —"নানা কোথায়, নানা কোথায় ?"—বলে দৌড়ে আসছে। চারিদিকে দেখছে। নানাকে না দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তার চোখের ভয় আর আতঙ্ক একটা ছুরির ফলার মত আমার অন্তস্তলে ঢুকে গেলো। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে কোলাহল শুনতে লাগলাম। ভোরের আকাশ বিদীর্ণ করে তেজস্বী সূর্যোদয় হল। সেদিন আমার আরেক দিনের কথা মনে পড়ল। একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, তার পরিবারের অনেকগুলি লোক ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গে নিহত হয়েছিল। সে যখন বিদেশ থেকে গিয়ে পৌঁছয়, দেখে তার বাড়ি ভাঙা এবং পোড়া, কেউ কোথাও নেই। শুধু দোতলার বারান্দা থেকে একটা শাড়ি ঝুলছে। সে প্রিয় পরিচিত শাড়িটাকে দেখে ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। লাল শাড়ী দূর থেকে কিছু বুঝতে পারেনি। কাছে গিয়ে দেখে তার নিচে মাটিতে রক্ত জমাট হয়ে আছে। এ কথা মনে পড়ায়ও করিমের নাতিকে দেখে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সে কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

আমরা বিজয়ী হব কি না ভাবি নি তা—
দেখেছি পতিত লাঞ্ছিত অপহৃতা—
দেখেছি আগুন, পাবক বলি না তারে
বহু কৃষ্ণবর্ত্ম এঁকেছে অন্ধকারে।
ছোট্ট ছেলেটি দেখছি গলির পাশে—
আবছা দৃষ্টি কাঁপছে অজানা ত্রাসে
মৃত্যুর চেয়ে দণ্ড এ মৃত্যুর
করাল শঙ্কা আরো বেশি নিষ্ঠুর।
মৃত্যুর কোন জাতি নেই জানি আমি
প্রাণের চেয়েও মুক্ত সর্বগামী—
প্রেমের চেয়েও ব্রাত্য, বন্ধছেঁড়া—
চির চলমান নির্গ্রন্থের সেরা।

সেই মৃত্যুও হয়েছে কলঙ্কিত
বিকৃতবদন জিঘাংসা নির্জীত

লোলুপের হাতে ছিন্নমস্তা তার
রুধিরে লিপ্ত লজ্জিত এ আঁধার
এ পূর্ণিমার গ্রা সিত চন্দ্র রাহু
প্রমথর মত পেয়েছে প্রেতের আয়ু।

তবু যারা বলে জ্যোতির কক্ষ পথও
আবর্তনের যে শর্ত সম্মত
নির্গত হবে একদা ঊষার দিকে
প্রগাঢ় কালিমা একদিন হবে ফিকে
তাদের কথায় স্থির রেখে বিশ্বাস,
দেখছি সামনে উঠছে নাভিশ্বাস
তবুও মনকে দিচ্ছি অনেক স্তোক
এ সত্য নয় ভাবছি যা দেখে চোখ।

আশাবাদী মন ভাবছি হবেই জয়ী
যা বলে বলুক ঘরপোড়া সংশয়ী
চক্র ঘুরছে তবুও পদ্ম ফোটে
পাই বা না পাই ভাগ্যে জোটে না জোটে।

২

বেশ কয়েকদিন এইভাবে কাটল। অন্তত আট-দশ দিন। মনে হয় দেশে যেন সরকার নেই। শ্রীমতী পদ্মজারও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় গুলজারীলাল নন্দ, তখন যিনি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি দাঙ্গা থামাতে এলেন এবং প্লেন থেকে নেমেই ঘোষণা করলেন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাঙ্গা থামাবেনই। কথাটা আমাদের কাছে দর্পের মত মনে হয়েছিল। কিন্তু যা বললেন তাই করলেন। যে আগুন আট-দশ দিন ধরে জ্বলছিল তা সেদিনই নিভে গেল। আমরা দেখলাম, কৃতসংকল্প হলে কত সহজে কাজ সফল হয়। যা অসাধ্য মনে হয়েছিল তা অসাধ্য ছিল না। ছিল দমন করবার ইচ্ছার অভাব। আগুন তো নিভে গেলো, কিন্তু অঙ্গার রয়ে গেল, সে মানুষের মনে। সর্বদাই এই হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে গেলেও মন থেকে তা' মুছে যায় না।

তিক্ততার স্বাদ রেখে যায়। সিয়া সুন্নির ব্যাপার কবে ঘটেছিলো, আজও সে বিরোধ সম্পূর্ণ যায়নি। বংশপরম্পরা ক্রমে ক্রোধ যেন অনির্বাণ হয়ে রয়ে গেছে, আর সেই স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার জন্যই মহরমের বিষাদ উৎসব। হিন্দু মুসলমানের ব্যাপারটাও তাই।

খবরের কাগজে প্রতিদিন কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা সম্বন্ধে যা খবর বেরুচ্ছিল তা একেবারেই ভিত্তিহীন, আন্দাজে লেখা দীর্ঘদিনের মনগড়া চিন্তাই তার মূল। তখনই বুঝতে পারলাম দাঙ্গা বাধতে পারে না যদি না গুজব ও সংবাদপত্র সাধারণ মানুষের মনকে মিথ্যার জঞ্জাল দিয়ে ঢেকে দেয়। শান্তির পথ সুগম করবার প্রধান উপায়—জনসাধারণের মনে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। দাঙ্গা, যুদ্ধ বা যে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যেই ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই প্রকাশ হয়। সে সময়ে দেখলাম ভাল দিকটার কথা কেউ বলতেই চায় না। ক'জনকে মারা হয়েছে তার ফলাও রিপোর্ট প্রকাশ হয়, কিন্তু ক'জনের প্রাণ বাঁচানো হয়েছে তা কেউ লেখে না।

অসাধারণ মানুষরা, নেতারা অনেক চেষ্টা করেছেন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে। আমরা তাদের বিফল করেছি। এবার আমরা সাধারণ মানুষরা একটু চেষ্টা করে দেখি না কেন? গুলজারীলাল নন্দ যেদিন কলকাতায় পৌঁছলেন সেই দিনই ডাক দিলেন সমস্ত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় রাইটার্স বিল্ডিংএ মিটিং। ইতিমধ্যে উমা ও চিন্মোহন সেহানবীশদের সঙ্গে কথা হয়েছে। চিন্মোহন কারফিউ পাস নিয়েএলেন। আমরা তিনজনে রাইটার্সের অভিমুখে রওনা হলাম। আর কে কে সঙ্গে ছিলেন মনে করতে পারছি না। অমিয় গুপ্ত আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সম্ভবত সেদিন তাঁর গাড়িতেই গিয়েছিলাম। রাইটার্সে পৌঁছে দেখি প্রচণ্ড ভীড়। এত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে তবে এমন সব কাণ্ড বারবার ঘটে কেন? সেখানে দেখলাম রেণু চক্রবর্তীকে, সত্যেন মৈত্রকে। সব রাজনৈতিক দলের লোকেরাই ছিলেন। এঁদের এত কেডার, এত শক্তি-সামর্থ্য। এঁরা এতদিন করছিলেন কি? রেণু চক্রবর্তী ও সত্যেন মৈত্রের কথা বিশেষ করে মনে আছে। কারণ রেণু চক্রবর্তীর স্বামী সেই সময় "Mainstream" নামে একখানা কাগজ বের করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজে সারা ভারতে একটি বিশেষ আদর্শ স্থাপন করেন। ঐ পত্রিকা উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। আর সত্যেন মৈত্র আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদীন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেদিন রাইটার্সে ভিড়ের ঠেলায় নন্দজীর সঙ্গে দেখা করা বা কথাবার্তা

বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমি পরে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে যোগা-যোগ করেছিলাম এবং খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম।

আমি স্থির করলাম আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম করতে হবে। যেখান থেকে সব দলের সব মতের লোকেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলবে। কংগ্রেস নন কমিউনাল, সমস্ত বিভিন্ন কমিউনিষ্টমতাবলম্বী দলগুলিও নন কমিউনাল। তবে এত বড় বড় দাঙ্গা মাঝে মাঝে হচ্ছে কেন, করাচ্ছে কে, কি স্বার্থে? এই-গুলো অনুসন্ধান করতে হবে। সবাইকে ডাকতে হবে। কোন একটি বিশেষ দল এ কাজ করতে পারবে না। আমরা তাই রাজনৈতিক ভাবে নির্দলীয় হয়ে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বলব। নির্দলীয় অর্থ যেখানে সব দলকেই ডাকা হবে। এই সংগঠনের প্রস্তুতির জন্য একটি মেমোরেণ্ডাম লিখে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলাম। অমিয় গুপ্ত, আমি ও আমার স্বামী মনো-মোহন সেন। ঐ স্মারকলিপিটিতে আমাদের কর্মপন্থার বিবরণ ছিল। আমরা ভাবছিলাম দুই সম্প্রদায় যারা পাশাপাশি আজন্ম বাস করেও পরস্পরের প্রতি উদাসীন বীতরাগ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন, কি ভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করা যায়।

আমাদের প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য। দ্বিতীয় সত্যজিৎ রায়। লেখাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে সত্যজিৎ ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন, প্রশ্নটা—"Do you know what you are up against?" আমি চমকে গেলাম। সত্যিই জানি না কি পরিণাম হতে পারে। ইতিমধ্যে অনেকেই সই করেননি, এমনকি খুব প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও অনেকে সই করেন-নি। অনেকে বলেছেন, "এসব করে কি হবে, পাকিস্তানে বন্ধ না হলে এখানে বন্ধ হবে না। এতে তো শুধু অযথা আমাদের ছেলেদের ওপর দোষারোপ করা হবে।" ক্ষুণ্ণ মনে হাত বাড়িয়ে দিলাম—"দিয়ে দিন কাগজটা। আপনার কি ভয় করছে? আপনি কি সই করবেন না?"

সত্যজিৎ হেসে বললেন, "ভয় করছে বইকি, যে কোন মুহূর্তে এসে আমার ফিল্ম-টিল্ম সব জ্বালিয়ে দিতে পারে। তবে আপনাদের যখন ভয় করছে না তখন আমি সই করব।" আমাদের সেই সই করানোর অভিযানটি মনের পাতায় স্থায়ী অক্ষরে লেখা আছে। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান প্রগতিশীল স্ত্রী পুরুষ এই প্রচেষ্টাকে হাস্যকর, মুর্খতা বলে মনে করলেন। কেউ বা বললেন ভারতবর্ষে তো সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দুদের মধ্যে তো সঙ্কীর্ণতা নেই। এই ছিলো বেশীর ভাগেরই অভিমত। এই রকম অজ্ঞতার জন্যেই আজ দেশে

সাম্প্রদায়িকতার বিচিত্র আকৃতি দেখতে পাচ্ছি। প্রাদেশিকতা হচ্ছে তার কুৎসিৎতম রূপ। আমাদের তখন ধারণা স্পষ্ট ছিল না সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের রক্তে কিরকমভাবে মিশে রয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছিল হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য পরস্পর থেকে দূরে থাকে বলেই তাদের মধ্যে অপরিচয়ের বেড়া তৈরী হয়। সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়।

কিন্তু পাশাপাশি বাস করেও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত বিদ্বেষ যে কোন সময় বিকট মূর্তি ধারণ করতে পারে। তার কত পরিচয়ই তো পাওয়া গেলো এবং যাচ্ছে। হয়ত যতই বিদ্যাবুদ্ধি বিজ্ঞানচর্চা বাড়ুক না কেন কোন দিনই আমাদের নৈতিক সত্তা এই ক্ষুদ্রতার উপরে উঠতে পারবে না। আমরা চেষ্টা করছিলাম সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি দিয়ে যথাসাধ্য সম্প্রদায়িকতার বিপদ মানুষকে বোঝাতে। যদি না রাজনৈতিক উস্কানি থাকে তবে বুঝতে দেরী হয় না। উন্মত্ত দাঙ্গার মধ্যেও মানুষের বিবেককে কাজ করতে দেখেছি ও শুনেছি। এ সম্বন্ধে আমার বন্ধু শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী যিনি দীর্ঘদিন সম্প্রীতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাঁর কাছে শোনা দুটি গল্প এখানে লিখছি।

সুভদ্রার যখন বছর দশেক বয়স তখন একদিন ট্রেনে চলেছেন মহিলা কামরায় অনেকগুলি বর্ষিয়সী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। ট্রেন স্টেশনে স্টেশনে থামছে আর তাঁরা কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে "পানি পাঁড়ে, পানি পাঁড়ে" করে ডাকছেন। জাত জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রাহ্মণ হলে জল নিচ্ছেন কিন্তু অন্য জাতের কেউ এলে, বিশেষত মুসলমান এলে হাত গুটিয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঢুকে পড়ছেন। মুসলমানদের তো ছোঁয়াছুঁয়ি নেই কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে রেষারেষি করে ওরাও সে সময়ে হিন্দুর ছোঁওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ কামরায় কয়েকজন মুসলমান মেয়ে ছিল। এবার তারা জলের চেষ্টায় দরজার কাছে দাঁড়াল ও ব্রাহ্মণ জলদাতাকে প্রত্যাখ্যান করল। ঘরসুদ্ধ হিন্দু মহিলারা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—'ওর জল নিলে না কেন? উত্তর "এই সাই, এই সাই কেই নাই?" ততোধিক ক্রুদ্ধতর জিজ্ঞাসা ফেটে পড়ল। যে কাজটি নিজেরা করলে দোষ নয় তা অন্যে করলে দোষ। মানুষ এমনই অন্ধ বটে। এই ঘটনা বালিকা বয়স থেকে সুভদ্রাকে ভাবিয়েছিলো এবং আত্মবিচার করতে শিখিয়েছিলো। সুভদ্রার কাছে আর একটি আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম। সেই গল্পটি এখানে লিখছি। এই যে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার বীজ যা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে এবং ক্রমাগতই আমাদের স্বাভাবিক মানুষ্যত্বকে অদ্ভূতভাবে

বিকৃত করে দিচ্ছে, কোন কোন ঘটনায় হঠাৎ সত্যের উদ্বোধনে, তার থেকে মুক্তিও হতে পারে।

দেশ ভাগের অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাবের দারুণ দাঙ্গায় তুই অংশে হিন্দু মুসলমান ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন মুসলমানের ঘরে হিন্দু মেয়ে শিশু এবং হিন্দুর ঘরে মুসলমানের মেয়ে শিশু অনেক এসে পড়েছিলো। এরা অপহৃত লাঞ্ছিত হয়ে নিদারুণ মনোকষ্টে ছিল। তুই দেশের সরকারই চিন্তা করছিলেন কি ভাবে এদের পুনরুদ্ধার হয়। নেহরু লিয়াকৎ প্যাক্ট হল। তার মধ্যে অনেক শর্ত ছিল। প্রধান শর্ত অপহৃত মানুষদের যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া। তুই সরকারই স্থির করলেন যে নিজ নিজ দেশে এরা খুঁজে বের করবেন যে কার ঘরে অন্য ধর্মের নারী শিশু লুকানো আছে। স্বভাবতই এ কাজে মেয়েদের সাহায্য প্রয়োজন। অগ্রণী হয়েছিলেন মৃতুলা সারাভাই, সুভদ্রা যোশী, সম্ভবতঃ মিসেস কিদোয়াই প্রভৃতি সমাজ-সেবিকারা। এই উপলক্ষ্যে একদিন সুভদ্রা থানায় বসে আছেন। পাকিস্তান থেকে কি খবর এসেছে, ভারতে কোথায় কোথায় মহিলারা কার ঘরে আছে—সুভদ্রা জানতে এসেছেন।

তুই দেশের পলাতক আত্মীয়স্বজনেরা ফেলে যাওয়া বা অপহৃত আত্মীয়-স্বজনদের খবর নানা সূত্রে সংগ্রহ করতেন। এরকম একটি কাহিনী 'Freedom at midnight" বইটিতে আছে। যাহোক এখানে সুভদ্রার গল্পটি বলছি। থানার দারোগা নামের তালিকা মেলাচ্ছেন। এমন সময় একজন দেহাতী পাঞ্জাবী নারী এসে দারোগার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দারোগাবাবু আমার ছেলে কেড়ে নেবেন না। তা হলে চৌধুরী মরে যাবে।" দারোগা তো পাষাণের মত মুখ করে বসে কাগজ দেখছে। কান্না-কাটিতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েটা চিৎকার করেই চলেছে, "চৌধুরী মরে যাবে, চৌধুরী পাগল হয়ে যাবে।" সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলেন, "চৌধুরী কে?" "চৌধুরী আমার স্বামী।" "তোমার স্বামী পাগল হয়ে যাবে ছেলের জন্য, আর তুমি হবে না?"—"ছেলেতো ওর, ছেলে তো ওর" —বলে আধবয়সী স্ত্রীলোকটি চিৎকার করতে লাগল। দারোগা ধমক দিয়ে উঠলেন, "চোপ।" তারপর চৌধুরীকে নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। চৌধুরী ঘরে ঢুকল। তার তু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছে একটি ছোট্ট ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আছে।

১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। মানুষ বদল কবে থেকে শুরু হয়েছে, কতদিন চলেছিল, তা' ঠিক জানি না। কিন্তু অনেকেই

পাঁচ ছ বছর শক্রুর বাড়িতে বাস করেছে। অর্থাৎ এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের বাড়িতে বাস করেছে। তাদের ধর্মের ব্যবধান ছাপিয়ে, শক্রুতা ছাপিয়ে, মানুষের একাত্মতা কি গড়ে ওঠেনি? এক ছাতের তলায় বাস করলে মানুষ কতোদিন তার হৃদয়কে সরিয়ে রাখতে পারে?

চৌধুরী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললে, "এ আমার ছেলে। হুজুর, দুনিয়ায় এর কেউ নেই।"

"তুমি কি করে জানলে এর আর কেউ নেই? ওর চাচা লিখেছে। তার বংশের একটি মাত্র চেরাগ এই শিশু, তোমার ঘরে আছে।"

"না হুজুর, আমার হাতের ওপর এই ছেলে জন্মেছে। আমি এর নাড়ি কেটেছি। এর বাবা দাঙ্গায় মারা গেছে। আমি সব জানি। এ ছেলে আমাকে ছেড়ে বাঁচবে না। আমিও বাঁচব না, আমার কোন সন্তান নেই।" চৌধুরী কাঁদছে, তার বৌ কাঁদছে, বাচ্চাটা কাঁদছে, থানার ঘরে হৈচৈ পড়ে গেছে।

কিন্তু মুসলমান মেয়ের সন্তান একজন হিন্দুর হাতের ওপর জন্মালো কি করে? অনেক জিজ্ঞাসার পর যা কাহিনী পাওয়া গেল তা হচ্ছে এই—পাশাপাশি দুটি গ্রামে থাকে হিন্দু আর মুসলমান। সুসময়ে ভাব, অসময়ে দাঙ্গা। যখন পাকিস্তান সৃষ্টির দাঙ্গা লাগল তখন এই দুই গ্রাম যেখানে কত পুরুষ ধরে পরস্পরকে চেনে, জানে, একসঙ্গে বাস করে এক মাটি চাষ করে, সেখানে হঠাৎ যেন আগুন লেগে গেল। এমনি এক ভয়ংকর রাতে চৌধুরীরা আক্রমণ করল প্রতিবেশীদের। মশাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল —"যা তোরা তোদের স্বর্গ পাকিস্তানে চলে যা।" দুই গ্রামের লোক উন্মত্ত হয়ে গেছে। যে যাকে পারছে, মারছে। লাঠি নিয়ে ছুটছে চৌধুরী। তার এক হাতে মশাল আর এক হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। তার সামনে ছুটছে একটা মানুষ। প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। চৌধুরী হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে দিল। পিঠের ওপর প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে হুড়মুড় করে উপুড় হয়ে পড়ল মানুষটা। চৌধুরী মশাল নামিয়ে তার শিকারকে দেখল "ওহো এ যে স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকটা গোঙাচ্ছে। তাকে সোজা করে শুইয়ে দিল চৌধুরী, "তুই কে রে? ওহো এ যে আমিনা।" সদ্য বিধবা আমিনা, তার স্বামী মরেছে কদিন আগে এই দাঙ্গায়। তার শক্রুরা দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে তাকে মেরে খালে ফেলে গেছে তার দেহ।

চৌধুরী অনুতপ্ত গলায় বললে, "আমিনা, তোকে মেরে ফেললাম কি?" পর মুহূর্তে বুঝতে পারল গর্ভবতী আমিনা প্রসব করেছে। তার তীব্র চিৎকার, সেই রুধিরলিপ্ত কুৎসিৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে চৌধুরীকে বিহ্বল করে

দিচ্ছে। এমন কাণ্ড হবে সে ভাবেনি। এমন কি একজন স্ত্রীলোককে লাঠি মারবে তাও বোধ হয় ভাবেনি "ওঠ রে আমিনা, তোকে ঘরে পৌঁছে দিই। কিন্তু কোথায় ঘর, দেখে গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূর থেকে ফট্ ফট্ করে করে বাঁশ ফাটার শব্দের মাঝখানে হঠাৎ কাছ থেকে—অতি কাছে থেকে, সদ্য-জাত শিশুর উঁআ উঁআ শব্দ শুনতে পেল চৌধুরী। নীচু হয়ে দেখে, আমিনা জন্ম দিয়েছে একটি রক্তমাখা ক্ষুদ্র মানব। মানুষ জন্মেছে। হেঁট হয়ে চৌধুরী দু'হাতে তুলে নিল তাকে। এই রকম হয় নাকি সদ্যোজাত শিশু? হাত বাড়িয়ে দিল আমিনা। মৃত্যুজড়িত কণ্ঠে বললে "চৌধুরীর চাচা, ওকে মেরো না।"

আমিনা তো মরে গেলো, তার রক্তাক্ত দেহটা থেকে একটা নূতন মানব বেরিয়ে এসেছে। কি আশ্চর্য এই আবির্ভাব। দু'হাত তুলে শিশুটিকে চৌধুরী বুকের কাছে নিয়ে এল। নিষ্ঠুর হিংসার মধ্যে হঠাৎ প্রেম, আলোর বন্যার মতই প্রেম, তার চারিপাশ উজ্জ্বল করে দিল। শয়তানের তাণ্ডবের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর পা রাখলেন। দু'চোখ জলে ভাসছে চৌধুরীর। কোন রকমে নাড়ী ছেদন করে মাথার পাগড়িতে জড়িয়ে সে শিশুটিকে নিয়ে দৌড়ল চৌধুরানীর কাছে। স্ত্রী লোক হলেও সে মা হবার সুযোগ পায় নি। জানে না কি করে এতটুকু শিশুকে বাঁচাতে হয়। অবশেষে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাকে বহু কষ্টে বাঁচানো হয়েছে। চৌধুরী তাই ভালো মতো জানে এর কেউ নেই জগতে। আর আজ কিনা পাকিস্তান থেকে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি লিখে পাঠিয়েছে অমুক গ্রামে অমুক চৌধুরীর ঘরে তার ভাইএর ছেলে তাদের বংশের একটি মাত্র চেরাগ জ্বলছে। তাকে ফেরত দিন সদাশয় ভারত সরকার।

নেহরু-লিয়াকৎ প্যাক্ট! কবে কোথায় একটুকরো কাগজে দু'জন মহারথী কি সই করেছেন তাতে চৌধুরীর এত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে?

সুভদ্রার কাছে এই গল্প শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এই সব কাহিনী মানুষকে জাগিয়ে তোলে। মিথ্যার আবরণ ভেদ করে সত্যকে দেখতে শেখায়। অন্ততঃ তাকে এটুকু বোঝায় যে সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি মানুষের সৃষ্ট নিয়মের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

১৯৬৪ সাল থেকে আমরা যে কয়েকটি প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গুজবের বিনাশ এবং বিভিন্ন ধর্ম জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের মিল খুঁজে বের করা। এই কাজ করতে করতে আমাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানদের যোগাযোগ হল এবং তখনই জানতে পারলাম যে সেখানে ভাষা আন্দোলন কি রকম জোরদার হয়েছে।

অবশ্য যখন কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় তখন পূর্ববঙ্গের খবরের কাগজ দুই একখানা যাঁরা ওদেশ থেকে এনেছিলেন তঁাদের হাতে পেলাম। 'সংবাদ' ও 'ইত্তেফাকে'র ভূমিকা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। 'সংবাদে'র সম্পাদকীয় থেকে একটি ভূমিকা তুলে দিচ্ছি। ১৪ই জানুয়ারী তারিখে 'মায়েদের আকুল আহ্বান' শিরোনামায় ঢাকার ষোলজন মহিলা নেত্রীর আহ্বান জানিয়েছিলেন—"সাম্প্রদায়িকরা আরেকবার বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের রাজত্বের দরজা খুলিয়া দিয়েছে। অন্ধ ঘৃণার বিপজ্জনক যুক্তি অনন্ত মানবিক মূল্যবোধকে গ্রাস করিতে উদ্যত।...মাতা, ভগ্নী ও গৃহবধূ হিসাবে অতীতে আমরা দেখিয়াছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘরে ঘরে ডাকিয়া আনে অবর্ণনীয় দুর্দশা। অসহায় শিশুর মৃত্যু, নারীত্বের লাঞ্ছনা।...তাই পূর্ব পাকিস্তানের মাতা ভগ্নীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান...'সম্প্রীতির দুশমনকে প্রতিহত করুন।'" পূর্ব বাংলার প্রতিটি বাংলা পত্রিকায় এই ধরনের আবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল। দুই ইঞ্চি পরিমাণ ব্লক অক্ষরে কালো বর্ডার দেওয়া প্রথম পাতায় শিরোনামা ছিল —'দাঙ্গার বিরুদ্ধেরুখিয়া দাঁড়ান।' 'সংবাদ'ও 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রতিদিনই মানবতার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল। সংবাদের সম্পাদকীয়তে ১৫ই জানুয়ারী লেখা হল—'দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদের সায়েস্তা করুন।' 'সাম্প্রদায়িকতাবদীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না।' 'সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠন করুন।'

পূর্ব পাকিস্তানের 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক', আজাদ', 'পাকিস্তান অবজার্ভার' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছিলেন, আমাদের উচিত ছিল সেই কল্যাণকর্মে সহায়তা করা। সমস্ত বিবাদ ভঞ্জনের একমাত্র উপায় আত্মদর্শন। বর্বরতা যেখানেই ঘটুক তাকে নির্ভয়ে নিন্দা করা। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার সেই প্রধান উপায়টি কলকাতার অনেক দৈনিকই ভুলে গিয়েছিলেন। ২৮শে জানুয়ারী একটি প্রসিদ্ধ দৈনিকের শিরোনামা এই রকম—'কলিকাতাকে শায়েস্তা করার জন্যই কেন্দ্রীয় নেতাদের মহানগরে পদার্পণ।' অর্থাৎ গুলজারিলাল দাঙ্গা থামবার যে প্রচেষ্টা করলেন তা' এদের অনুমোদন লাভ করল না। আরেকটি কাগজে লেখা হল—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। যেদিন পাকিস্তানে হিন্দু হত্যার হিংস্রমত্ততার বিবরণ শুনিয়া ও ভারতের হিন্দু মনপ্রাণ আর বিচলিত হইবে না। হিন্দুত্বের মর্যাদা, হিন্দুনারীর মানসম্ভ্রম পাকিস্তানের ধর্মবিদ্বেষী হিংস্রতায় ও ঘাতকতায় শোণিতাক্ত হইবে কিন্তু

ভারতের হিন্দুর কাছে সেই আর্তনাদ একটি কাহিনীর হতভাগ্যের আর্তনাদ বলিয়া মনে হইবে।...তবে বুঝিতে হইবে হিন্দুর ইতিহাস শেষ অঙ্কে পৌঁছিয়াছে।" বুঝতেই পারা যায় এই ধরনের হিন্দুত্বের গর্ব যদি খবরের কাগজে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা হয়, বিশেষত দাঙ্গার সময়, মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দুই দিকের ব্যাপার দুই রকম। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পিছনে আছে ফ্যাসিষ্ট রাজশক্তির প্রেরণা। কিন্তু শিক্ষিত গণশক্তি নির্দ্বিধায় মানবতার বাণী উচ্চারণ করেছে, সরকারের দুর্নীতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই মানবতাবোধ এত সত্য যে এর জন্য তের-চোদ্দজন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। দুঃখের বিষয় কলকাতার ঘটনার দুর্নীতি এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে এবং সরকারের সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। এই সব কারণে আমরা স্থির করলাম যে আমরাও আমাদের জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য একটি সংগঠন তৈরী করব। কিন্তু আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করবার অসুবিধা ছিল। এ দেশের পত্র পত্রিকা এমন কোন কিছু লিখতে চায় না যাতে এ দেশের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি নিন্দা থাকে। আমরা দরজায় দরজায় ঘুরেও উপযুক্ত খবর প্রকাশ করতে পারিনি। যেমন আমাদের মনে হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার খবর এবং দুস্কৃতকারীদের খবর যেরকম ফলাও করে প্রচার হচ্ছে, সেরকম কিন্তু যারা প্রাণ দিয়েও অন্যদের প্রাণ রক্ষা করবার চেষ্টা করছে তাদের খবর প্রকাশ হচ্ছে না। এজন্য আমরা পত্র পত্রিকার দরজায় দরজায় ঘুরেছি। নিখিল চক্রবর্তীর মা, আমি, আরও অনেক মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে খবরের কাগজের আফিসে আফিসে গিয়েছি, ফল পাইনি। তখন আমরা স্থির করলাম যে আমরা একটা পত্রিকা প্রকাশ করব। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে। অনেকেই বললে—"লাভ কি? কজন পড়বে?" কিন্তু আমরা ভাবলাম অন্তত একটা চিহ্ন তো থাকবে, যে কেউ কেউ সে সময়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। আমরা যতটা আশা করতে পারিনি, সে রকম অনেক লেখা পেতে লাগলাম। আমাদের কাজে উৎসাহ দিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। আমার 'নবজাতক' পত্রিকায় অনেক লিখেছেন তিনি।

আরেকজন যিনি এই সময়ে নিন্দিত হচ্ছিলেন, তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ। জয়প্রকাশ নারায়ণ সংখ্যালঘুদের সপক্ষে অনেক কথা বলছিলেন। তিনিও সব সময়ে লেখার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সত্যি বলতে কি, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত খুব কম লেখাই লেখা হয়েছে যাতে জনসাধারণকে সাম্প্র-

দায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

এ দুর্ভাগ্য যে কত তা সেই দাঙ্গার সময় কাজ করতে গিয়ে বুঝেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে বিদ্বেষ বিভেদের উৎসরূপে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে তর্জনী নির্দেশ করি বটে, সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেও তা কম উৎসারিত হয় না। সাহিত্যের শক্তি অনেক বেশী সেইজন্য প্রধানতই শিক্ষক সাহিত্যিকদের নিয়ে আমরা আলোচনা-সভা করতাম। সভায় সুন্দর আলোচনা হত। আমি অনেক শিখলাম। যদিও আমিই সভা ডাকতাম, আমিই ছিলাম উদ্যোক্তা এবং একটা দুর্নিবার প্রেরণা আমাকে এই নূতন পথে চালনা করে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু চলতে চলতে শিখলাম অনেক। আমাদের নিয়মিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—কাজী আব্দুল ওদুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, জাষ্টিস মাসুদ, পান্নালাল দাশগুপ্ত। আবু সয়ীদ আইয়ুবও এসেছেন দুবার, গৌরী আইয়ুব তো আছেনই। এ ছাড়া অনেকে এসেছেন এবং অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের জানিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী শিক্ষা হল লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী লোকদের প্রতিক্রিয়া দেখে। যখন দারুণ দাঙ্গা চলেছে যার ফলে যে শুধু ঘর বাড়ি মানুষের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে তা নয়, মানুষের মনের ভিতরটাও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে—স্নেহ, মায়া, মমতা কিছুরই যেন ভিত্তি নেই। কারখানায় কারখানায় পনের ষোল বছর পাশাপাশি কাজ করছে যারা তারাও পরস্পরের দিকে সন্দেহে বাঁকা চোখে চাইছে। এমন কি তেমনই সহকর্মীরা একজন আর একজনকে বধও করেছে। দীর্ঘ একটা সময় ধরে রাজনৈতিক নেতারাও বেশ নীরব ছিলেন। মনে পড়ে দাঙ্গার মধ্যেই প্রফেসর শান্তিময় রায়ের কাছে খবর পেয়ে আমরা কয়েকজন টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে একটা গ্রামের মধ্যে মিটিং করতে গিয়েছিলাম। ওখানে কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন একজন মুসলিম। তাঁর ছেলেকে পাথরে ঠুকে ঠুকে মারা হয়েছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম এখানে শতকরা ৮০ ভাগ কমিউনিষ্ট ভোট. এখানে এমন কাণ্ড ঘটে কি করে ? বিশ্বমানবতা গেল কোথায় ? তার উত্তরে যে গল্প শুনলাম সে রকম গল্প সর্বত্রই তৈরী হচ্ছিল, যে ঐ গ্রামের কেউ নয়, অন্য কোনও জায়গা থেকে একদল লোক ট্রাকে করে এসে এই অপকীর্তি করে গেছে। এই সব গালগল্প খুব চলছিল।

এমন সময় রাউরকেল্লায় এক ভয়ানক ঘটনা ঘটল। বহুসংখ্যক সংখ্যালঘুকে একদল বিশেষ প্রদেশের হিন্দু হিতৈষী মানুষ ট্রাকে করে করে কোন গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করেছিল। এমন কি আদিবাসীরাও তীর-

ধনুক নিয়ে যোগ দিয়েছিল। এই ভয়াবহ ঘটনার খবর কেউ জানত না। খবরের কাগজেও কিছু প্রকাশিত হয়নি। এমন সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ অন্য কোনও কাজে হঠাৎ রাউরকেল্লা গেলেন। এবং সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির শিরোনামা ছিল—"টাইম টু স্পিক।" তাতে রাউরকেল্লার ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ছিল। এই "প্রেস রিলিজ" স্টেটসম্যান পত্রিকায় হয়ত অসতর্ক ভাবে প্রকাশ করে ছিল। কিন্তু কোন বাংলা কাগজ করেনি এবং রাউরকেল্লার নিদারুণ ঘটনা খবর হিসেবেও প্রকাশ পায়নি। জয়প্রকাশ নারায়ণ যিনি তখন আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং নিঃসঙ্কোচ সত্য ভাষণের জন্য যিনি বহু নিন্দিত, তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। বারবারই তিনি শেখ আব্দুল্লার বন্ধু। সেটাও তাঁর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড অভিযোগ হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের। এই দুই রাজনৈতিক দল সে সময় অত্যন্ত জঙ্গীভাবে চলত। সম্প্রতি দেখছি এরা ক্ষীণকণ্ঠ হয়েছে। স্টেটসম্যান-এ ঐ লেখাটি বেরুলে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। দেশ পত্রিকাতে এক প্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখক 'মহামানব'··· বলে একটি গল্প লিখলেন। গল্পটির সংক্ষিপ্তসার তুলে দিচ্ছি—কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিন্দাভিলাষে আমার এই লেখা নয়। আমি কেবল বলতে চাইছি দুর্যোগের সময় অনেক বড় মানুষও কি রকমের বিবেচনা হারিয়ে ফেলেন। এবং সাম্প্রদায়িকতা কত দূর পর্যন্ত মূল বিস্তার করে। গল্পটির নাম—'মহামানব' কেনারাম ও ক'।

কেনারামের হিন্দু বন্ধু বিধুভূষণ, মুসলমান বন্ধু 'ক'। বিধুভূষণ কেনারামকে সাবধান করে দিয়েছিল—'তুমি নতুন বিয়ে করেছ, বউটিও সুন্দরী, 'ক'কে বেশী আস্কারা দিও না।' কেনারাম হেসেছিল উঁচু দরের হাসি। কিন্তু দিন পনের পরে বিধুভূষণের নজরে পড়ল কেনারামের দামী সোফায় বসে 'ক' ছুঁচোলো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে নববধূর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছে।···

কেনারাম বিধুভূষণকে দেখিয়ে বললে, 'আমার বন্ধু বিধু আপনাকে ভয় করে। ওর মনের গঠন এমন বিশ্রী যে সন্দেহ কিছুতে ঘুচতে চায় না।'

বিধু—'আমি মহাপুরুষও নই, পাষাণও নই···তাই সন্দেহ ঘুচতে চায় না।' 'ক' দুলে দুলে হেসে হেসে বললে, 'হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ, মনে প্রেম জাগান। প্রেমই আসল চিজ।' বিগলিত কেনারাম কুণ্ডুর মুখের ভাব মাখন মাখানো পাউরুটির মত হয়ে গেল।

দিন দশেক পরে কেনারামের সঙ্গে বিধুভূষণের দেখা···কেনারাম—'আজ

রাতে আমার বাড়িতে খেও। আমার বউ কোর্মা রাঁধবে, আর 'ক' করবে সামী কাবাব। ...'ক' যে কত ভাল, সে আমার স্ত্রীকে একটা দামী শাল উপহার দিয়েছে।...'

বিধু—'দেখ কেনারাম, তুমি যে একজন মহামানব তা আগে জানতাম কিন্তু তুমি যে একজন নপুংসক তা আগে জানতাম না।...' আরও মাস খানেক পরে কেনারাম বাড়ি ফিরে দেখে 'ক' তার শয়নকক্ষে বসে তার স্ত্রীর থুতনি ধরে আদর করছে। অন্য কেউ হলে তাকে 'ক' কে জুতোপেটা করত। কিন্তু মহামানব কেনারাম বললে—ভাই 'ক' তোমার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি। পুঁটিবালা আমার বিবাহিত পত্নী ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'ক' বললে, বন্ধু কেনারাম, কয়েকটা ভুল সংস্কৃত উচ্চারণ করে পুঁটিবালাকে তুমি বিয়ে করেছ। কিন্তু ঐ নজিরেই তুমি পুঁটিবালাকে দখল করে থাকবে এটা আমি মানব না।... পুঁটিবালা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কি মুচকি হাসতে লাগল, অন্য কেউ হলে চুলের মুটি ধরে চাবকাত তাকে।

..."আরো দুই মাস পরে কেনারাম 'ক'কে তার শয়নকক্ষে পুঁটির সঙ্গে যে অবস্থায় দেখল তা অবর্ণনীয়। কেনারাম বললে, ভাই 'ক', তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, এই কি তার প্রতিদান? পরদিন পুঁটিবালা অন্তর্ধান করল, 'ক-' কেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।"

গল্পের এইখানেই শেষ। তার **moral** যা দেওয়া হয়েছে তা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছিল তাদের পিঠে চাবুকের মত পড়বে, অন্তত লেখক তাই মনে করেছিলেন। মর্মবাণীটি বুঝিয়ে বলা দরকার।

কেনারাম এই ঘটনাটির পরে তারস্বরে বাংলা, হিন্দীও ইংরেজীতে যে বাণীটি ঘোষণা করবে তা এই—"অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুণ্ডা, কিন্তু আমি এ কথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট্‌ আছে। গোসাপে কণ্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে। সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে। লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে' বলে বলুক। লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।" অতঃপর লেখকের মন্তব্য—"কেনারাম এখনও পাগলা গারদের বাইরেই আছে।"

লেখাটি জয়প্রকাশ নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এই লেখাটি পড়ে

আমরা সকলে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এ ছাড়াও নানারকম গল্প কাহিনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার চলছিল। 'লাল কেল্লা' বলে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী অনেক ছিল। বিশেষ করে একটি অংশে গরু খাইয়ে মুসলমান করার একটা নৃশংস বর্ণনা ছিল। এ রকম সব ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তবু সেগুলি বলার উপযুক্ত সময় তখন নয়। এবং যেহেতু আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছিলাম যাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব কমে আসে, সেহেতু আমাদের পক্ষে এই ধরনের লেখা বন্ধ করানোর ইচ্ছা, প্রতিবাদ করার ইচ্ছা দমন করা যাচ্ছিল না। 'মহামানব…'গল্পটির উত্তরে আমি একটি গল্প লিখি। সেটি পূর্বের গল্পের উপসংহার—কেনারামকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া বিধুভূষণ চিন্তিত মুখে রোয়াকে বসিয়া ভাবিতেছিল যথার্থ আসামী কে?—'ক' যে কেনারামের বউকে ফুসলাইছে, না কেনারাম, যার মাথায় সত্য, ক্ষমা, মানবতা ইত্যাদি আজগুবি চিন্তা গজগজ করিতেছে? বিড়ির ধোঁয়ায় মগজের ভিতরটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পাশের বাড়ির বুঁচির তারস্বরে সঙ্গীতসাধনা কানে যাইতেই সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। বুঁচি হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান জুড়িয়াছে। পিছনে দুই দিকের দেওয়ালে দুইটি ক্যালেণ্ডার। একটিতে আপাদলম্বিত পরিচ্ছদে আবৃত এক বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর একটিতে কৌপিন পরা আরেক জন দন্তহীন ব্যক্তি পা মুড়িয়া বসিয়া আছেন। ঠিক বটে, এই দুই বিপরীত বেশধারী মানুষই বর্তমান যুগের বহু লোকের মাথা চিবাইয়া খাইয়াছেন। তাহাদের সাহস বীরত্ব নষ্ট করিয়াছেন। মনে পড়িল বিধুভূষণের বাপ মধুসূদন বলিয়াছিলেন, তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, ঐ ল্যাঙোট পরা লোকটি তাঁহার সঙ্গীদের শিখাইতেছিল যদি পুলিস আমায় লাঠি মারে, তোমরা কি করিবে? তাহারা বলিল, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের লাঠি মারিব। তোমাকে উদ্ধার করিব। তখন ঐ ক্লীবত্বপ্রাপ্ত মানুষটি নাকি বলিয়াছিল, না, না, তোমরা স্থির দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইহাকে সত্যাগ্রহ বলে।…আর এই জন্যই ঐ লোকটা মহামানব হইয়া গেল। যাহোক বাংলা দেশ বীরের দেশ। তাহারা কখনই এই নপুংসক নীতি গ্রহণ করে নাই। শুধু বেচারা কেনারামের মত দু'এক-জনের বিশ্বপ্রেম, মানবতা ইত্যাদি বুলি শুনিয়া মাথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে, প্রকৃত আসামীদের খুঁজিয়া পাইয়া বিধুভূষণ কতকটা আরাম পাইল।…এমন সময় একটা প্রচণ্ড গোলমাল কানে গেল। বুঁচিও ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া

পরিত্রাহি চিৎকার করিতে শুরু করিল। বিধুভূষণ বুঁচির অবিন্যস্ত বেশভূষার দিকে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বুঁচু কি হয়েছে?··· মর হতভাগা, তোর বুঁচু। লোকটাকে যে ঠ্যাঙাচ্ছে, যাও না বাঁচাও গে। লোকটাকে ঠ্যাঙাচ্ছে শুনিয়া বিধুভূষণের বীর প্রকৃতি উদ্দাম হইয়া উঠিল। ···রাস্তার মাঝখানে রিক্সা কাত হইয়া পড়িয়া ছিল। খুঁদির কাপড় কাদা-জলের ছিটায় ভর্তি। সে মারমুখী হইয়া ফুটপাতে দাঁড়াইয়া আছে আর ন্যাড়া, হাবলু, বোঁদা, পল্টু প্রভৃতি দশজনে রিক্সাওয়ালার ওপর কিল, চড়, লাথি, বর্ষণ করিতেছে। রিক্সাওয়ালা কাতর স্বরে চিৎকার করিতেছে, "বাবু আপনারা রাস্তার মধ্যেখানে খাড়াইয়া বাত্‌চিৎ করিতেছিলেন, তাইতো পাশ কাটাইতে গিয়া মার পায়ে ধাক্কা লাগছে, বাবু ছাড়িয়া ছ্যান, প্রাণ ভিক্ষা ছ্যান," কিন্তু বাবুরা নারীজাতির অপমানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, "তবে রে ব্যাটা, আমরা আড্ডা মারছিলাম!" বিধুভূষণকে দেখিয়া সন্টু বলিল, "শুনছেন ব্যাটার আস্পর্ধা, এ দেশে বসেও চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্য বলবে। শালার জাতই শয়তান।" গর্বে বিধুভূষণের বুকটা ফুলিয়া উঠিল। সত্যিই আমাদের জাতি এখনও ক্লীব হইয়া যায় নাই, এখনও নারীত্বের সম্মান রক্ষায় যুবকদের বীরত্ব ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে লাঠিগাছটা আগাইয়া দিল—"তোমারাই দেশের আশা ভরসা, নাও ভাই লাঠি নাও। হতভাগা রিক্সওয়ালার মাথা ফাটিয়া রক্তের ধারা নামিল, খুঁদি কাদামাখা শাড়ি ঠিক করিতে করিতে হাসিতে লাগিল। বুঁচি কিন্তু চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—"ও হাবুলদা, ও পল্টুদা, ওকে মারছে কেন, ওর কি দোষ, ছেড়ে দাও।" আর্ত-চিৎকারে পাড়া মাতাইয়া বুঁচি ঝাঁপাইয়া পড়িল—ভল্টু তার চুলের মুঠি ধরিয়া "তবে রে শালী, নারীত্বের কি লাঞ্ছনা হয়েছে শুনিসনি—আজ দ্রৌপদীর মত তোর চুলে রক্ত মাখিয়ে ছাড়ব—।"

রিক্সাওয়ালার চিৎকারের সঙ্গে বুঁচির চিৎকার মিশিতে লাগিল। পরিতৃপ্ত বিধুভূষণ দাওয়ায় গিয়া বসিয়া বিড়ি ধরাইলেন এবং ক্যালেণ্ডারগুলির দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন—"দূর ব্যাটারা, তোরা কিস্যু করিতে পারবি না—আমরা বীরই থাকব।"

'মহামানব'নামক গল্পটির প্রতিবাদে লেখা আমার গল্পটি কোন নামী পাত্রিকাই ছাপল না। হীরেন বসুর সম্পাদিত "দর্পণে" "তা প্রকাশ হল। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় মহামানব গল্পের লেখক স্পষ্টতই আমাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি এতই তাঁর অযোগ্য যে আমি

এখানে সেটি উদ্ধৃত করলাম না। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর অনেক লেখা আমার ভালো লাগে। এখন বুঝতে পারছি তখন তিনি একদেশদর্শী হয়ে পড়েছিলেন বলেই ঐরকম একটা কবিতা কোন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন।

আমরা তখন যেন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা পত্র পত্রিকার ভূমিকা একই, সম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানো। এদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে নেমে আমি যে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি তখন তা তেমন বুঝিনি—অর্থাৎ বড় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি কোন দিনই আর আমার লেখা ছাপবে না, হলও তাই। সত্য ভাষণের গুরুতর অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে গেলাম।

সেই দুর্যোগের সময় কিন্তু অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকা আমাদের সাহায্য করেছে। তার মধ্যে নিখিল চক্রবর্তীর প্রকাশিত **Main-streamএ** আমার **Writers run riot** প্রবন্ধে আমি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লেখকদের দুষ্কীর্তি কিছুটা প্রকাশ করতে পেরেছিলাম। হীরেন বসুর 'দর্পণ', জয়ন্তী সেনের 'সাপ্তাহিক বসুমতী", পান্নালাল দাশগুপ্তর 'কম্পাস', সমর সেন সম্পাদিত **'Now'** সুযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এদেরই সাহায্যে আমরা আমাদের মতামত কিছুটা প্রকাশ করতে পারছিলাম। ফলে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। এ বিষয়ে তখনই আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকাগুলিই ইচ্ছা করলে একটা দেশের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যেমন পারেন কোন গুরু। তা অর্ডার দিয়ে তো আর গুরু তৈরী করা যায় না। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। তাই আমরা পূর্ববঙ্গের লেখকদের লেখা প্রকাশের জন্যই 'নবজাতক' নামে দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলাম।

তিন

লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের যে সচেতনতা এসেছিল, যার ফলে বাংলা দেশের জন্ম হল, সে কথা জানা এ দেশের পত্র পত্রিকার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কি কারণে এরা পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে এই নব জাগরণের খবর ভাল করে প্রকাশ করেন নি, বা একেবারেই প্রকাশ করেননি তা বলা কঠিন।

দেশকে ভাগ করবার জন্য মুসলমান রাজনৈতিক ব্যক্তিরা একটি অভিনব পন্থা নিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান যে দুই জাতি এইটি প্রতিপন্ন করা। এখনও অনেক হিন্দু বলেন ঐ লোকটি বাঙালী নয়, মুসলমান। এমনকি কোন কোন মুসলমানরাও এই রকম কথা বলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের যারা ঘোর বিরোধী ছিলেন আমাদের অল্প বয়সে দেখেছি তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন বোঝাতে যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে সেই বাঙালী তার ধর্ম যাই হোক। আমার বেশ মনে আছে আমার দাদামশাই এই তথ্য যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পেরে এক ব্রাহ্মণ তনয়কে একটি লগুড় নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

এখানে নূতন যুগের মানুষদের জন্য বলছি সেই সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে উর্দু মিশ্রিত করে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে মহম্মদ ওয়াজেদ আলির লেখা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি—"ব্যাপার দেখলে সন্দেহ হয় বাংলা ভাষাকে সৎমা ভেবে তাকে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের একরকমের স্বভাবে পরিণত হয়েছে—যেমন আমাদের ছেলেপেলেদের শুভ বিবাহ দেওয়া চলছে না, দিতে হচ্ছে 'শাদি মোবারক'। আমরা কাউকে স্বাগত জানাতে পারি না, জানাতে হয়—খোশ আমদাদ।' নিমন্ত্রণ নয় 'দাওয়াৎ' ইত্যাদি।···ভাষা মার দুটি সন্তান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির দিক দিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। এই অজুহাতে আমরা আমাদের মায়ের হাত, পা, নাক, কান, মাথার কেশ কর্তন করে—প্লাষ্টিকের নাক, কান, পশ্চিমা ঘোড়ার চুলের পরচুলা বানিয়ে তাঁর অঙ্গে জুড়ে দেব। আর তা না করলে আমরা তার সন্তান হয়ে থাকতে পারব না?"

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বাঙালী পত্রিকাগুলি এই নব ভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল। দেশ ভাগের পূর্বে 'মোহম্মদী' বা এদেশে প্রকাশিত অন্যান্য মুসলমান

পত্রিকার সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। কৃত্রিম ইসালামি ভাষা নয়, সহজ ভাষায় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হত, তার চরিত্র কুসংস্কারমুক্ত ও Secular। এ সব পত্রিকা আমাদের হাতে আগে কখনও আসেনি। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের চিন্তার ঐক্য বাঁধতে গিয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করলাম বাংলা দেশে কাজ খুব ভালভাবে শুরু হয়েছে। ঐ দেশের প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা আমার দপ্তরে পৌঁছত এবং প্রকাশ হত আমার লিটল ম্যাগাজিন 'নবজাতকে'। 'নবজাতক' থেকেই প্রথমে দেবদুলাল রেডিওতে 'অতীন তোমাকে' কবিতাটি পাঠ করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শুধু ধর্মের পার্থক্য যথেষ্ট নয় বলে যারা ভাষাকেও দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছিল, তাদের ভাষাটা কি রকম দাঁড়িয়েছিল তা সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ "বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছাসাহিত্য যে একটা খিচুড়ী বাঙ্গালা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাঙ্গালা দেশের কোনো অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোন সংযোগ নাই। তাহার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতার সঙ্গে অনাবশ্যক ভাবে উর্দূ শব্দ ও বাক্য রীতির প্রযোজন করা হয় (যথা—'তেরা পাঙ' অর্থাৎ 'তোমার পা' 'দেলের বিচেতে' অর্থাৎ 'মনের মাঝে' 'পয়দা করে জাহান'='জগৎ সৃজন করে' 'ওয়াস্তে খোদার'='খোদার জন্য' 'এছা, জেছা, তেছা'='এমন যেমন তেমন, ইত্যাদি) সেই কেচ্ছা সাহিত্যের ভাষণে কেহ কেহ মুসলমান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।"

এই ভাষাগত বিভেদ বাংলা দেশের ভাষা আন্দোলন কি ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল তা 'অতীন'কে লেখা দিলওয়ারের কবিতাটিতে পরিষ্কার বোঝা যাবে। বিখ্যাত সাংবাদিক আমেত্তুর রহমান বার বার বলেছেন যে একদিন আমরা ভুলেছিলাম, 'যে আমরা বাঙ্গালী তারপর মুসলমান, আমরা বাঙালীত্বকে মুসলমানত্বের চেয়ে ছোট করে দেখেছিলাম, তার সাজাই আজ পাচ্ছি।' এইটাই বাংলা দেশের ভাষা আন্দোলনের মূল কথা। এই প্রসঙ্গে 'অতীন তোমাকে' কবিতাটি উল্লেখ করছি। তখনও পর্যন্ত এ দেশের হিন্দুসমাজ এই পরিবর্তনের সংবাদ না জানায় সেই সময়ে দেবদুলালের পঠিত 'নবজাতক' পত্রিকা থেকে তার আবেদনময় কণ্ঠে নিম্ন-উদ্ধৃত কবিতাটি পাঠ করে চমৎকৃত করে দেয় (রেডিওতে)। প্রবাসী হিন্দু বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা—

অতীন তোমাকে
প্রবাসী আপন জন ডাকে ঃ
আমার হৃদয়ে এসো, শান্তি দাও,
জড়াও আমাকে
পাখীর ডানার মত, স্নিগ্ধতর
মুগ্ধবাহু পাশে,
দুর্জয় বিশ্বাসে,
হে বন্ধু সুজন !
কতদিন অতিক্রান্ত ! কতদিন
শুনিনি কূজন—
প্রাণের কপোত কক্ষে !
জনারণ্যে পড়ে আছি একা ঃ
যেন দিগন্তের কোলে ঘোলাটে সূর্যের
ক্ষীণ রেখা !

স্মৃতি ঘুরপাক খায়, দুলে উঠে
রক্ত ধমনীতে,
ফুঁসে উঠে রুদ্ধ ক্রোধ বাঁধ ভাঙ্গা
দুর্জয় সঙ্গীতে।
বেজে উঠে চরণ শৃঙ্খল ঃ
আমি সব্যসাচী হবো
বৃহন্নলা যাক্ রসাতল।
আমি পুত্র বিনতার ঃ
কুটিলা কদ্রুর সর্বনাশ
আমি দৃপ্ত নচিকেতা ঃ
নতুন আলোর ইতিহাস
প্রিয়জন, প্রস্তুতি নাও
'কংসবধ' পালা এলো,— মারণাস্ত্র
শানাও শানাও !

সূর্যের ঔরসে হবে আততায়ী
রজনী গর্ভিণী
বৃত্রাসুর হত্যা করে
করিবো দেবতাবৃন্দে ঋণী !
প্রিয়জন, বজ্রহাতে, করুণা কান্নার
টিপো গলা।
এখানো জাগ্রত সূর্য ঃ এখনো বিপ্লবী
রশ্মিফলা।
সবিতার হাত ধরে সম্মিলিত
মৈত্রী আসে ফিরে।
আপন জনের ডাক্ ক্রমে ব্যাপ্ত
সৌরলোক ঘিরে।

১৯৬৪ সাল থেকে এইভাবে দিন গড়িয়ে চলল। আমরা উৎসাহ ভরে পূর্ববঙ্গের লেখা ছাপাতে লাগলাম ও চিঠিপত্রে বহু মানুষের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলাম। পূর্বে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছি তা থেকে কতকটা বোঝা যাবে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় আমরা যে উৎসাহ পেয়েছিলাম সেটা প্রধানতই আবুল ফজল, বদরুদ্দিন উমর, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কাজী মোতাহার হোসেন প্রভৃতির লেখা থেকে। আমরা যে চিন্তাধারার আভাস পেয়েছিলাম তাতে সন্দেহ ছিল না যে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তরের মধ্যে যে শুভ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন শুধু নয়, গৌরবের কথাও হবে। বিশেষ করে আমার আনন্দ ছিল এই যে একটা দেশের বিপ্লবী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ এতটা প্রাধান্য পেলেন। পাকিস্তানের মুসলমান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গানে চিন্তায় সম্প্রদায়ের বেষ্টন থেকে, মোল্লা শাসনের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখতে পেলেন। মুক্তির জোয়ার এল রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন ধরে। মেয়েরা পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতনের অনুসরণে মঞ্চে গান গাইতে লাগল, নৃত্য করতে লাগল সানন্দে। এসব ইসলামীয় নির্দেশের বিপরীত হলেও বাঁধভাঙ্গা মুক্তির জোয়ার তেমন করেই ভাসিয়ে নিয়ে গেলো যেমন করে একদা অবিভক্ত ভারতে রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষার অভিঘাতে নূতন জীবনের রূপ জেগে উঠেছিল। একদা মনু শাসিত হিন্দুর বিধিনিষেধে ঘেরা জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি মানুষ

যিনি ঈশ্বর ও 'নাস্তিকতার সমন্বয় করতে পারেন। যিনি যুক্তি ও আবেগকে একই নৃত্যছন্দে রূপ দেন। যিনি অতীতের রূপরেখাকে নূতন অর্থে পূর্ণ করতে পারেন, যাঁর সঙ্গীতে প্রকৃতি ও ঈশ্বর একাকার হয়ে যায়। আকাশ ভরা সূর্য তারার মধ্যে তাঁর আপন অস্তিত্ব যে মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতের ধারায় তা অন্য জীবনে সঞ্চারিত হতে পারে। ঈশ্বরকে মন্দিরে মসজিদে খুঁজতে যাবার দরকার করে না। ঈশ্বরোপম উপলব্ধির এক সৌন্দর্যোদ্ভাস মানুষের মনে সত্য হয়ে ওঠে। জানা জগতের সঙ্গে অজানার এই মেশামেশির ভিতর দিয়ে তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত আমাদের এমন কিছু দেয় যা কোন ধর্মানুষ্ঠান দিতে পারে না।···প্রথাবদ্ধ অনুশাসনের দাসত্ব মোচন বর্তমান যুগের মানুষের কাছে একান্ত কাম্য—এই মুক্তির সূত্র ধরেই অন্য মুক্তির সাধনা সম্ভব। মানুষ যেখানে নিজেই বদ্ধ সেখানে শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেই সে স্বাধীন হবে না। তার বন্ধন শৃঙ্খল তার আপন মনের কারখানাতেই তৈরী হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের তাঁর সুরে সুরে, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রথিত এই চেতনাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনার ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে, অলোক ধামের আভাসে ভাসিত করতে পেরেছেন। এই লৌকিক ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন বিরোধ না বাধিয়ে, ধর্মমতের গণ্ডি ভেঙ্গে এক মুক্ত জীবনস্বাদে পূর্ণ করেছেন। ধর্ম সংস্কার থেকে মুক্তির পথে রবীন্দ্রনাথ একটি বড় আশ্রয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক জবরদস্তির দ্বারা নির্যাতিত মানুষ রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র কাব্যে যে মুক্তির আস্বাদ পাচ্ছিল সেই আস্বাদই যে তাকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য ব্যাকুল করে তুলবে এ বিষয়ে সেখানকার সরকারেরও কোন সন্দেহ ছিল না। এ বিষম দূরদর্শিতা থাকায় তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত বারবার বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যুক্তি ও আবেগের সুন্দর সংযোগে যে সুস্থ জীবনবোধ মানুষকে শক্তি দেয় তাঁর চেতনাকে, বুদ্ধিকে শাণিত, তার প্রেমকে উন্মুখ করে তোলে সেই সামগ্রিক মানব সত্তার উদ্বোধিত রূপের সামনে রাজনৈতিক ভাঁওতা চলে না। ধর্মের উসকানি জীর্ণ মৃত হয়ে উড়ে যায়।

অতএব সকলে বিশ্বাস না করলেও সত্য এই, পূর্ব-পাকিস্তানের মর্ম থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় আমরা যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তার মধ্যে কোন ছলনা ছিল না। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের এবং অন্যান্য দেশের অনেকেই ভাবছিলেন যে এর মধ্যে রাজনীতি আছে, পাকিস্তানকে ভাঙবার জন্যই ভারতের এই চক্রান্ত, সমস্ত উসকানিটাই রাজনৈতিক মতলবে ঘটছে, কিন্তু

একটু তুলে দিচ্ছি ঃ “রবীন্দ্র সঙ্গীতের যুদ্ধে আমরা জিতেছি, তা নিশ্চয়ই জেনেছেন—পরন্তু লাভ হয়েছে—বিশ্বময় দিয়েছি তাঁরে ছড়ায়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন মাঠে ঘাটে শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন সর্বত্র। কর্তারা এখন রবীন্দ্রনাথের নাম করেন না। বলেন বাঙালীয়ানাই আসল পাপী পাকিস্তানের শত্রু। ভীমরুলের চাকে আবার ঢিল মারলে কি হয় তা যেন তাঁরা একবার দেখতে চান। আর্বি অক্ষরে বাংলা লেখার কথা এক জজ সাহেব লাহোরে বলে ফেলে খুব হয়য়ানির মধ্যে পড়েছেন। তার জের এখনো কাটেনি।”

আরেকজন লেখক আবু মহম্মদ মোজাম্মেল হক লিখছেন, “তাই যখন ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অমুসলমান ছিলেন বলে এ দেশের বাংলা-ভাষীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার ধুয়ো তোলা হয় তখন আমাদের তরুণ তরুণীরা নীরবে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং দল-বদ্ধ ভাবে রবীন্দ্রনাথকে চালু রাখার চেষ্টা করেছেন।...এ হামলায় আসলে অবশ্য বিচলিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ যুগান্তকারী প্রতিভা। ক্ষীণদৃষ্টি রাজনৈতিকদের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। এরা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে আবর্জনা হয়ে থাকবে। কিন্তু রবি-কিরণ—সে তো ঘনঘোর মেঘের ফাঁকেও উঁকি মেরে চাইবে, বলবে আমি আছি, চিরকাল থাকব।”

সিকান্দার আবু জাফরের লেখা একটা কবিতা “সংগ্রাম চলবেই” ‘ইত্তে-ফাকে’ প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভিতর একটা সংকল্পের ও প্রত্যয়ের আভাস আমাদের মনে আশ্বাস এনেছিল যে, স্বাধীনতার পূর্বে এই অভঙ্গ বাংলাদেশে যখন আত্মত্যাগের ও প্রাণ বিসর্জনের প্রয়াস বাঙ্গালীর গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেন সেইদিনই আজকে পূর্ব বাঙালায় ফিরে এসেছে। কবিতাটি আমি আমার “নবজাতক” পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছিলাম। পরে এটা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমার মনে হয় এ দেশে যে ‘চলবেই চলবেই’ বলে শ্লোগান দেওয়া হয় সেটি বোধহয় এ কবিতা থেকেই শুরু। যদিও তা আজকে আমাদের আর মনে কোন সাড়া দেয় না। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

‘সংগ্রাম চলবেই’

জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥

বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে

অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই ;
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হ'ক না আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা ত' সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।
দিয়েছি ত' শান্তি আরও দিব স্বস্তি
দিয়েছি ত' সম্ভ্রম আরও দেবো অস্থি।
প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত।
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে-পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা ত' অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেতে তবু ত' ভোরের বীজ বুনছি।
আমাদের বিক্ষত চিত্তে
জীবনে জীবনে অস্তিত্বে
কাল-নাগ ফণা উৎক্ষিপ্ত
বারবার হলাহল মাখছি,
হ'তে পারি পথশ্রমে আরও বিধ্বস্ত
ধিক্কৃত নয় তবু চিত্ত
আমরা ত' সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।
আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী

আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ-বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই,
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন সূর্যশিখা জ্বলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

সেই সময় 'নবজাতকে' এই কবিতাটি উদ্ধৃত করে আমি লিখেছিলাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে, বাঙ্গালীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নূতন করে স্মরণ হচ্ছে—

"দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়—
মৃত্যু যারা এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে নেয় বাঁচতে তারাই জানে।"

'নবজাতক' প্রকাশের উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের ছাত্র, লেখক, চিন্তাবিদ্, সকলের সঙ্গেই আমরা একটি সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। আমাদের কাছে কখনো পোস্টে, কখনো গোপনে লেখা আসতো। সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নাম করা পত্র পত্রিকায় এঁদের লেখা দেখা যেত না। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ দেশে পূর্ববঙ্গে বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীর এই সমূহ পরিবর্তন হয় লক্ষ্য হয়নি নয় লক্ষ্য হয়ে থাকলেও পাত্তা পায়নি।

তারপর ক্রমে ক্রমে ভাষা আন্দোলনের খবর এসে পৌঁছতে লাগল একদিকের কাগজে, তবে আগরতলার কেসের মতন বিরাট কেস যাতে মুজিবর রহমানকে ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহিতার অপরাধে কাঠগড়ায় খাড়া করা হয় সে খবরও আমাদের কাগজে খুব বেশী প্রাধান্য পায়নি।

বাংলাদেশের অবস্থার কথা প্রথমে প্রত্যক্ষ জানতে পারি দুটি দম্পতির

কাছ থেকে। এক এনামুল হক ও তার পত্নী, অন্য পল্লীগীতির গায়কটি আব্বাসী ও তাঁর পত্নী। এনামুল হক যাদুঘরে কাজ করতেন। তাই বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ামের সমর বাগচীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। সমর আমাকে বললেন, এনামুল একটি গান কম্পোজ করেছেন। এই সম্বন্ধে ইনি নিজেই খুব উচ্ছ্বসিত এবং কলকাতার কিছু গুণীজনকে শোনাতে চান কিন্তু খুব গোপনে। কারণ তিনি যে সরকারী কাজে এসেছেন, তা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করলে বিপদ হতে পারে। আশ্চর্য ব্যাপার এ যেন শত্রুতা জিইয়ে রাখা। বেশ একটু জমজমাট সভার আয়োজন করেছিলাম। দেখি একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার রিপোর্টার নোট নিচ্ছেন। বহু কষ্টে তাঁকে বিরত করা গেল।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৫ সালে একটি ছোট যুদ্ধ হয়েছিল। তারই কাছাকাছি কোন সময়ে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হল। কাজী সব্য-সাচী আকাশবাণী থেকে আমায় ফোন করে বললেন, "মৈত্রেয়ীদি, বাংলাদেশ থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন। আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই। টেলিফোনে আর বিশেষ কথা বলা উচিত হবে না।" আমি উৎসাহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছু পরে সব্যসাচী ধূলিধূসরিত শ্রান্ত-ক্লান্ত এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হলেন। ভদ্রলোক একটু তোত্‌লা কিন্তু খুব উদ্দীপ্ত। তিনি বলতে লাগলেন তিন দিন হেঁটে নদী পার হয়ে তিনি আসছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। প্রায় দুদিন কিছুই খাননি। তিনি এসেছেন ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবেন—'পাঞ্জাবী গুলাগো তাড়াইয়া' দেবেন। এই সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সব্যসাচী বলছে সে সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সে কিছুই করতে পারবে না। তাদের কর্তব্য হচ্ছে এক্ষুনি পুলিসে খবর দেওয়া। আমি বললাম, "সরে পড়, দেখি কি করতে পারি।" ভদ্রলোকের নাম ধরা যাক আহ্‌মেদ।

আমি তাকে বললাম, "যুদ্ধ, বিপ্লব বা বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। এ সব বিষয়ে কিছু কবিতা পড়েছি মাত্র। আপনি কি এখানে কাউকে চেনেন বা কেউ কি আপনাকে চেনেন?" তখন লোকটি ইলা মিত্রর নাম করলেন। আমি ভাবলাম ইলাকে ডাকব। বাংলা দেশের লেখকদের নিয়ে উৎসাহে মেতেছিলাম বটে তবে এই যোদ্ধবীরের প্রোগ্রামের

উপযোগী সাহস অভিজ্ঞতা কিছুই আমার ছিল না। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে গেছে। আবার সেই দেশেরই মানুষ গোপনে এসেছে কিংবা গোপনে তাকে পাঠানো হয়েছে কিনা কে জানে। ভদ্রলোককে স্নানের ঘরে পাঠিয়ে, পরিষ্কার পাজামা, পাঞ্জাবি দিয়ে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলাম। তাঁর মতে ঐ ভদ্রলোকটি স্পাই নয়। এত তোত্‌লা কখনো স্পাই হতে পারে না। উনি বললেন, "শারীরিক কোন খুঁত থাকলে সে কি করে ছদ্মবেশ ধরবে?" উনি আরও অনেক ছোট, বড় ব্যাপার লক্ষ্য করছেন, (যা কেবল কোনান ডয়েলের নিবিষ্ট পাঠকরাই পারেন।) যাতে উনি নিঃসন্দেহ এ স্পাই নয়। এবং পুলিসে খবর দেওয়া তাই কিছুতেই চলে না।

আহ্‌মেদ বললেন, ইলা মিত্রকে খুব ভাল করে চেনেন। একসময় ওঁরা একসঙ্গে আফগানিস্তান না কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাশিয়া। তারপরেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন।—ওরা বিশ্বাস-ঘাতক, ওদের সবকিছু অসত্যে ঢাকা, তদুপরি ওরা অপদার্থ। এতদিন পরে লিখতে গিয়ে আমি যে ভাষা ব্যবহার করছি ঠিক সে ভাষায় তিনি বলেননি। অত্যন্ত উগ্রভাবে অজস্র 'কু' বিশেষণ দিয়ে কমিউনিস্টদের কীর্তিকলাপের দীর্ঘ বর্ণনা করতে লাগলেন আহ্‌মেদ। বুঝতে পারলাম ইনি একজন কালাপাহাড়, আগে নিজে কমিউনিস্ট ছিলেন, এখন তাদের পরম শত্রু।

যাহোক, ইতিমধ্যে আমি ইলাকে খবর দিয়েছি। ইলা ও তার স্বামী এসে গেছেন। ইলা একটু সময় নিয়ে চিনতে পারলেন। ইলাকে দেখে আহ্‌মেদের কমিউনিস্টদের গাল পাড়া বহুগুণ বেড়ে গেল। এবং তাদের জন্যই যে দেশ ভাগ হয়েছে এ কথা প্রমাণ করতে বহু দৃষ্টান্ত দিতে লাগলেন। আমার মনে হল এই ভদ্রলোক ইতিহাসের ভাল ছাত্র। নেহরুর বই থেকে বড় বড় উদ্ধৃতি, রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি তো বটেই, আরও বহু দেশী, বিদেশী জ্ঞানীগুণীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি মুখস্থ বলতে লাগলেন। আমি তো চমৎকৃত। এত তো আমি পড়িনি। কিন্তু এর অন্য আচরণের সঙ্গে এই বৈদগ্ধ্যের ঠিক সঙ্গতি হচ্ছিল না। পরে আমার স্বামী বলেছিলেন ও কতগুলি লাগ্‌সই কোটেশন মুখস্থ করেছে। ব্যাপারটা যে তাই তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ইলা ও তার স্বামী ওঁকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু আহ্‌মেদ তাদের প্রতি এতই বিমুখ, যে প্রত্যেক কথার জবাব অতি উগ্রভাবে দিতে লাগলেন। মানুষটির সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তথাকথিত শত্রুদেশে লুকিয়ে ঢুকে

আবার এত হম্বিতম্বি? ইলারা যাবার সময় গোপনে বলে গেলেন, "লোকটাকে হ্যাণ্ডওভার করে দিন। একে স্থান দেওয়া উচিত নয়।"

আমি ভাবছি, হ্যাণ্ডওভার তো করবই। কারণ আমার এই ছোট হাতে এতবড় বিপ্লবীকে ধরতে পারব না তবে কার হাতে হ্যাণ্ডওভার করব? তখন আমি পান্নালাল দাশগুপ্তকে খবর দিলাম। উনি এ বিষয়ে আমাদের মতই উৎসাহী। এবং আমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলে উৎসাহের জোরও বেশী। তবে ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পার্থক্য ছিল। আমি তো রাজনৈতিক ফলাফল ভাবছিলাম না। আমি ভাবছিলাম এতদিন পরে ধর্মের কারণে দ্বিজাতি তত্ত্ব একেবারে ভুল প্রমাণিত হল, হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ঘুচল। **Prodigal son** ঘরে ফিরে এল। এই ফেরাটা মানসিক হলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এর জন্য রাজনৈতিক ফেরা অর্থাৎ দুই দেশ এক হওয়ার স্বপ্ন আমি দেখছিলাম না।

যে মাসে যে বছরে আমার নবজাতক প্রকাশ পায়, সেই বছর সেই মাস থেকে পান্নালাল দাশগুপ্ত "কম্পাস" নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে থাকেন। তাতে শকুন্তল সেন নামে একজন একটি রোমাঞ্চকর রিপোর্ট লেখেন। পান্নালালবাবুর উৎসাহে তিনি ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা লেখেন। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে তখন এ দেশের হিন্দুদের এত ভয় মনে হয় যেন ও দেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসের মুখগহ্বরে ঢুকে যাবে। তাই শকুন্তল সেন পাম্প্ স্যু আর চেক্ লুঙ্গি পরে নকল মুসলমান সেজে গিয়েছিলেন। পরে শুনেছি পাকিস্তানের মুসলমানদের মনেও নাকি ভারত সম্বন্ধে এই ভীতি ছিল। তবে এ কথাটা বোধহয় সত্য নয়। তাহলে একাত্তর সালে এত মুসলমান শরণার্থী ঢুকল কি করে? যাই হোক এ ব্যাপারে পান্নাবাবুর উৎসাহ জানতাম। বিশেষ করে রাজনৈতিক গুপ্ত কাজে তাঁর আগ্রহ। তাই তাঁকে ফোন করলাম। কারণ ইলাদের কথায় আমি রাজী হতে পারলাম না। লোকটির সম্বন্ধে আমার একটা মিশ্রভাব হচ্ছিল। একবার মনে হয় সৎ একবার মনে হয় পাগল, আবার ছদ্মবেশীও মনে হয়। আমার ফোন পেয়ে পান্নাবাবু বললেন, "আমি এখুনি আসছি, ওকে ধরে রাখুন।" ধরে রাখা বেশী কঠিন ছিল না, দু'দিন অনাহারের পর তিনি খাওয়া-দাওয়া করে গা এলিয়ে বসে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন। পান্নাবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছলেন। দু'চারটে কথা বলে ওঁকে নিয়ে চলে গেলেন। ডিসেম্বর মাস, ওঁর বিছানা কিছু যোগাড় করে দিতে বললেন। ওঁকে নিয়ে দিল্লী

যাবেন, উনি যে মহৎ কর্মে এসেছেন তার সহায়তা করতে হবে। ওঁকে নিয়ে দিল্লী চলে গেলেন পান্নাবাবু।

তখন বোধহয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী রাশিয়া যাবার মুখে। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল কিনা জানি না। ওঁরা ফিরে এলেন। অল্প পরেই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ এল। দিল্লী তখন নিজের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত। কে আহ্‌মেদের 'আহাম্মকি' শুনতে যাচ্ছে। পান্নাবাবু বেচারা বোঝাটি ঘাড়ে করে ফিরলেন। প্রায় মাসাধিক কাল তাঁকে একটি হোটেলে লুকিয়ে রেখে তাঁর ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করলেন। আমি মাত্র একটি কম্বল কিনে দিয়েছিলাম। আহ্‌মেদ প্রায়ই পালিয়ে পালিয়ে আমার কাছে আসতেন। পান্নাবাবু আর তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করলেন না। তাঁকে ফেরত পাঠাবার কাহিনীও রোমাঞ্চকর। শুনেছি, বি. এস. এফ-এর কোন সহৃদয় কর্মচারী তাঁকে আহারাদি করিয়ে মধ্যরাত্রে নদী পার করে দেয়। পান্নাবাবুকেও বোধহয় জলে নামতে হয়েছিল।

এই হল আহ্‌মেদের মুক্তি অভিযানের প্রথম পর্ব। তারপরে তিনি বার-বারই এসেছেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন দেশ স্বাধীন হলে তিনি অবশ্যই প্রেসিডেন্ট হবেন। আমাদের হাসি পেত বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। বাঙালী স্বাধীন হবেই এবং তিনি হবেন তাদের চূড়ামণি। এই গল্পের একটি **moral** আছে। যা সেদিন বুঝতে পারিনি। প্রত্যেক দ্বিতীয় বাংলাদেশী মনে করে একমাত্র সেই প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্য। তারই ফলে আজ এই অবস্থা। এখন মনে হয় **motivation**টা কি ছিল। সেদিনকার বিদ্রোহের মূলে উদ্দেশ্যগুলি নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। একজন শিক্ষিত মানুষ চাইছিলেন ধর্মান্ধতা থেকে বুদ্ধির মুক্তি। আমাদের কাছে অবশ্য সেটাই ছিল আসল মুক্তি। কিন্তু যারা রাজনীতির খেলোয়াড় তারা ভাবছিল অন্য কথা। তাদের লোভ যে কতখানি, তা দেশ স্বাধীন হবার পর বুঝতে পারলাম। তখন অনায়াসে মসনদের লোভে সেই চিরাচরিত ছুরির ঝলকানি দেখা গেল॥

৪

২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে কাগজে ঢাকার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হল, পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হয়ে যায়। আজ পশ্চিম পাকিস্তানেও এই ব্যাপার শুরু হয়েছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের তত মাথা-ব্যথা নেই। লেবাননের জন্য, আরবদের জন্য, পলপটের রাজত্বে লাওসিয়ান-

দের জন্য যে রকম দুঃখ হয় ততটুকুই, মানুষ অত্যাচারিত হলে অন্য মানুষদের ব্যথা লাগবেই। কিন্তু বাংলাদেশে বাঙালীর ওপর অত্যাচার হলে, সেদিন যা হয়েছিল সে অন্য রকম। পাকিস্তানীদের সে গুলিবর্ষণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর বুকেও এসে লেগেছিল। ২৬ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটে অন্য বিষয়ে সেমিনার ছিল। সেখানে বিদগ্ধজন উপস্থিত থাকবেন। যাচ্ছি, কিন্তু যেতে পা উঠছে না। অন্য কোন সমস্যা যেন আর মনেই নেই। সভাস্থলে পৌঁছে দেখি সকলেরই এক অবস্থা। নির্ধারিত বিষয় কোথায় উড়ে গেল, বাংলাদেশের সমস্যাই আলোচিত হতে লাগল উত্তেজিত ভাবে। যেন এখনই আমাদের কিছু করা উচিত।

শ্রীমতী গৌরী আমাকে ফোন করলেন—'ওরা পড়ে পড়ে মার খাবে আর আমরা বসে বসে দেখব?' তাঁর গলায় কান্না। দুদিন বাদ দিয়ে ২৮শে মার্চ ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ' মিটিং ডাকল। সভাগৃহে লোক উপচে পড়ছে। অত অল্প সময়ের মধ্যে অত লোক দেখে বুঝলাম এই বাংলা দেশের চিত্তও কিরকম মথিত হয়ে উঠেছে। সেদিন আমাদের আমন্ত্রণে যাঁরা যাঁরা এসে বক্তৃতা করেছিলেন, তার মধ্যে অম্লান দত্তের বক্তৃতা আমার সবচেয়ে মনে আছে। কিছুদিন আগে নকশাল আন্দোলন নামে অভিহিত আন্দোলনে গুরু লঘু হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বাঙালী ছেলেরা। নরহত্যা করা যেন ছেলেখেলা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অম্লান বললেন, "কিছুদিন থেকে বাঙালী পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। আজ আমি গর্বিত। মুজিবর রহমান আমার নীচু মাথা উঁচু করে দিয়েছেন।" সভায় আঁচল পেতে মেয়েরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করল। আমরা স্থির করেছি কিছু করব। কিন্তু কি যে করব তা পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারিনি। আমাদের কেবল মনে হচ্ছে, বাঙালীর এই বিপদে বাঙালীকে দাঁড়াতে হবে। সত্য বলতে কি, আমরা যে কয়জন এই কাজে অগ্রণী হয়ে ছিলাম, অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষুদ্র দলটি—এমন করে বাঙালী বলে নিজেদের কখনো ভাবিনি।

আমাদের চেষ্টাই ছিল মানুষ বলে নিজেদের চিহ্নিত করবার। ভাষা বা ধর্মের গণ্ডী থেকে উত্তরণই ছিল কাম্য। কিন্তু সে সময়ে পূর্ববাংলার উচ্ছ্বাস এবং জয়বাংলার ধ্বনি আমাদের বাঙালিত্ব সম্বন্ধে দারুণ ভাবে সচেতন করে-ছিল। অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষেও কম উত্তেজনা হয়নি। মুসলমান হিন্দুকে ভাই বলে স্বীকার করছে। এতবড় ঘটনা এই উপমহাদেশকে আনন্দে উত্তাল

করে তুলল। যে কারণে দেশকে দু'টুকরো করা হয়েছিল সেই ছুরির ঘা যেন ভিতর থেকে শুকিয়ে গেল। এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। একদিকে মানুষের এত কষ্ট, যুদ্ধের নির্মমতা, অন্যদিকে উৎসাহ, উদ্দীপনা।

যারা একদা পূর্ববঙ্গবাসী ছিলো তারা ভাবল যে স্বাধীনতা বুঝি হয়েই গেছে, এখন ঘরপানে ছুটি। যে যেখানে পারে ভাবছে একবার বাংলা দেশের মাটি ছুঁয়ে আসি। যেন সেখানে গেলেই তাদের সেই হারানো জীবন, হারানো ঘরবাড়ি ফিরে পাবে। অনেকেই বারণ করছিল এভাবে সীমান্ত পার হবার চেষ্টা না করতে। কিন্তু আবেগ ও যুক্তির লড়াইতে আবেগকে পরাজিত করা যাচ্ছিল না। একজনের কাছে শোনা একটা গল্প আমার মনে পড়ছে। তার যখন সাত বছর বয়স, তার বিধবা মা আর সে পুর্ববঙ্গের কোন একটা গ্রামে থাকত। তাল, নারকেল, পুকুরের মাছ, খেজুরের গুড় বিক্রি করে দুজনের ভালই চলত। তিন চারখানা ঘর, বেশ খানিকটা জমি, ভুঁইমালি ভৃত্য এই নিয়ে মা সংসার ভালই চালাচ্ছিলেন। এমন সময় দেশ ভাগ হল। পশ্চিম-বঙ্গ থেকে দলে দলে শরণার্থী ঢুকতে লাগল। গ্রামের মুসলমান মাতব্বরেরা এসে বললেন, ঠাইরাণ্ তোমার তো চারখানা ঘর আছে, একখানা ঘর এই পরিবারকে ছেড়ে দাও। উপায় আর কি। দু'চারটে স্ত্রীলোক ও বেশ অনেক-গুলি পুরুষ একদিন এসে তাদের সবচেয়ে বড় ঘরটি দখল করে নিল। তারপর ক্ষণে ক্ষণে "বৌদি, থালা দিন, ঘটি দিন, বড় হাঁড়িটা বার করে দিন। পানি আনব কলসিটা দিন," চলতেই লাগল। এদিকে বৌদিকে এসে পাড়া প্রতি-বেশী বলছে "এদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা চলবে না, যে কোন দিন বেইজ্জৎ হয়ে যাবে।"

তারপরে একদিন শেষরাতে উঠে মা বললেন, "চল, দক্ষিণ পাড়ার মাসীমা যাচ্ছেন, ইণ্ডিয়ায় যাই।" দু'খানা ঘরে চাবি লাগিয়ে, চাবিটা আঁচলে বেঁধে মা আমার হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন। একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখলেন মা,—কুয়াশায় ঢাকা ঘরগুলির পাশে কলাগাছটা দুলছে। সেইদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে মা আঁচল থেকে চাবিটা খুলে ফেললেন তারপর মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে নরম মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই সর্বহারা ছেলে আজকে বড় ব্যবসায়ী। টাকা পয়সার অভাব নেই। কিন্তু সেই দিনের সেই অভিজ্ঞতা সে ভুলতে পারে না। মায়ের সেই মলিন মুখ, মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট মার চাবির গোছা, সবই তাকে ক্রমাগত সারাজীবন ধরে সেই খড়ের ঘরগুলির দিকে ডেকেছে। আজকে সুযোগ পেয়ে সে কি

সেই সীমান্তের মাটি না ছুঁয়ে পারে?

অন্যদের মত আমরাও কৌতূহলী। ভাবলাম দেখে আসি না সীমান্তে কি হচ্ছে। আমাদের পথ দেখাচ্ছেন রবের ভাই জামাল। চলেছি আমি, গৌরী, সাধন দত্ত ও তাঁর স্ত্রী। আমরা মাঠ পার হয়ে কাদা ভেঙে এগোচ্ছি। আমি তো হাঁটতে পারি না অর্থাৎ হাঁটতে ভালবাসি না। কিন্তু তখন যেন কোথা থেকে পায়ে বল এসে গেলো। ক্ষেতে সবে চাষ দেওয়া হচ্ছে। ঢেলা ঢেলা মাটি পার হয়ে বহু কষ্টে এগোচ্ছি তারপর নালার মত ছোট্ট নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। সেটাই বোধহয় সীমান্ত রেখা। জলে নেমে পড়া গেল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে, খানা, খন্দ পার হয়ে, হাচোড়-পাচোড় করে ওপারের তীরে উঠে পড়া গেল। একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম জায়গাটার নাম সাতক্ষীরা, নামটা আমার পরিচিত। দেশ ভাগের পূর্বে ওখানে আমার আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ ছিলেন। সামনে একটা মাটির উঁচু ভিটার ঘর দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বসবার ঘরটা পৃথক। দুটি তক্তপোশ পাতা, লম্বা করে, উপরে বাঁশ টাঙানো। তাতে লেপ তোশক গুছিয়ে রাখা। আমরা পরিচয় দিলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম যে গৌরীকে ও আমাকে চিনতে পারলেন তাঁরা। বললেন, "আপনারাই তো কাল রেডিওতে আমাদের হয়ে বললেন, চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন আপনারা। তারপর সমাদর একটু বাড়ল। ডাবের জল ও মাখা সন্দেশ খেয়ে আমরা ভিতরে গেলাম। মেয়েরাও দেখলাম খুব রাজনীতি সচেতন এবং বাঙালী মেয়েরা কি করছেন তা বলতে লাগলো।

আমরা ফেরার আগে সবাই মিলে অনুরোধ করলেন, "কিছু বোমা পাঠাবেন। আমরা শুনেছি আপনাদের ছেলেরা খুব ভাল বোমা বাঁধতে পারে।" আমরা তখন ভাল ভাবেই জানি কথাটি কতখানি সত্য এবং এ কাজে আমাদের ছেলেদের কি অদম্য উৎসাহ। যাই হোক আমরা তো বোমার কাজে উৎসাহী নই, আমরা এমন একটা বর্ডার খুঁজছিলাম যেখান থেকে খাদ্য বস্ত্র ও ঔষধ সরবরাহ করে সাহায্য করা যায়। বাংলা দেশে যতই বোমার দরকার থাক, আমি বোমাবাঁধিয়েদের কাছে গিয়ে আবেদন জানাবো না। সেদিন ফেরার পথে সাধন দত্ত মশায় বলেছিলেন যে আমাদের একটি মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান দেবেন। খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম আমরা, তাহলে বিভিন্ন বর্ডারে কাজ করা যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ভ্যান পাওয়া যায়নি।

২৮শে মার্চ আমাদের মিটিং হয়ে গেছে। পরদিন থেকেই টেলিফোন পাচ্ছি। নিরবচ্ছিন্ন লোক আসছে আর ফোন বাজছে। আমরা কি করব, প্ল্যান কি, ব্যক্তিগতভাবে কে কি করতে পারে এই সব প্রশ্ন। আমরা তো অবাক। যে দেশের সাম্প্রদায়িকতার রুদ্র রোষে ভাবনা এত তপ্ত ছিল যেন মুসলমান মাত্রই গুণ্ডা, শয়তান, "গরুখোরদের বিশ্বাস নেই", এই ধরনের কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, তারাই এত উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে? সন্ধ্যাবেলা একজন প্রাণ-উদ্বেল ভদ্রলোককে মুখপাত্র করে একদল ছেলে এসে উপস্থিত। ভদ্রলোকের নাম ডঃ গাঙ্গুলী। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনে কাজ করেন। তাঁরা রুমালে বেঁধে বেঁধে কিছু টাকা এনেছিলেন। সেগুলো মেঝের ওপর ঢেলে ফেললেন। বললেন মিটিং থেকে ফিরে গিয়েই এই টাকা তুলেছেন। বললেন, "এই গণ্ডগোলে কত রকম মতলবে কত লোক ঢুকে পড়বে তাই আপনাদের নাম শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে দিয়ে গেলাম।" আমরা আরও টাকা তুলব। সেদিনকার সেই দু'হাজার টাকা যে কি মূল্যবান মনে হয়েছিল যে কি বলব? আমাদের বাড়িতে প্রতিদিনই মিটিং বসত। কাজের প্রোগ্রামে গাঙ্গুলী খুব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বি. এস. এফ.-এর পি. আর. ও সমর বসু গাঙ্গুলীর বন্ধু। তিনি বললেন করিমপুরের দিকে সীমান্তে একজন মুক্তিযোদ্ধার ক্যাপ্টেন আসবেন। তাঁকে কিছু জিনিষ দেওয়া দরকার। তিনি অপেক্ষা করবেন, আমরা কিছু টর্চ, ব্যাটারি, হেলমেট ও জুতো নিয়ে যাব।

আর তখন কল্যাণ, যে **J.A.L**-এ কাজ করে, সে এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী হয়ে পড়ল। তার নিজস্ব কতকগুলো জোরালো মত ছিল। কিভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করতে হবে, কি ভাবে যুদ্ধ করতে হবে সে বিষয়ে তার বিশেষ কতগুলি ধারণা ছিল। সে বলল, আমি এমন একটা জিনিস আনব যা আমাদের খুবই কাজে লাগবে। কিন্তু আগে বলল না জিনিষটা কি। ভোরবেলা একটা ব্যাগ ঘাড়ে করে কল্যাণ ঢুকল। সেটা ভর্তি নাকি ব্যাঙ। মানে জ্যান্ত ব্যাঙ নয়, টিনের তৈরি ব্যাঙ। আসলে একটা বাদ্য যন্ত্র। ছেড়ে দিতেই তীব্র হুইসেল দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো। শুনলাম এগুলি নাকি গুপ্তযুদ্ধের কাজে লাগবে। এত চিৎকার কি করে গুপ্ত থাকবে তা বোঝা শক্ত।

গাঙ্গুলীর গাড়িতে সমর বোসকে নিয়ে আমরা চলেছি। কে কে ছিলাম মনে নেই। কল্যাণকে আমরা 'জ্যাল' বলেই ডাকতাম। জ্যাল বলছে, এবার

ঝাঁপিয়ে পড়া চাই, আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু না ঝাঁপিয়ে প্রকাণ্ড এক গাড়ি চড়ে এক সীমান্তের দিকে দৌড়চ্ছি, ঠিক কোন্ স্থান থেকে আমরা সেই গুপ্ত-স্থানের দিকে ঢুকলাম মনে পড়ে না। যাই হোক সেখানে এক গাট্টাগোট্টা ভদ্রলোক যিনি নাকি মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলাম অনেকে অনেক কিছু ডোনেট করে গেছে। বিশেষতঃ একগাদা ব্যাটারির স্তূপ দেখলাম। আমরা আমাদের জিনিসপত্র নামালাম। যদিও আমাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতির তুলনায় জিনিসগুলি সামান্যই। কমাণ্ডার দেখলাম বেশ অসন্তুষ্ট। তাঁকে কেউ খবর দিয়েছিল আমরা একটি জীপ উপহার নিয়ে আসছি। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিনা প্রচুর টিনের ব্যাঙ। ঐ ব্যাঙ বনেবাদাড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এ কল্পনায় তিনি সুখ পেলেন না। সমরও খুব রাগ করতে লাগলেন। বোধহয় গাঙ্গুলী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে থাকবে জীপ পাওয়া যাবে। পরে কমাণ্ডারটির মেজাজ শান্ত হলে তাঁর কাছ থেকে শুনতে পেলাম পাকিস্তানের ভিতরে যে অত্যাচার শুরু হয়েছে সেই কাহিনী।

এই সময় দলে দলে লোক সীমান্তের দিকে ছুটছিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল দু দেশ বুঝি একই হয়ে গেছে। কেউ বা ভাবছিল ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্মার ইলিশ। সেই সোনার স্বপন, সাধের সাধনা পূর্ণ হয়েছে, রূপসী পূর্ব বাংলার দরজা মুক্ত হয়েছে। যত ওপার থেকে 'জয়বাংলা' ধ্বনি ভেসে আসে তত এপার থেকে মানুষের আবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে। সকলের আবেগ যে একই কারণে তা নয়। যারা ওদেশের মানুষ, ওদেশের স্মৃতি যাদের মর্মে মর্মে গাঁথা, দেশের জন্য চোখের জল যাদের আজও শুকায় নি, যারা আতঙ্কিত হয়ে ভিটে ছেড়ে এসেছিল, কলকাতা শহরের ইটের উত্তাপে যাদের শরীরে জ্বালা, প্রিয়ার আলিঙ্গনের চেয়েও মধুর নারিকেলের বাগানের বাতাসের জন্য যাদের শরীর ব্যাকুল. তাদের কাছে বাংলা দেশের দরজা খোলার অর্থ অনেক বেশী ব্যক্তিগত।

আমরা বিশেষ করে যারা ঠিক সে ভাবে ভাবিত নই, আমাদের উচ্ছ্বাস একেবারেই ভিন্ন কারণে। আমার পিতা যদিও বরিশালের সন্তান তবুও আমরা তিন পুরুষ কলকাতাতেই আছি। কার্যপলক্ষ্যে আমার পিতা চট্টগ্রামে ছিলেন, জীবনের প্রথম দশ বছর ঐখানে কাটিয়েছিলাম বলে চট্টগ্রামের স্মৃতি আমার মনে আছে। বড় সুন্দর দেশ চট্টগ্রাম। একদিকে কর্ণফূলী নদী ও সমুদ্র মিশেছে। তার বিস্তৃত বালুকাময় তীর ইতস্তত

নয়নতারা ফুলে ঢাকা। অন্যদিকে ছোট ছোট পাহাড়, নানা ফুলে সাজানো। সবচেয়ে সুন্দর ফুল শাটি ফুল। শাটি গাছ হলুদ গাছের মতন। গায়ে গায়ে ফুল বেরিয়ে তার থেকে একটি গোটা শীষ বেরিয়ে আসে। আর চট্টগ্রামের মানুষরা সরল ভদ্র। ওখানে কোনদিন হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়-নি। এই দুষ্কর্মটি ঘটেছে সবচেয়ে Sophisticated ঢাকায় বেশী। বরিশালের মানুষরা রাগী বটে কিন্তু সে রাগ তারা বেছে বেছে ভিন্ন ধর্মীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে প্রকাশ করে না। রাগের কারণ ঘটলে রাগে।

স্বদেশে ফেরার ইচ্ছে বা উৎসাহ আমাদের মাতিয়ে তোলে নি। আমরা আহ্লাদিত হয়েছিলাম, মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে, যা তাদের লেখায় কর্মে রাজনীতিতে এমন প্রবল ভাবে ঘোষিত হচ্ছিল।

প্রতিদিনই আমাদের মিটিং বসছিল। প্রতিদিনই বাংলাদেশ থেকে কেউ না কেউ এসে পৌঁছচ্ছিল ও কয়েকটি উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছিল। মহা উৎসাহে আমরা তাদের বক্তৃতা টেপ করতাম আবার জেরাও করতাম। কথা একটু এদিক ওদিক হলে বেশ সন্দেহ হত। এ সব কাজের সঙ্গে চায়ের স্রোত বইত। যেন উৎসব। এক দিকে এত যন্ত্রণার খবর, গৃহচ্যুত, পথশ্রান্ত মানুষদের, অন্য-দিকে কি বিপুল উৎসাহ—বাংলার জয় হবেই—"জয় বাংলা"। সব মিলে এই যে এক আশ্চর্য পরিস্থিতি, এ রকম আমার অভিজ্ঞতায় আগে ঘটে নি। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অসুস্থ আবু সয়ীদ আইয়ুব শারী-রিক ভাবে উপস্থিত না থাকলেও, দিলেন একটি প্রেরণা। তাঁর স্ত্রী গৌরী আইয়ুব তো সাংগঠিকা। জাঙ্গিস মামুদ ও আবদুল রবের কাছে খবর আসত বেশী। আমাদের দুঃখ ছিল যে এই সময়ে কাজী আব্দুল ওদুদ মারা গিয়ে-ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী। একদা ঢাকায় "বুদ্ধির মুক্তি" বলে যে আন্দোলন তাঁরা শুরু করেছিলেন, সেটাই মনে করা যায় আজকের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। আমাদের কমিটিতে যাঁরা ছিলেন, আরতি সেন, প্রফেসর নির্মল চ্যাটার্জী, সমর বাগচী এঁরা সব উৎসাহ নিয়ে কাজ করছিলেন। এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন। সকলের নাম এখানে স্মরণ করতে পারছি না। তাঁরা যেন ক্ষমা করে নেন।

এই সূত্রে বলতে হবে, যে অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানই বাংলা দেশের আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। এটা আশ্চর্যের নয়। কারণ পাকিস্তান তৈরীর মূলে এদের যে মনোভাব ছিল সেই মনোভাব সংশোধনের জন্য কোন

চিকিৎসাই করা হয় নি। এঁরা কেউ পাকিস্তানে থাকেন নি তাই সেখানকার সুবিধা-অসুবিধা কিছুই বোঝেন নি। ভাষা আন্দোলনের মানেটা তো একেবারেই বোঝেন নি। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা যখন ধাপে ধাপে বাড়ছিল, বাংলা ভাষাটাকে দুমড়ে মুচড়ে একটা মুসলমানী বাংলা তৈরী করবার ও হিন্দু ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। ধর্মের কারণে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ভেদের প্রচেষ্টা চলছিল, ভাষা যদি এক হয় তা হলে তা সফল করা কঠিন। এ বিষয়ে আমি কিছুটা লিখেছি। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল। আমরা শুনেছি পাকিস্তান সৃষ্টি হবার অব্যবহিত পরেই জিন্নাহার মিটিং-এ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন বাঙালী যুবকবৃন্দ। সেই থেকে ভাষা আন্দোলন ধূমায়িত হয়েছে ধীরে ধীরে। ক্রমে স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল।

বলতে গেলে বাংলা দেশে তখন যা ঘটছিল, তা আমাদের কাছে মুসলীম রেনেশাঁস বলে মনে হচ্ছিল। যে কোন পুনরুজ্জীবনই আনন্দজনক।

বাংলা দেশের বিষয়ে আর বেশী কিছু লেখার আগে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা সেই সময়ে (১৯৬৭-১৯৬৯) কি ছিল তা একটু আলোচনা করা দরকার। এবং সে সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের ভূমিকাটা কি তাও কিছু লিখব। পশ্চিমবঙ্গে তখন নকশাল আন্দোলন চলছিল। নকশালবাড়ি বলে নকশাল আন্দোলন উত্তরবঙ্গের একটি গ্রাম থেকে শুরু হয়েছে বলে এইরকম নামকরণ। তা ছাড়া আর কোন প্রকৃষ্ট অর্থ নেই। ঐ স্থানে কৃষক ও জোদ্দারদের মধ্যে যে লড়াই সেটা একটি অর্থনৈতিক লড়াই বলে আমরা মনে করেছিলাম। এর মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের উত্তেজনা আছে। কিন্তু এ ধনী দরিদ্রের লড়াই শুধু ধনী দরিদ্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকল না, ক্রমে ক্রমে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হল প্রেসিডেন্সি কলেজে তাণ্ডব নৃত্য। ছেলেরা যে কি চায় তা আমার মত অনেকেরই মাথায় ঢুকছিল না। এই সময় অসীম চ্যাটার্জী (কাকা) ও দীপাঞ্জন প্রভৃতি আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করে এইটুকু বুঝেছিলাম, যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে তারা কাজ করছিল। তাদের অন্তঃসারশূন্যতা, মিথ্যাচরণ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে তারা রাজনীতির ওপর আস্থা তো হারিয়ে ফেলেছিলই, বর্তমানে সমাজব্যবস্থার উপরে ও শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও তাদের আস্থা ছিল না। এসব নিপাত

যাক। তারা নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়বে। যা আছে তাকে তছনছ করে দেবে। সেই তছনছ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তার ওপরে কি সৌধ উঠবে তার কোন প্ল্যান পাইনি। ফলে দেশ জুড়ে এক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। নির্বিচারে হত্যা চলতে লাগল।

তার মধ্যে গুণ্ডা, খুনী, দাঙ্গাবাজ সব ঢুকে পড়ল। আবার শত শত সৎ, বুদ্ধিমান, স্বার্থত্যাগী উন্মুখ বালক ও যুবকের ভীষণ মৃত্যু ঘটতে লাগল। কিন্তু জীবন দিলেই তো একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কি কারণে জীবন-দান বা কি কারণে প্রাণ নেওয়া তার ওপরেই এর মূল্য নির্ভর করে। সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছিলাম না। চৌরাস্তায় দাঁড়ানো একটি গরীব ট্রাফিক পুলিসকে মেরে ফেলে কি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হবে? চীনের কালচারাল রেভোলিউশনের কথা শুনেছিলাম এবং এটা যে তারই অনুকরণ তাও শুনছি। কিন্তু সেই চিন্তাটা যে ঠিক কি তা যেমন বোঝা যাচ্ছিল না এবং এ দেশে তার আমদানির প্রক্রিয়াটা একেবারেই উপযুক্ত মনে হচ্ছিল না। চীনে গিয়ে কাল-চারাল রেভোলিউশনের চরিত্র কতটা বুঝতে পারলাম। যদিও ঐ আন্দোলন চীনেও এখন বহুনিন্দিত তবু তার বক্তব্য একেবারে অর্থশূন্য নয়। এখানে আমি আমার অচেনা চীন থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি, "কালচারাল রেভেউ-লিশনের অর্থ ছিল বর্তমান প্রজন্ম, যারা পূর্বেকার অবস্থা জানে না, যুদ্ধ দেখে নি, মোটামুটি সচ্ছল সমৃদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া সর্বদা সজাগ না থাকলে পূর্বব্যবস্থা ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের মধ্যে কর্তৃত্ব করবার, ভোগ করবার, পরস্বাপহরণ করবার পরশ্রমজীবী হবার চেষ্টাটা সর্বদা মাথা তুলতে চেয়ে সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তিকে বড় করে তুলতে চায়। ওদের ভাষায় সেটা লিউ শাউ চী'র লাইন (অন্ততঃ আমি যা বুঝেছি)। মাওসেতুং বিদায়ের পূর্বে সে সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে দেন। এবং আন্দোলনটা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চীন দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম হচ্ছে ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রলেতারিয়েত। অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের প্রাধান্য থাকবে সর্বক্ষেত্রে, এমন কি শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। তা না হলে সর্বত্র অসাম্য বাড়তেই থাকবে। এবং মাথার উপর কর্তৃত্বের যে এক বিরাট কাঠামো তার নীচের মানুষদের এমন কি ছাত্রদেরও দমন করে পিষ্ট করে ফেলবে। কালচারাল রেভোলিউশনের পূর্বে পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল, সাম্রাজ্যবাদীদেরই ব্যবস্থার অনুকরণে। প্রায় মানুষমারা কল। জুনিয়র ও সিনিয়র মিডিল্ স্কুল ও কলেজ—সর্বত্রই পড়ার চাপে ছেলে-মেয়েরা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। সর্বদা

ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে একটা টেনশন চলেছে। প্রশ্নগুলো যেন ছাত্র ঠকাবার জন্য করা। যেন একটা অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ছাত্র ও শিক্ষকদের পরস্পরের শত্রু করে রেখেছে। এই ভাবনা নষ্ট করে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার জন্যই এই কালচারাল রেভোলিউশন।”

আমাদের দেশে চীনের অনুকরণে শহরে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার সূত্রপাত করেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাই। যেহেতু চীন অনেক দূরের দেশ, সেখান থেকে খবরাখবর ভালমত আসে না তাই অনুকরণগুলো ঠিকমত হচ্ছিল না। এ দেশে ছেলেরা ভাবছিল যে চীনে বোধহয় পুরনো ঐতিহ্যের সবকিছুই মুছে ফেলা হচ্ছে। সেজন্য এখানেও সেই পন্থায় বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর মুণ্ডুটা দিল উড়িয়ে। এটা সম্ভবত কনফিউসিয়সের প্রতি বিরাগের অনুকরণে। আমি চীনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কনফিউসিয়সের মত বিরাট দার্শনিককে তোমরা বাদ করে দিচ্ছ কেন? তাতে যা উত্তর শুনেছিলাম তা এই রকম—কনফিউসিয়সের কোন লেখা তুমি পড়েছ? আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম না, সব কিছুই কি পড়ে জানতে হবে। তুমি কি ‘ত্রিপিটক’ পড়েছ, তাই বলে বুদ্ধদেব যে বিরাট ধর্মপ্রচারক ছিলেন তা কি তুমি জান না? চীনা বন্ধু মং বললেন, তবে বলি শোন, কনফিউসিয়াস অনেক ভাল কথা লিখেছেন বটে, তবে এও লিখেছেন যে মেয়েদের স্থান উনুনের পাশে। এ উপদেশ যদি মানতাম তাহলে কি আজ চীন যেখানে পৌঁছেছে তা পৌঁছতে পারত? আমি হেসে বললাম—বটেই তো। তবে আমিই বা কি উনুনের পাশটি ছেড়ে একা একা তোমাদের দেশে আসতে পারতাম! আমার মনে পড়ে গেল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা “আর কটা দিন সবুর কর। পাবেই পাবে দেখতে পাবে আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।” বাঙালী মেয়ের প্রতি এই বিদ্রূপ, অর্থাৎ সবচেয়ে উপদ্রুত, সবচেয়ে শোষিত, মানুষের প্রতি এই বিদ্রূপ প্রমাণ করে এ কবির মুখ ছিল পেছন দিকে ফেরানো। কাছাকাছি সময়ে আরেক কবি লিখলেন—“না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।” দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। একজনের মুখ পিছনের দিকে, আরেকজনের মুখ সামনের দিকে। এই দুই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে পশ্চাৎমুখী যে তাঁকে তো আমাদের বাদ দিতেই হয়। তা না হলে সামনে এগোনো চলে না। মনুর উপদেশ মানলে তো এখনো গৌরী দান করতে হত। সেই রকম কনফিউসিয়াসের মধ্যে যে রকম পশ্চাৎমুখী চিন্তা সেগুলোকে বাদ দেবার জন্য কন-

ফিউসিয়াসের প্রতি ভক্তিটা কমিয়ে আনার দরকার ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেরা ভাবলে যে এখানেও গুরু স্থানীয় ব্যক্তিদের হঠাতে হবে। তাই দাও বিদ্যাসাগরের মথাটা উড়িয়ে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো পশ্চাৎমুখী ছিলেন না, তাঁর মন একশো বছর এগিয়ে ছিল। কাজেই মূর্তি থেকে তাঁর মুণ্ডুটা কেটে দেওয়ার অর্থ এই যে, চীনের যে আন্দোলনের এরা অনুকরণ করছিল তার প্রকৃত তাৎপর্য এরা কিছুই বোঝে নি। ক্রমে নকশাল আন্দোলন এক ভয়াবহ আকার নিল। কার মাথা যে কখন গড়িয়ে পড়বে তা কেউ জানে না। অপরদিকে শুরু হল জেলের মধ্যে নিষ্ঠুর অত্যাচার। নেতারা নিশ্চুপ। কেউ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বীভৎসতার নিন্দা করতে রাজী নয়। দেশ জুড়ে এক তাণ্ডব চলেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান নানা জায়গায় ছোট ছোট মিটিং করছিল, আমরা তো হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ঘটাবার জন্যে সংগঠন করেছি। আমাদের কাজ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করা, দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিভেদ ঘোচানো এবং তার জন্য কুসংস্কার দূর করা। আমাদের একটা ধারণা ছিল কুসংস্কার দূর হলে, মানুষের মন যুক্তিবাদী হলে, বিভেদ ঘুচে যাবে কিন্তু যে কাণ্ডটা শুরু হল তা তো অন্য। এরা তো সব কমিউনিস্ট। আর কমিউনিস্টরা নাকি সবচেয়ে যুক্তিবাদী, কুসংস্কারের গোড়া পত্তন যে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা তারা তো সবই উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এমন ভয়াবহ কাণ্ড হিন্দু মুসলমানরা করে উঠতে পারে নি কোন দিন। ধর্মীয় দাঙ্গার চেয়ে রাজনৈতিক দাঙ্গা হিংস্রতর। ইউনাইটেড লেফ্‌ট্‌ ফ্রণ্ট (U.L.F)-এর সময় থেকেই খুনোখুনীর বীভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি। এই রকম সময়ে একদিন আমরা কয়েকজন অর্থাৎ আমি, পান্নালাল দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নির্মল চ্যাটার্জী ও বিপিন পালের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল ঠিক করলাম নেতাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে অনুরোধ করব যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আবেদন প্রকাশ করা হবে —ব্যক্তিগত হত্যায় কোন ফল নেই।

আবেদনে সই করবেন বিভিন্ন দলের নেতা। যাঁরা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হলেও অন্ততঃ এইটুকুতে রাজি যে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচারে হত্যা ইত্যাদির দ্বারা কোন মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। কিন্তু এরকম একটা আবেদনে সবাইকে দিয়ে সই করানো বড়ই কঠিন হয়ে পড়ল। দেশ জুড়ে যে ভয়ানক ব্যাপার চলেছে তার দায়িত্ব কেউ নেবে না, বা এগিয়ে এসে থামাবার চেষ্টা করবে না, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা একেবারেই যেন কর্ণধারহীন একটা শতছিদ্র তরণী। এই সময়কার কথা একটু বিস্তারিতভাবে লিখছি—আমাদের সমগ্র বাহিনীর সঙ্গে

এর যোগ আছে বলে। আমরা উপরোক্ত চারজন প্রথম জ্যোতি বসুর বাড়ি গেলাম। দরজার সামনে সি. আর. পির গাড়ি দাঁড়ানো, তু'ধারে পুলিস, উপরে দোতলার বসার ঘরে উত্তেজিত জ্যোতি বসু। এখন বুঝতে পারি সেই সময়ে নেতাদের উত্তেজনার কারণ অনেকখানি ছিল। তাঁরা কেউ হাল ধরতে পারছিলেন না। কতগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে সমস্ত যেন ওলট-পালট করে দিচ্ছিল, যাদের পুরোপুরি নিন্দাও করা যায় না। কারণ তারা জন্ম নিয়েছে এই সব নেতাদেরই কতগুলি বিভ্রান্ত চিন্তা থেকে। একদিন যারা এঁদেরই শিষ্য ছিল এখন সেই সব ছেলেদের পুলিস হাত পা পিটিয়ে ভাঙছে। অথচ এদের বলার বা কওয়ার কিছু নেই। নেতৃবৃন্দের অসহায় অবস্থা আজ ভাল করে বুঝতে পারি। কিন্তু সেদিন তাঁদের উপর খুবই রাগ হয়েছিল।

আমরা চারজনে বসলাম। জ্যোতিবাবু সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাদের দেখছেন। এই রকম একটা অসম জোটের কি প্রস্তাব থাকতে পারে? আমি প্রথম আমাদের কথা বললাম, আমরা একটা স্টেটমেণ্ট লিখে এনেছি।—স্টেটমেণ্টটা কিন্তু ভাল লেখা হয়েছিল। আমি আর পান্নাবাবু তুজনেই তো লেখক, কাজেই ভাষাটা বোধহয় সুপাঠ্য হয়েছিল।

কে জানে হয়ত সেই কারণেই জ্যোতিবাবু বেশ রেগে উঠলেন। আমি তবু বলতেই লাগলাম—"আমরা চাই আপনারা সকলে এতে সই করুন। আপনি, ভবানীবাবু, প্রফুল্ল সেন ইত্যাদি সকলেই। আপনারা বলুন যে এই রকম ব্যক্তিগত নরহত্যায় কোন রাজনৈতিক সুফল হয় না।" জ্যোতিবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন—"দেখুন মৈত্রেয়ী দেবী, আপনি কবিতা-টবিতা করেন সেই তো ভালো, তাই নিয়েই থাকুন না, রাজনীতি কবিতা নয়।" আমি তর্ক চালাচ্ছি—"রাজনীতি বা কোন নীতিই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। ধর্ম, ন্যায়, নীতি কিছুই এখানে নেই। এ তো খুন, নরহত্যা এবং বীভৎস নৃশংস নরহত্যা।"

"তা যদি বলেন তাহলে আমাদের কতগুলো মরেছে তা জানেন? ২০০টি আর ঐ ওদের ষাটটাও নয়। ওরা যদি বোমা ছোঁড়ে তবে আমরা কি রসগোল্লা ছুঁড়ব?" যদি শান্তি চান আপনাকে লিস্ট দিচ্ছি ঐ খুনেগুলোকে ধরিয়ে দিন।" এত দিন পরে লিখছি, কথার একটু এদিক ওদিক হতে পারে। তবে মোটের ওপর এরকম আলোচনা চলছিল—"দেখুন জ্যোতিবাবু, আমি তো পুলিসের ইনফর্মার নই যে ওদের দেবো। আপনার লিস্ট আমার কোন কাজে লাগবে না। আপনি বলছেন আপনাদের ২০০টি ছেলে মরেছে, ওদের

ষাটটি মাত্র, কিন্তু আমি জানি এই ২৬০টি ছেলেই আমার, আমাদের, এদের প্রত্যেকের মৃত্যুই—"

"আপনার কবিতা রাখুন।"

নির্মলবাবু বলবার চেষ্টা করলেন—"না না কবিতা নয়, উনি বলছেন মা হিসাবে। আমিও মাস্টার, সেই হিসাবে আমিও মনে করি এ সব ছেলেই আমার।"

জ্যোতিবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে পান্নাবাবুর দিকে ফিরে বললেন—"আপনিও যে এঁদের দলে ভিড়েছেন দেখছি। আপনিও শুনেছি গান্ধীবাদী হয়ে পড়েছেন। বেশ।"

এইভাবে কথোপকথন শেষ করে ব্যর্থমনোরথে রাস্তায় নেমে এলাম। পান্নাবাবু এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। উনি উত্তেজিত না হয়েও ভয়ানক ভয়ানক কাজ করতে পারেন। যাহোক এবার তিনি তাঁর স্বভাবসঙ্গত মৃদু-স্বরে বললেন—"দেখলেন কি রকম অপমান করলেন, আমিও কি অপমান করতে পারতুম না, কিন্তু কিছু বললুম না।" আমি বললুম, "পান্নাবাবু, শান্তি-বাদী কথাটা অপমান করা নয়, তবে যে সেটা নিন্দার্থে ব্যবহার করে, সে নিজেকেই নিন্দা করে।"

এরপর আমরা ভবানী সেনের বাড়িতে গেলাম। সেখানে ব্যবহার বিপ-রীত। উনি আমাদের সঙ্গে একমত হলেন, এবং সই করতেও রাজী হলেন। কিন্তু দুই-একজনের সই নিয়ে কিছু ফল হত না। অতঃপর আমরা শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ি এলাম ও সেখানে চা-বিস্কুট সহযোগে নেতাদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করে বাড়ি ফিরলাম। এইভাবে আমাদের একটা শুভ প্রচেষ্টার অপ-মৃত্যু হল।

বাংলা দেশের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নকশাল আন্দোলনের কাহিনী বা আমাদের দৃষ্টিতে কি কি দেখেছি তার কিছুটা বলছি এই কারণে, যে বাংলা-দেশে তখন যা চলছিল, তার সঙ্গে এখানকার ঘটনার একটা দারুণ বৈপরীত্য আমরা লক্ষ্য করছিলাম। বাংলাদেশে যখন কমিউনাল দাঙ্গা হানাহানির ভিত্তিভূমির উপর যুক্তির, বুদ্ধির উজ্জ্বল নিশান তোলা হচ্ছে, তখন এখানে এক নির্বিচার অযৌক্তিক খুনোখুনীতে ভীত পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্লাস থেকে পনের বছরের ছেলেকে বার করে, মুখে বন্দুক ঢুকিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ছাত্র শিক্ষক কেউ বাধা দিতে সাহস পাচ্ছে না। আতঙ্কে সবাই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। একদিকে খুনীর দল অর্থহীন রক্তপাতে উন্মত্ত,

অন্যদিকে কাপুরুষের দল—হাত পা গুটিয়ে ভয়ে কাঁপছে। এমনতর বিশ্রী অবস্থা ইতিহাসে আর ঘটেছে বলে জানি না। এই সময়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান এখানে ওখানে কয়েকটি আলোচনা সভা করেছে এবং জেলের মধ্যে গিয়ে বহু সাধ্য সাধনা করে বন্দী নকশাল ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি আমরা, আমরা কয়েকজন যেতাম। সরকারও এমন বিপদগ্রস্ত যে, সাধারণের পক্ষ থেকে এ প্রচেষ্টাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। প্রথম দিন গিয়েছিলাম প্রফেসর নির্মল চ্যাটার্জী, জ্ঞানাঞ্জন পাল, গৌরকিশোর ঘোষ, ভবানী চট্টোপাধ্যায় ও আমি, ছেলেরা এত সন্দিগ্ধ যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, অবশেষে যদি বা এল, কথা বলতে চায় না। যা হোক অতি কষ্টে দু'চারটে কথা বলবার পর তারা পুলিসের সামনেই তাদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে লাগল। জেলে পুরে তাদের উপর যে, ভীষণ অত্যাচার হয়েছিল, তা অত্যাচারিতের মুখ থেকে সামনা সামনি এই প্রথমে শুনছিলাম, বিপ্লব হালিম জেলারকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"ওর সামনেই বলছি অমুককে জ্বলন্ত স্টোভের উপর বসিয়েছিলেন কিনা?"

বাইরে বেরিয়ে জেলারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা এরকম অত্যাচার করেন কেন?

আর ওরা? ওরা কি করছে?—বলে ওদের নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিবৃত করতে লাগলেন। আমরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—"ওরা এ সব অন্যায় করেছে বলেই তো ওদের জেলে পোরা হয়েছে, বিচার হবে, তারপর বিচারে নির্দিষ্ট সাজা অবশ্যই এরা পাবে। তা না করে এদের জেলে পুরে হাত-পা ভাঙবেন আপনারা? আপনারা তো আরও অনেক জঘন্য অপরাধ করছেন। ওরা ভ্রান্ত, আপনারা দোষী।

তখন জেলার বলছেন—দেখুন, এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে—**There are wheels within wheels** আমরা যদি কিছু মনে না করি সরকার বলবে, আমাদের **sympathy** আছে। আমাদের উন্নতি হবে না। আমরা তো হতবাক।—এই কারণে আপনারা মানুষের হাত-পা ভাঙবেন?"

কদিন ওদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম ওরা, কি করছে, কি ভাবছে, তার কোন যুক্তির বাঁধন নেই। এলোমেলো চিন্তা, এলোমেলো দুর্ধর্ষ রাগ যেন টগবগ করে ফুটছে। আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত সেই ক্রোধ, কিন্তু স্বার্থলেশহীন। সেদিক থেকে পবিত্র। তাই বলে নির্বিচার ধ্বংসের তাণ্ডব তো চলতে দেওয়া যায় না, কিন্তু থামাবে কে? সকলের মুখটি শুকিয়ে চুন। প্রাণটি ইঁদুরের

গর্তে। এই পরিবেশে আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম—যাদবপুর, যেখানে স চেয়ে বেশী তাণ্ডব চলেছে সেইখানে একটা মিটিং করা যাক। ভাইসচান্সেল অনুমতি দিলেন বিশ্ববিত্যালয়ের গান্ধী হলে মিটিং করবার। তিনটের স মিটিং ডাকা হয়েছে, বারোটার সময় পি. সি. ভি. মল্লিক ফোন করে বলে যে উপাচার্য অনুমতি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

নকশালরা নাকি বারবার ফোন করে জানিয়েছে বোমা মেরে স উড়িয়ে দেবে। আমরা বলতে লাগলাম একই লোক বারবার ফোন ক ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনড়। এদিকে সকাল থেকে আমরা অন্যরক টেলিফোন পাচ্ছি। অনেকে উৎসাহ দিচ্ছেন, বলছেন, সবাই যখন চুপচা এবং ভীত, তখন আপনারা সাহস করে কিছু বলছেন এতো অত্যন্ত ভা কথা। একজন কংগ্রেসের নামকরা ব্যক্তি আমায় ফোন করে বললেন- আপনাদের ধন্যবাদ। পুরুষরা যখন চুপচাপ তখন মেয়েরা সাহস করে এগি এসেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি আসছেন তো মিটিং-এ? উ বললেন—নিশ্চয়ই।

'স্টেটসম্যান' থেকে অত্যন্ত উৎসাহ দেখানো হচ্ছে। মিটিং-এর খব প্রকাণ্ড হেড লাইনে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়ে গেছে। এ হেন অবস্থা আমরা হঠাৎ মিটিং বন্ধ করি কি করে? অগত্যা যথাসময়ে 'যাদবপুরে ঢুকলাম। দেখি আমাদের ডাকে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে। তার মধ্যে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে দেখলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এসেছেন? উনি ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনারা এই দুর্যোগে সভা ডেকেছেন আমরা আসব না! মেয়েদের মধ্যেও অনেকেই এসেছিলেন কিন্তু সভা অসম্পূর্ণ রইল। উপাচার্য মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠি সবিনয়ে বলে দিলেন, আমি যেন তৎক্ষণাৎ যাদবপুরের ···প্রাঙ্গণ ছেড়ে চ যাই। সেদিনকার সবগুলি অভিজ্ঞতাই মনে রাখার মত। উপাচার্যের ঘ ঢুকব, দেখি—পি. সি. ভি. মল্লিকের ঘরে অম্লান দত্ত ম্লান মুখে বসে আছেন উনি বললেন—আমি তো আপনার মিটিং-এ যাবো বলেই এসেছিলা কিন্তু এঁরা যেতে দিচ্ছেন না, বলেছেন আমার ওপরই বেশী রাগ। পোস্ট পড়েছে আমিই সবচেয়ে অবাঞ্ছিত। আমি ভাবছিলাম উপাচার্যের ঘ গিয়ে বলব—আপনি অন্যায় করেছেন, আপনি ভীতু। আমি জানতাম ন আমার মধ্যেও একজন ভীতু আছে। কে যে কোন সময় কি কারণে ভ পায় সে নিজেও জানে না। আমি অধ্যাপক বংশের মেয়ে। চিরদিন অধ্য

পকদের ভয় করতে, মান্য করতে শিখেছি আমরা। নকশালদের বোমার চেয়েও ওঁর সামনে দাঁড়াতে মাথা নীচু হয়ে গেল আমার। উনি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আছেন। উনি অধ্যাপক। আমি অবাধ্যতা করে ওঁর প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছি। আমার বয়স যাই হোক, আমি মুখ তুলতে পারছিলাম না। ভৎর্সিত বালিকার মত, ডায়সেসন স্কুলের মিস দাসের সামনে যেমন করে দাঁড়াতাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি বললাম—আমি সবাইকে নিয়ে চলে যাব, কিন্তু এখনও বলছি কোন ভয় পাব্যর কারণ নেই। ওরা আসবে না, যখন বেরিয়ে আসি, তখন দেখি ঘরের কোণে আর এক জন ব্যক্তি মুখের ওপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছেন। আমার সঙ্গে অধ্যাপক শান্তিময় রায় ছিলেন। তিনি বাইরে এসে বললেন ঐ লোকটিকে চিনলেন না। তখন জানলাম উনিই সেই খ্যাতনামা নেতা সকালে আমায় যিনি টেলিফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এত পরিবর্তন। আমি আজ এ কথা লিখছি কাউকে নিন্দা করবার জন্য নয়, শুধু বোঝাবার জন্য যে ভয় সে সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কি রকমভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছিল। যদিও ভয়ের কারণ যথেষ্টই ছিল তবুও রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটিও সত্য—'ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।'

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই উপাচার্য হেমবাবু চলে গেলেন এবং তাঁর জায়গায় নতুন উপাচার্য এলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ গোপাল সেন। তার কয়েকদিন বাদেই আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। কাপুরুষটা তাঁকে পিছন থেকে ছুরি মেরে পালাল। এর পরে কলকাতার মানুষ আর স্থির থাকতে পারেনি। এই ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে মৃতদেহর সঙ্গে এক বিরাট মিছিল নির্ভয়ে, নিস্তব্ধে কয়েক মাইল চলে ছিল, সেদিনকার কলকাতা মিছিলের পায়ে পায়ে ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তা ভুলবার নয়।

তিন দিন পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আমরা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি সভা ডাকি। সেদিন আমি বলেছিলাম, "আমাদের পূর্বের সভাটি করতে দিলে হয়ত আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না।" তবে যাঁরা হত্যা ভালবাসেন তাঁদের বিদ্রূপ বাণী বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা ঘৃণা ভরে বলছিলেন যে এ কোন আগন্তুকের দল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তির ললিত বাণী শোনাতে এসেছে? এখন চাই

রক্তের বদলে রক্ত।—

সেদিনের আর একটি দৃশ্য আমি ভুলব না—মিটিংএ বসে আছেন কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, লাল পাড় শাড়ি পরা কল্যাণী মাতৃমূর্তিরা। এই যাদবপুর অঞ্চলে তখন রক্তের হোলি খেলা চলছে। আমি ভাবছিলাম পরের ছেলের রক্ত মেখে নিজের ছেলে যখন ঘরে ফিরে আসে তখন এ মায়েরা কি এদের সার্ট ধুয়ে দেন, ছুরি মুছে ফেলেন ? এদের অন্তরে কি অন্য মায়ের আর্তনাদ পৌছায় নি ? আমার এটা চিরদিনের বিশ্বাস—একটা দেশের চরিত্র গঠন একটা সমাজের চরিত্র গঠন নির্ভর করে মেয়েদের ওপরে। আজকের এই অর্থগৃধ্নু সমাজের মোড় ফেরাতে পারে মেয়েরাই এবং নৃশংসতাও রোধ করতে পারে তারা। পুরুষের উপর মেয়েদের প্রভাব যদি মঙ্গলের দিকে যেত, যদি বেশীর ভাগ মেয়ে সত্যসত্যই কল্যাণী হতেন তা হলে অন্য সমাজ তৈরী হতে পারত।

নকশাল মুভমেন্টের কথা বলতে গেলে দু'একটি ঘটনা মনের সামনে এসে পড়ে। সেগুলি এখানে লেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নকশালবাড়িতে কি হয়েছিল তা তো চোখে দেখিনি, কলকাতায় নকশাল আন্দোলনের প্রথম উত্তাল রূপটি দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রেসিডেন্সী কলেজ জন্মাবধি আমাদের শ্রদ্ধার পীঠস্থান, প্রায় তীর্থভূমি বললেও চলে। সেখানে তখন ঘৃণার কড়াইতে বিষবাষ্প ফুটিয়ে তুলছে ছেলেরা। সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রটি এই বাষ্পতে বিষাক্ত হয়ে গেল। এর নায়ক কাকা বা অসীম চট্টোপাধ্যায়। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবুও ছোট ছোট ছেলেদের উপর রাগ করে কি হবে এই ভাব নিয়ে কিছুটা বোঝবার চেষ্টায় কাকাকে ডেকে পাঠালাম। তিনি যে আমার ডাকে আসবেন তাও কখনো কল্পনা করিনি। তাঁরা কত উগ্র, কত ক্ষুব্ধ, কত অভিযোগ তাঁদের, আর আমি সমাজের সুখী মানুষ আরামে খেয়ে দেয়ে মোটাসোটা হয়েছি, আমাদের মত মানুষই তো তাঁদের উপযুক্ত লক্ষ্য। লক্ষ্য এঁদের অব্যর্থ নয়, তাই টারগেট যত চওড়া হয় ততোই ভাল। কিন্তু তা তো হলো না, অসীম এলেন এবং আমাকে চমৎকৃত করে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। পর পর বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে অনেক আলোচনা করি। ফলও হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল সনৎ বসু অত্যন্ত ভাল মানুষ ও দুঃখী মানুষ। এই দুই পক্ষের মধ্যে কথা বলে প্রেসিডেন্সী কলেজের দরজা খোলবার জন্য একটা রফা হয়েছিল। কাকারা বলেছিলেন যে ওঁরা নিজ হাতে দেওয়ালে যে কুৎসিত

নিন্দামন্দ লিখেছেন তাও মুছে দেবেন। আর সনৎবাবুকে 'নিপাত যাও' 'নিপাত যাও' বলে যে সব গালমন্দ করেছিলেন তার জন্য পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইবে। সনৎবাবুও রাজী হয়েছিলেন। ছেলেরা প্রণাম করবে, উনি আশীর্বাদ করবেন, ক্ষমা করবেন। কিন্তু একলা ওঁর কথায় তো আর হবে না। তাই গৌরী আয়ুব আর আমি বোর্ডের মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে রাজী করাতে চেষ্টা করলাম। অভিজ্ঞতা যা হল তাকে হাস্যকর বলা চলে। এক এক জন বিশিষ্ট বিশিষ্ট বয়স্ক শিক্ষাবিদ, কিন্তু তাঁরা ছেলেমানুষের মত দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখছেন। একজন হার্টের রুগী, তিনি লাফিয়ে উঠলেন—"কি আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজে **indiscipline** হবে? প্রেসিডেন্সী কলেজে?" তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, গৌরী বলল, চলুন পালাই। ইনি হার্টফেল করলে আমাদের দোষ হবে। আমরা ভাবছিলাম মানুষের বয়স বাড়ে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে না। জগৎটা যে বদলে গেছে এবং যাচ্ছে সেটা এঁরা বুঝতে পারছেন না। বুদ্ধিটা বন্দী হয়ে আছে ছোটবেলার চৌহদ্দির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত সনৎবাবু রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু দু'জন কট্টর অ্যান্টি কমিউনিস্ট তাঁকে বিরত করল। একজনকে বিশ্বাস করে নিয়ে গিয়েছিলাম। যতদূর জানি তিনি এই মিটমাটে গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে 'ভাংচি' তাই দিয়েছিলেন। তিনি আড়ালে বলেছেন—আমি কমিউনিস্ট তাই ইত্যাদি···ইত্যাদি···ইত্যাদি···। এই রকমভাবে রাজনৈতিক খেলায় পক্ষ প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ক্রমে তা একেবারে নীতিশূন্য বোধশূন্য হয়ে পড়েছে। আমার দলে ছেলে খুন হলে সেটা অন্যায়। কিন্তু অন্যের দলের হলে সেটা ন্যায়।

কাকা যেদিন পুরোপুরি নকশাল আন্দোলনে নেবে পড়বার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে গেল, সেদিন সে অনেক রাতে ফোন করেছিল। বিদায় নেবার জন্য। তখন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল, আমারও চোখ শুষ্ক ছিল না। রাজনীতির ব্যাপারে বোধশূন্য হওয়ায় আমি ১৯৬১ সাল থেকে কমিউনিস্টদের খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে কখন এমন বিভেদ হল এবং কতখানি পর্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হল তা বুঝতে পারিনি। এ ব্যাপারটাও যে সি· পি· এমের সঙ্গে তরুণদের মতপার্থক্য থেকে উদ্ভূত তা অনেকে বুঝলেও আমি বুঝিনি। সেদিন আমার কানে শুধু একটি উৎসাহী তরুণ যুবকের বেদনারুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাজছিল এবং আমার চোখ অশ্রুসিক্ত করেছিল। এটা ছিল বোধহয় ১৯৬৮ সাল। তারপর ১৯৭৭ সালে জেল থেকে বেরিয়ে কাকা আমার সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা করতে এসেছিলেন। তখন আমার চীন ভ্রমণের বই "অচেনা চীন"

তিনি পড়েছেন। তাই বললেন "আমরা এত কাণ্ড করে যা করতে পারিনি, আপনি একখানি বই লিখে তা করেছেন। চীনের প্রতি এদেশের মনকে সদয় করেছেন। কথাটা ওঁর কাছ থেকে শুনে বড় ভাল লেগেছিল। লেখকের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছু হতে পারে না। আমি বললাম—এ বিষয়ে তো সন্দেহই নেই যে, pen is mightier than the sword তবু যে কেন লোকে তলোয়ার চালায় তা জানি না।

নকশাল আন্দোলন বহু পরিবারের সর্বনাশ ঘটিয়ে বহু মানুষের প্রাণনাশ করে যখন থামল ঠিক তখনই শুরু হলো বাংলা দেশের যুদ্ধ। সে কথায় ফিরে যাবার আগে আর দু'একটা ঘটনার কথা বলব।

সেটা সম্ভবতঃ সত্তর দশকের শেষাশেষি কোন এক সময় দু'জন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ধরা যাক তাঁদের নাম সুষমা ও লতিকা। দুই বান্ধবী আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে। লতিকার ছেলে জাহাজে একটি উচ্চপদ পেয়েছে। এখন জার্মানীতে আছে। কিন্তু শীঘ্রই ঐ জাহাজ সহ ছেলেটি দেশে এসে পৌঁছবে। আর তখনই শুরু হবে পুলিস enquiry। পুলিস ঐ ছেলেটিকে নকশাল বলে চিহ্নিত করেছে। পুলিসের খাতায় লেখা এই নিন্দাবাক্য বেদবাক্য বলে গণ্য হবে এবং তৎক্ষণাৎ ওর চাকরীটা খোয়া যাবে। বাবা মা এর মুখ চেয়ে আছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি ভাবছি কি করে এঁদের সাহায্য করা যায়। রঞ্জিত গুপ্তর নাম মনে পড়ল, টেলিফোনে একেবারেই পেয়ে গেলাম, ভাগ্য ভাল ছিল। তিনি খুব সাগ্রহে আমার কথা শুনলেন, বললেন, তিনিও মনে করেন এদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা অবশ্যই উচিত। সরকারের কোন প্রতিশোধ স্পৃহা নেই। উনি নাম ঠিকানা সমস্ত হদিশ সব লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে ঐ দুই মহিলা ও তাঁদের একজনের স্বামী এসে জানালেন সব ঠিক হয়ে গেছে। তাঁরা খুব কৃতজ্ঞ। তাঁরা কয়েক দিন যাওয়া আসা করলেন, তারপর একদিন সুষমা ও তাঁর স্বামী তাঁদের ছোট ছেলেটিকে নিয়ে এলেন। তাঁদের দুই ছেলে, বড় ছেলে খুব বিদ্বান, কলকাতার বাইরে কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমি এঁদের নাম করছি না, কারণ এঁদের লোকে চেনে—political পরিবার। ভদ্রলোক বোধহয় ট্রেডইউনিয়ন করতেন। দুজনে বলতে লাগলেন আপনার একটা ফোনে একজনের প্রাণ বেঁচে গেল। আমার ছেলেটিকেও বাঁচান, আমার এই

ছোট ছেলেটির বিরুদ্ধেও খামোকা খারাপ রিপোর্ট পুলিস লিখেছে। ও কোন অন্যায় কাজ করেনি। বন্ধু-বান্ধব নকশাল ছিল এইমাত্র। আজ দু'তিন বৎসর ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে ঢুকতে পারে না। কিছু কাজ করতে পারছে না। ওঁরা অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলাম, বার বার পুলিসকে কি অনুরোধ করব। তাছাড়া আমি এঁদের জানিই বা কি? এমন সময় ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, ধরা যাক তার নাম কুনাল। বছর বাইশ মাত্র বয়স হবে। সে তার পিতামাতার দিকে তাকিয়ে তর্জনী নির্দেশ করে বললে—তোমরা এখান থেকে চলে যও। আমি মাসিমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করব।

কুনালের পিতা-মাতার চোখ বিস্ফারিত—কি বলছিস খোকা, আমরা চলে যাব?—হ্যাঁ, এক্ষুনি চলে যাও, যাও,যাও এখুনি যাও—কুনাল উত্তেজিত, তার পিতা মাতা হতভম্ব। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। আমি বললাম, ও যখন চাইছে আপনারা চলে যান তা হলে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁরা চলে গেলেন। কুনাল এসে আমার পায়ের কাছে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল। বলল—মাসীমা, ওঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি তো খুন করেছি। অবশ্য সে মরেনি, কিন্তু আমি তো ছুরি মেরেছি। তার কাহিনীটা সে ধীরে ধীরে বলে গেল।

মাসিমা, আমি নকশাল বটে, কিন্তু আমি কোন দিন দেশের কথা ভেবে এ আন্দোলনে যোগ দিইনি। দেশ সম্বন্ধে কোন চিন্তা, দেশের মঙ্গল করবার চিন্তা এসব কোনদিনই আমাকে ভাবায়নি। আমি এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম একটা উত্তেজনার সুখ পাওয়ার আনন্দে। তখন স্কুলে পড়ি। ফাইনালের বছর। আমার পড়তে একেবারে ভাল লাগে না। বিশেষত অঙ্কে। এদিকে আমার দাদা খুব পড়ুয়া, খুব ভাল ছেলে। আমি তো পাস করব না সবাই জানে। একদিন আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই বললেন, কুনাল তুমি পড় না কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

—বেশ তো ক্লাবের লাইব্রেরীতে আমার কাছে পড়তে এস।

সেই থেকে তিনি আমায় পড়াতে লাগলেন। দিন পনেরোর মধ্যে আমার অঙ্ক খুব ভাল লাগতে লাগল। আমিও প্রায় পড়ুয়া হয়ে উঠলাম। এমন সময় একদিন মাস্টারমশাই আমায় ডেকে বললেন, জ্ঞানের দুটো পথ আছে, এক বিদ্যাচর্চা, অন্য কর্মের পথ। কর্মের পথে যে জ্ঞানলাভ হয় সেই যথার্থ জ্ঞান, তোমাকে এখন কাজ করত হবে। আমি তো তখনই রাজি।

মাস্টারমশাই বললে আমি তখন মরতে পারি। তারপর আমি কাজে ঢুকলাম, সেকি উদ্দীপনাময় কাজ। আমি আসলে মাসিমা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি এ সব কিছুই বুঝতাম না। দেশের উন্নতির জন্যও আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। শুধু কাজের উত্তেজনাই আমাকে মাতিয়ে তুলল।

—কি কাজ কুনাল?

—ধরুন প্রেসিডেন্সী কলেজের হলে বসে পর পর চল্লিশজন ছেলে বোমা বাঁধছে, তাদের মধ্যে আমিও ঢুকলাম।

—তোমার ভয় করেনি? যদি হাত উড়ে যেত?

—না মাসিমা, জলে হাত ভিজিয়ে নিলে কিছু হয় না। তারপর ধরুন মাস্টারদা বললেন, অমুক লোকটাকে ধরে আন। আমরা দু'জন মিলে তার পিঠে একটা ছুরি ছুঁইয়ে চিৎপুর থেকে বেহালা মাস্টারদাদার কাছে পৌঁছে দিলাম। লোকটা তো ভয়ে কাঠ······

—আর তোমার কৃতকার্যের আনন্দ!

—ঠিক তাই মাসিমা। তবে কাজটা ঠিক কি ভুল, লোকটার কি হল আমরা কিছু জানি না, জানতেও চাই না।

—তারপর?

—তারপর একদিন মাস্টারদা আমাদের দশ-বারোজনকে ডেকে বললেন, সাতদিনের মধ্যে অমুককে সরিয়ে ফেল, অর্থাৎ এ জগৎ থেকে সরিয়ে দাও।

সেদিন উনি কারণটাও বললেন, সেই লোকটি ধরা যাক তার নাম সুবল, সে তো আমাদের বন্ধু এবং আমাদের সকলের প্রিয় পাত্র। তাই মাস্টারদা বললেন সুবল ঘোরতর অন্যায় করেছে। সে পুলিসের ইনফর্মার হয়েছে।"

আমি বললুম, কুনাল, তোমরা ওঁর কথায় বিশ্বাস করলে কেন। উনি জানলেন কি করে?

—বাঃ, কেন জানবেন না? পুলিসের মধ্যেও তো আমাদের লোক ছিল। সেই খবর দিয়েছিল। তাই মাস্টারদার কথা শুনে আমাদের হাত নিশপিশ করতে লাগল। দাদা এক সপ্তাহের কথা বলেছিলেন আমরা সেই দিনই শেষ করব ঠিক করলাম। সন্ধ্যাবেলা দু'জনে গিয়ে বললাম, লাইব্রেরীতে চলুন সুবলদা, কিছু আলোচনা আছে।

লাইব্রেরীতে ঢুকে অতগুলো ছেলে দেখে সুবলদা খুব ঘাবড়ে গেল—একি সব দরজা বন্ধ কেন?

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সুবলদা, তুমি পুলিসকে এই, এই···, এই···

খবর দিয়েছ ?

লোকটা ভীষণ ভয় পেয়ে শুকনো গলায় বলতে চেষ্টা করল—সেটা তো ভালর জন্যই, পুলিসের মন বদলে দেবার জন্যই···

কিন্তু আমরা কোন উত্তর দিতে সময় না দিয়ে ছুরি তুললাম। সকলের হাতেই ছুরি ছিল। খপাখপ ছুরি বসাতে লাগলাম। ঘরটা ছিল অন্ধকার, ওপরের একটা জানালার কোণ দিয়ে এক চিলতে আলো এসে স্থবলদার চোখের উপর পড়েছিল, সেই চোখে আমি যে ভয় দেখেছিলাম তা এই কয়েক বছর ধরে আমার ঘুমের মধ্যে ও ফিরে ফিরে আসে। ভুলতে পারি না।

—তারপর ? তোমরা অতজনে মিলে একটা মানুষকে মারলে ?

কুনাল মুখ তুলে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—হ্যাঁ মাসিমা, আর সেই লোকটি ছিল নিরস্ত্র। স্থবলদাকে বাইশবার ছোরা মারা হয়েছিল। তবু সে মরল না, বেঁচে উঠে সে পুলিসের কাছে আমাদের সকলের নাম বলেছে। তবে সে তো মিথ্যেও বলতে পারে। আমার কেসটা খারাপ করল আমার সাধু চরিত্র দাদা—আমার দাদা তো আমার মা বাবার মত মিথ্যাবাদী নয়, আমার দাদা গান্ধীবাদী। বাবা তাঁকে বলেন—তোকে সবাই সত্যবাদী বলে জানে। তুই পুলিসের কাছে বল তোর ভাই কলকাতায় ছিল না।

দাদা রাজি হল না। বাবা অনেক বললেন—তোর নিজের ছোট ভাইকে বাঁচাবি না ?

দাদা নির্বিকার। পুলিসের জেরার উত্তরে সে বলেছিল, হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা ওকে লাইব্রেরীর দিকে যেতে দেখেছি। তারপরে কি হয়েছে জানি না। আমার সঙ্গে কে কে ছিল দাদা সকলের নাম বলে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদা কি তোমায় ভালবাসত না ?

—খুব, তবে দাদা মনে করেছিল আমি অন্যায় করেছি, সাজা পেতে হবে। মানুষ তো মরবেই, আজ বা কাল। কিন্তু সত্যকে রক্ষা করতে হবে। এই কারণে যদিও বাবা আমাকে বাঁচাতে চেয়েছেন, দাদা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবু আমি দাদাকেই শ্রদ্ধা করি।

গল্প শুনতে শুনতে আমি ভাবছি আমিই বা এখন পুলিসকে কি বলব ? এখন তো আর বলতে পারি না যে, কুনাল নির্দোষ। তাই বললাম, কুনাল, এর একটাই উপায় আছে তুমি স্থবলের কাছে ক্ষমা চাও। তোমার মা স্থবলের মার কাছে যান,—তাঁরা যদি ক্ষমা করেন তবে কেস তুলে নেবেন।

এই সব আলোচনা কয়েকদিন ধরে কুনাল ও তার বাবা মায়ের সঙ্গে

চলতে লাগল। আমি কিছুতেই পুলিসকে আবার অনুরোধ করতে পারলাম না। এই সময় আমার অসুখ করল। একদিন রোগের তন্দ্রার মধ্যে কুনালকে দেখেছিলাম মনে পড়ে। সে আমার হাতটা ধরে বলেছিল, মাসিমা, আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা করে নেব। শুনেছি তার বাবা মারা গেছেন।

এই কাহিনীটি মনে পড়লে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেন ন্যায় অন্যায় গলা জড়াজড়ি করে মানুষের মনের মধ্যে একই দোলায় বসে ঝুলন খেলছে। এসব ছেলেদের কথা ভাবলে মনে হয় একটা প্রজন্মের সব ভাল ফুলগুলো যেন কোন দৈত্য এসে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে। এদের আদর্শ ছিল, ত্যাগ ছিল কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অর্থহীন। আমার মনে পড়ে একটি বারো বছরের ছেলে তার মাকে বলছে, আমায় কেন বোমা ছুঁড়তে দেবে না! তা হলে ক্ষুদিরামকে এত ভক্তি কর কেন? আমাকে কেন ক্ষুদিরাম হতে দেবে না? এ কথার যুক্তি আছে। আজ সময় এসেছে ভাববার যে, এইসব গুপ্তহত্যা আদৌ কোন উপকার করেছে কিনা। সাহেবকে পিছন থেকে মারলে দোষ হয় না, বাঙালীকে মারলে হয়—এই যুক্তি সুস্থ মনে বেশীক্ষণ টেঁকে না।···

এই জন্যই এই সব ঘটনাকে লক্ষ্য করে দেশের লোকের কাছে অপ্রিয় হয়েও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালাচ্ছি না, জ্বালাচ্ছি ইতিহাসের চিতানল।" এই চিতানলের দাহিকাশক্তি যে কি রকম তা বুঝ-তাম যখন বিপ্লবের স্ত্রী লিলিকে দেখলাম। সে তার নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারছিল না। একদিকে সি·পি·এম-এর দজ্জাল ছেলেরা অন্যদিকে কংগ্রেসের কিছু প্রসিদ্ধ মস্তান, আবার তার সঙ্গে আছে পুলিস। এই সপ্তরথীর ব্যূহর মধ্যে ফুটফুটে মেয়ে কচিপাতার মত কাঁপত। তখন তাকে যেটুকু স্নেহ দিতে পেরেছিলাম সেটাই আমার জীবনের অনেক আনন্দের মধ্যে একটি। আরো অনেকের পরিবারকে সাহায্য করব আশ্বাস দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু গোপাল সেনের মৃত্যুর পর মনটা মুষড়ে গেল।

কি করে কবে নকশাল আন্দোলন যে শেষ হল ঠিক মনে পড়ছে না। যেন সমুদ্রের একটা উত্তাল ঢেউ আকাশ ছুঁতে চেষ্টা করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

বহু সংসার ছিন্নভিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নৃশংসতার আরেকটি ইতিহাস সৃষ্টি করে হঠাৎই যেন থেমে গেল। বাঙালীও যে কি নৃশংস হতে পারে ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন

কারণে একই রকম ঘটনা ঘটল। আশ্চর্য এই যে, নিরপরাধ কতগুলি আদর্শবাদী বালকদের হাত দিয়েই এই রক্তনদীর উৎস খোলা হয়েছিল। এ আন্দোলন শুধুই পুলিসের ঠ্যাঙানিতে ভেঙেছে এটা ভাবতে ইচ্ছা করে না। সম্ভবত আদর্শের কোন স্থিরতা না থাকাতেই ও যুক্তির কোন বাঁধন না থাকাতেই এলোমেলো কর্মের জাল এলিয়ে পড়ল। প্রাণ না থাকলে যেমন শরীর টেকে না, ভাব না থাকলে যেমন রূপের লাবণ্য নেই, তেমনি।

৫

যখন নকশাল আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে আসছে তখনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। এর আগে যে আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছি সেটা ছিল ভাষা সংক্রান্ত, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলন, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তির প্রয়োগে মানুষের সূক্ষ্মতর ভাব ও ভাবনার উন্মোচন। আমরা পূর্বে দেখেছি বাংলার রেনেসাঁস অর্থাৎ বাংলাদেশে রামমোহন প্রভৃতি ইংরেজীশিক্ষিত মানুষদের সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা জেগে ওঠে।

আওয়ামী লিগের ভাবটা ডোমোক্রেসি ও সেকুলারিজমের ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু মিলিটারি শাসন তার বজ্র আঁটুনি ছাড়তে চায় নি। তাই নেমে এসেছিল পঁচিশে মার্চের তাণ্ডব (১৯৭১)। অসতর্ক ঘুমন্ত শহরের উপর শুরু হয়েছিল গোলা বর্ষণ। আমি আগেই লিখেছি—এই সংবাদে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ কি রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সীমান্তের ওপার থেকে 'জয় বাংলার' ধ্বনি যেন দুই বাংলাকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্য, বাংলার ঘরে ঘরে যত ভাইবোনকে ভালবাসায় এক করে দিচ্ছিল। বাংলাদেশের খবর পেয়ে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন সীমান্তের দিকে ছুটেছিল, আমরাও গিয়েছিলাম সাতক্ষীরায়। কিন্তু ঠিক কি ভাবে এই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হতে পারব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। তবে সীমান্তে গিয়েই যে কিছু করতে হবে এটা মোটামুটি ঠিক হয়েছিল। তাই এবার বেনাপোলের দিকে যাওয়া ঠিক করলাম, এপ্রিল মাসে (১৯৭১) সালের দুই কিংবা তিন তারিখে আমরা রওনা হলাম। আমাদের প্রধান অসুবিধা গাড়ির। অবশেষে বন্ধু সমর বাগচী আমাদের নিয়ে যাবেন ঠিক হল। গৌরী, আমি, সমর ও জামাল।

আমরা বনগাঁ পৌঁছলাম। বনগাঁ থেকে বেনাপোল যাব বলে ব্রিজটার

কাছে এসেছি—একপাশে ডাকবাংলো, অন্যপাশে পুলিস স্টেশন। একজন পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোনখানে, কি কাজ আমরা আরম্ভ করতে পারি? তিনি বললেন, অনেক লোক কাজ শুরু করেছে। ভারত সেবাশ্রম দু'তিনটে ক্যাম্প খুলে ফেলেছে। আপনারা কিছু করতে চান তো ব্রিজ পার হয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যান, কিছু দূর গেলে পরে একটা গ্রাম 'মামা ভাগ্নে', সেইখানে ভারত সেবাশ্রমের শেষ ক্যাম্প। এর পর আর কোন ক্যাম্প নেই। আপনারা সে গ্রাম ছাড়িয়ে ঐ রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে যান, মোট কথা এখান থেকে অর্থাৎ বনগাঁ থেকে বাইশ মাইল দূরে বয়রা গ্রাম। সেখানে বি. এস. এফ-এর চেক পোস্ট আছে। ঐ বয়রা গ্রামে কাজ করবার সুযোগ পাবেন। বয়রা কপোতাক্ষ নদীর ধারে। মধুসূদনের 'কপোতাক্ষ' যশোর থেকে বয়ে এসেছে। ঐ নদীর ধারে একটা পুরোনো বড় বাড়িতে পাড়ার ছেলেরা ক্লাব করেছে, 'উদয়ন ক্লাব'। ঐখানে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাম্প করুন।

আমরা তো নির্দেশ মত এগিয়ে চললাম, রাস্তা সরু, দু'দিকে খানাখন্দ নেই। পিচ বাঁধানো রাস্তা—সীমান্তের দিকে চলেছে। তখনও শরণার্থী স্রোত আসতে শুরু করে নি। কিন্তু লক্ষ্য করছি টেম্পোতে, ট্রাকে, গাড়িতে নানা জিনিসপত্র নিয়ে লোকজন এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি টেম্পো দেখলাম পেট্রোল নিয়ে চলেছে—বড় বড় ড্রাম। এগুলো শুধু জিনিস নয়, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস। আমরা এগিয়ে চলেছি তো চলেইছি। কলকাতা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে এসে পড়লাম। গৌরী কেবলই বলছেন—'এত দূরে ক্যাম্প করে কি হবে? আমাদের তো গাড়ি নেই, পায়েও বল নেই। আমরা কি করে এত দূর আসব?

আমি ভাবছি—যেখানে কাজের স্থান সেখানে তো পৌঁছতেই হবে, তা যতই দূর হোক। আমার গাড়ি নেই, আগে গাড়ি কিনব তারপর কাজ করব। সেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই দাঁড়ায়—'আগে ফাউন্টেন পেন পাব তবে মহা-কাব্য লিখব।' মনে মনে বলছি, ইংরেজি যে প্রবচনটা আছে—'Where there is a will there is a way' কথাটা ঠিক কিনা এবার প্রমাণ হবে। কারণ ইচ্ছার তো অভাব ছিল না। ইচ্ছা, দুর্নিবার ইচ্ছা—মনের মধ্যে যে বেগ সঞ্চার করছিল সে যে কোনো পথ পাবে না তা ভাবতে পারছিলাম না। গৌরী যা বলছিলেন তাও অবশ্যই ঠিক। কিন্তু এই সমস্যার কি আশ্চর্য সমাধান হয়েছিল সে কথা পরে বলছি।

আমরা যখন বয়রা পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা ভাঙা বড় বাড়ি। ভূতের মত যেন ঘন ছায়ামূর্তি। তার জানলা দিয়ে এক চিলতে আলো মলিন লণ্ঠন থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। আমরা সেই দিকে এগিয়ে গেলাম, একটি অল্প বয়সী সুশ্রী ছেলে বেরিয়ে এলেন। তার নাম দিলীপ। দিলীপ আমাদের সাদরে ভিতরে ডেকে নিলেন। সেখানে একটা ছোট আলমারিতে কয়েকটা ওষুধপত্র। দিলীপ বলতে লাগলেন—ওঁদের ওষুধ দরকার, ডাক্তার দরকার, একটা গাড়িও দরকার। দু'চারদিন অন্তর ওপার থেকে আহত মানুষ আসছে। তাদের অন্তত **First aid** দিয়ে বনগাঁ পাঠাতে তো হবে।

ডাক্তার কই ? ওষুধ কই ? দিলীপ আমাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাড়িটার সামনেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠ পেরিয়েই কপোতাক্ষ নদী— নাম শুনলেই সাগরদাঁড়ি ও মধুসূদনের স্মৃতি ভেসে ওঠে। কিন্তু নদীটি বড় সরু ও কচুরিপানায় বোজা। নদীর ওপারে পূর্ব পাকিস্তান। সেখানে গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট আলো জ্বলছে। দেখে মনে হয় দেওয়ালির প্রদীপ সাজানো। মনটা কেমন বিস্ময়ে ভরে গেল। এই হাঁটুজল নদীর বেড়া দিয়ে এক ভাষা-ভাষী এক মনপ্রাণ একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। সেদিন একটা কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি আধুনিক কবিদের ভাল লাগবে না। তবু সেই সময়কার মনের ভাব বোঝাবার জন্য কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

অনির্বাণ

কঠিন পর্দার ওধারে দাঁড়িয়ে
আমরা দু একজন সন্দেহে সংশয়ে
মাঝে মাঝে দু হাত বাড়িয়ে
ছুঁতে চেয়েছি হৃদয়ে হৃদয়ে—
দুঃস্বপ্নে আকীর্ণ পথ
দুর্লঙ্ঘ্য যে মতের প্রাচীর
কত কূটতর্কে ছিন্ন, কত বিষে নীল
দুদিকে ফেরানো মুখ
কী তীব্র ঘৃণায়।
তবুও কিছু কিছু সপ্রশ্ন উৎসুক
উদ্বেল জিজ্ঞাসা
কখনো পেয়েছে ভাষা,

প্রশ্ন করেছি, প্রেমের মহিমা
গ্লানির কালিতে ঢেকে
বিষণ্ণ নীলিমা
এমনই কি রবে চির ম্লান ?
অভ্যাসের চক্রে বাঁধা কাল
দ্রুত আবর্তিত। চেয়েছিল উত্তরহীন মুখে
ইতিহাস কি প্রচণ্ড কৌতুকে
প্রেমের পরীক্ষায় জানালে আহ্বান
মৃত্যুর সমুদ্রে জাগে গান।
বিদীর্ণ পর্দার ওধারে
রক্তের প্রবল স্রোতে
ভেসে ওঠে ছোট ছোট দ্বীপ
ওখানে মানুষ আছে
বুকে নিয়ে জ্বালানো প্রদীপ।

উদয়ন সংঘ থেকে দূরে আর একটি বড় ঘর দেখতে পেলাম। দিলীপ বললেন—এটা একটা গুদাম। ওপার থেকে এসে আওয়ামী লীগের ছেলেরা এটা পাহারা দিচ্ছে। ওখানে কলকাতা থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা থেকে লোকে জিনিসপত্র এনে জমা করছে। আমরা পথে আসতেই তো দেখলাম কত কি ট্রাক ভর্তি করে আসছে। দিলীপের কাছে আরো জানতে পারলাম ওখানে জিনিসপত্র অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে আছে। ফলে ঠিকমত ব্যবহার করা যাচ্ছে না। একই গুদামের মধ্যে নানা রকম বস্তু ঠাসা হয়ে আছে। হয়ত ওষুধের অ্যামপিউলটা হরলিকসের পাঁচটা প্যাঁটরার তলায় চাপা। আর ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা এক জায়গায়, আর তার ছুঁচগুলি অন্যত্র অন্য কোন বস্তার নিচে চাপা, এই রকম অব্যবস্থার মধ্যে ঐ সব জিনিষপত্র ব্যবহার করাই মুশকিল।

২৫শে মার্চ বাংলাদেশে কামান চলল, ট্যাংক চলল আর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা পশ্চিমবঙ্গ সাহায্য ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে উদ্যত। এ সাহায্য শুধু জিনিসপত্র দেওয়া নয়, হৃদয় দেওয়া। হঠাৎ যেন বোঝা গেল সমগ্র ভারত অর্থাৎ এই উপমহাদেশ মনেপ্রাণে কত এক। এই কৃত্রিম বিভাগ

কতগুলি স্বার্থসন্ধ মানুষের অপপ্রয়াসে রাজনীতির খেলোয়াড়রা তৈরী করেছে। কিন্তু এই বিশাল উপমহাদেশে যারা দীর্ঘদিন ধরে একত্র বাস করেছে, এক ভাবে ভাবিত হয়েছে, একই ন্যায়নীতির শিক্ষা পেয়েছে তাদের বন্ধন সহজে ছিন্ন হবার নয়।

আমরা দিলীপকে বললাম—দু এক দিনের মধ্যেই ডাক্তার নিয়ে আসছি। জামাল বললে—তার কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আছে। সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। আমরা কলকাতায় ফিরে এসে আমাদের সহকর্মী প্রফেসর নির্মল চ্যাটার্জীকে বললাম—আপনাকে কয়েকদিন বয়রায় তিনজন ডাক্তার নিয়ে থাকতে হবে।

সম্প্রতি নির্মলবাবু বলেন—আমরা নাকি বয়রার নিসর্গ দৃশ্যের এমন বর্ণনা দিয়েছিলাম যাতে উনি ভেবেছিলেন একটি প্রাসাদোপম বাড়ি, সামনে প্রশস্ত লন ও কপোতাক্ষের স্বচ্ছ জলে জ্যোৎস্নার খেলা দেখতে পাবেন। সেই আশায় গিয়ে দেখেন কি একটা পোড়ো ভূতের বাড়ির দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে ও একটা বারান্দা ও ছোট ঘর ছাড়া আর কোন ঘরের ছাত নেই। সামনে একটা ধূলো পড়া উঠোন। কপোতাক্ষর জল কচুরিপানায় নোংরা পচা ও আরদ্ধ। দেখে তাঁর চক্ষু স্থির। যাই হোক নির্মলবাবু ও আমরা দুই একজন ডাক্তার নিয়ে উপস্থিত হলাম। এবার বোধ হয় আমাদের বাহন ছিলেন ডাঃ গাঙ্গুলী। অমন উৎসাহী প্রাণবন্ত পুরুষ এ পোড়া বাংলাদেশে তো বেশী দেখিনি। তিনি যেন সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। তবে তিনি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। রবিবার ছাড়া তাঁর সময় হত না। তিনি ঢাকার মানুষ। তাঁর গ্রামের নামটি আমি ভুলে গেছি। কিন্তু সেই গ্রামটি তাঁর কাছে এতই জীবন্ত ও বাস্তব যেন কলকাতাই অলীক। জননী জন্মভূমির ওপর এরকম যথার্থ টান আমি বেশী দেখিনি। তাঁর মনোগত ইচ্ছা দেশ স্বাধীন হলেই এই কয়েক হাজার টাকার মাইনের চাকরী জীর্ণ বস্ত্রের মত ফেলে দিয়ে সেই সুদূর গ্রামে চলে যাবেন। লুঙ্গি পরে শুধু গায়ে তাদের বিরাট দীঘিতে সাঁতার কাটবেন। ছেলেদের নিয়ে কো-অপারেটিভ করে চাষ-বাস করবেন তাতে নাকি দিব্যি চলবে। এতেই বুঝতে পারতাম তাঁর অন্তরের টান কতখানি।

ডাঃ গাঙ্গুলীর তখন যে সমৃদ্ধি, যে উন্নত অবস্থার মধ্যে ছিলেন—এটা ঠিকই যে ঢাকার ঐ গ্রামের মধ্যে থাকলে তা কখনই হত না। কিন্তু তিনি এই সভ্যতার গরিমা যোধপুর পার্কের সাজানো বাড়ি গাড়ি সমস্ত ছেড়ে তাঁর

সেই নারিকেল কুঞ্জ ঘেরা সুজলা শ্যামলা গ্রামটিতে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যু না হলে তিনি আত্মীয়স্বজন সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কয়েক হাজার টাকার চাকরী ছেড়ে শেষ পর্যন্ত সেই স্মৃতি ও কল্পনায় ঘেরা মাতৃভূমির মাটি স্পর্শ করতে যেতেন ও সেই মাটিতেই দেহের ভস্ম মিশিয়ে দিতেন।

এই সব খুঁটিনাটি কথা মনে পড়লে বুঝতে পারি তখন এবং আজও দুই দেশেরই রাজনীতির খেলোয়াড়রা জানে না যে দেশ ভাগ সহজে হয় না। দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় দুই সত্তাই টানাপোড়েনের বুনোটে বাঁধা আছে। আমার আজকে মনে পড়ে না যে পরের দিন তিনজন অল্পবয়সী ডাক্তার, প্রফেসর চ্যাটার্জী ও আমি কি করে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। তারপর কয়েক-দিন যাতায়াত চলল। আমরা ঐ বিরাট গুদামের জিনিসপত্র গোছাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

এই সমস্ত জিনিসপত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা বাংলাদেশের জন্য সীমান্তে উজাড় করে দিয়ে গেছে। একটি বিরাট গুদাম কে বানিয়েছে জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের কয়েকটি ছেলে সে গুদাম পাহারা দিচ্ছে। তারা আমাদের হাতে চাবি দিয়ে দিল।

আমরা ঢুকে ডাক্তারদের সাহায্যে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। পেটের অসুখের ওষুধ, সর্দি জ্বরের ওষুধ, নিউমোনিয়া, সেপ্‌টিক ঘায়ের ওষুধ সব একাকার হয়ে ছিল। সেগুলো ডাক্তাররা আলাদা আলাদা প্যাক করে রাখছেন। যাতে বাংলাদেশে সেই ভাবে নিয়ে গেলে ব্যবহার করা যায়। এক দিন এই রকম ভাবে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি এমন সময় খাকি পোশাক পরা একটি ভদ্রলোক জীপ চালিয়ে এলেন। এই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা দেখলাম। কোন্ পথে কি ভাবে তিনি জীপ চালিয়ে এলেন তা বুঝতে পার-লাম না। তিনি আমার কাছে এসে যশোরের টানে কথা বললেন—আমরা শুনেছি আপনারা এখানে কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের আহতদের সাহায্য করবার জন্য। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজনকে দিন যিনি আমার সঙ্গে ওপারে যাবেন। সেখানে গুলিবিদ্ধ একটি মানুষ গ্যাংগ্রিনে ভুগছে।

আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—এপারে নিয়ে এলে আমরা তাকে চিকিৎসা করাব, ওপারে যেতে পারব না। ভদ্রলোকটি বলতে লাগলেন প্রবল জ্বরাগ্রস্ত সেই রোগীকে সরানো অসম্ভব। আপনারা ডাক্তার এনেছেন বাংলাদেশকে

সাহায্য করবেন বলে, আর এটুকু এগিয়ে মরণাপন্ন রুগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না? সেই মুহূর্তে আমার মনের অস্থিরতা আজও মনে করতে পারি। কি করা উচিত? আমি তো নিশ্চয়ই জানি রুগ্ন মানুষকে চিকিৎসা করা ডাক্তারের কর্তব্য। তা স্বদেশী বিদেশী শত্রু মিত্র যেই হোক না কেন। কিন্তু এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে যদি কাউকে পাঠাই তাতে ফলাফল কতদূর গড়াবে কে জানে! ভারত সরকার টের পেলে আমাদের এই সর্দারী কি চোখে দেখবেন তা কতকটা অনুমান করতে পারছিলাম। শুধু সরকার নয়, দেশসুদ্ধ লোক বলবে এনাদের এই 'নেই কাজ তো খই ভাজ'-এর ঠেলায় কি বিপদ যে ডেকে আনবেন তার ঠিক নেই। ফলে আমাদের পক্ষে কাজ করা হয়ত চির-তরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দুই দেশের সরকারী পর্যায়ে কি রকম বোঝাপড়া হবে তাও জানা নেই। এমন অবস্থায় আমরা কি পাকিস্তানে ঢুকতে পারি? অথচ মানুষ হিসেবে সেই যন্ত্রণাকাতর গ্যাংরিনের রুগীর প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে: আমাদের কাছে ওষুধ আছে, ইনজেকশন আছে, ডাক্তার আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটা মানুষের জীবন রক্ষার চেষ্টা হঠকারিতা হয়ে যাবে? আমার সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান করে ডাক্তাররা সাফ জবাব দিলেন যে তাঁরা কেউই এ ঝুঁকি নেবেন না। মুক্তিফৌজের লোকটি মলিন মুখে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে চলে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত এই ঘটনাটা আমার বিবেককে পীড়িত করেছে।

বয়রাতে দিলীপ মাস্টারমশাইএর বাড়ি। আমগাছে ছাওয়া পূর্ববঙ্গের বাড়িগুলির হুবহু প্রতিচ্ছবি। ওরা ওপার থেকে ১৯৬৪ সালে এপারে এসে বসবাস শুরু করে। আগে থেকে একটু একটু করে জমি কিনে রেখেছিল। বেশ বড় একখানা টিনের ছাদের বাড়ি। অনেক ঘর। একটু দূরে রান্নাঘর ও দাওয়া। সামনে আমকাঁঠালের বাগান। দিলীপের মায়ের হাতের অমৃতের মত রান্না খেয়েছি।

ডাক্তারদের তিনজন ও প্রফেসর চ্যাটার্জীকে দিলীপের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে এলাম। তারপর প্রতিদিনই ওপার থেকে আহত মানুষরা আসতে লাগল। আর শরণার্থীর স্রোত ক্রমেই তীব্রগতি লাভ করল।

এই রকম একটা দিনে কিছু জামাকাপড় নিয়ে বয়রা গেলাম। সেদিন জনস্রোত ঢুকছিল। দলে দলে লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছে। বাঁশের স্ট্রেচারে করে আহতদের আনছে। একটি গুলিবিদ্ধ মানুষকে এনে সেই

ভাঙা বাড়ির বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হল। তার ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, কিন্তু ওখানে রক্ত দেবার ব্যবস্থা ছিল না। সে এত দুর্বল যে তাকে বনগাঁয়ের হাসপাতালে সরানো যাবে না। সাধারণত আহতদের **B. S. F.**-এর একটা বিরাট ট্রাকে করে বনগাঁর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। এই লোকটির কোনরকম কষ্টের অভিব্যক্তি ছিল না। শুধু একটা মরা চোখে তাকিয়ে ছিল। সে দৃষ্টি নিষ্পলক, সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। আমরা তার শুশ্রূষা করতে চেষ্টা করছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে সে মারা গেল। সেদিন আমার সঙ্গে আমার পুত্র প্রিয়দর্শী ও পুত্রবধূ রূপলেখা ছিলেন। সে প্রকাণ্ড জনতার মধ্যে নিজহাতে জামাকাপড় বিলি করতে গিয়ে তাঁরা খুবই নাজেহাল হয়েছিলেন।

বয়রার কথা বারবার মনে পড়ে। এত ভীড় বেড়ে উঠবার আগে জায়গাটা কি সুন্দরই না ছিল—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায়। তির তির করে বয়ে চলেছে কপোতক্ষার জল। বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে জোনাকি জ্বলছে, থোকা থোকা পাতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলোর চমক। একটা উঁচু টিলার উপরে বি. এস. এফ.-এর ক্যাম্প, সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে বসতাম। ওপারে বাংলাদেশে সন্ধ্যাবেলা গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট আলো জ্বলে উঠত। যেন এ পারের জোনাকির সঙ্গে আলোর ভাষায় কথা কইছে।

একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে—সারাদিনের কাজের শেষে বি. এস. এফ.-এর ক্যাম্পে ক্যাম্পে কমাণ্ডার, একজন নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুদিন পরে নেপালী ভাষায় কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছি। ভদ্রলোক বললেন—ভাষার বন্ধন কি রকম দেখুন—আপনি আমার মাতৃভাষা বলতেই আপনাকে আমার কি আত্মীয়ই না মনে হচ্ছে! এই ভাষার জন্য বাঙালীরা লড়ছে। আমি বুঝতে পারি তাদের মনের ভাব।

সেদিন তাঁর কথা শুনে আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী দেশ। এর ঐক্য বজায় রাখার জন্য ভাষার চেয়েও দৃঢ়তর বন্ধন প্রয়োজন। সেটা কি হতে পারে? ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, সংস্কার নয়—কি তবে সেটা? ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—এ ছাড়া আর যে কোনটির উপর জোর দেওয়া যাক না কেন ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। একদিন সংস্কৃত ভাষা ও রামায়ণ মহাভারত দুটি কাব্য এই ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধেছিল। সিংহলের রাজকন্যা উজ্জয়িনীতে এসে নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলেন—সংস্কৃতই উত্তর ভারতের সব ভাষার জননী। এমনকি উর্দুতেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ভীড় করে রয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত? কাজেই বহু ভাষার জননী হলেও সারা ভারতকে তার

আঁচলের তলায় আনবার ক্ষমতা সংস্কৃতেরও নেই। তাহলে কি দিয়ে আমরা এক নেশন গড়ব—সংস্কৃতি, ভাব এবং আদর্শ? বহুদিন একসঙ্গে থাকার ফলে রুচি ও চিন্তাধারার যে ঐক্য গড়ে ওঠে সেটাই কি হবে নেশনত্বের মূল, কে জানে? তবে আপাতত এরা যে ভাষার সূত্রে এক বাঙ্গালী জাতি বা বেঙ্গলী নেশন ভাবছে—তা লাগছে ভাল। অন্তত ধর্ম দিয়ে নেশন বাঁধার চেয়ে তা অনেক ভাল।

যখন আমরা এইভাবে বয়রার কাজ শুরু করি তখন অন্যান্য জায়গায় অনেকেই অনেক রকম কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদের কথা আমি জানি, কিন্তু লিখতে পারব না। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতার কথাই লিখতে সক্ষম। স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় ঢাকা, তাও কতটা সঠিক হবে কি জানি—দিন তারিখ তো প্রায় হারিয়েই গেছে। এপ্রিল মাসের প্রায় প্রথমেই আমি শুনেছিলাম কয়েকজন প্রবীণা বিপ্লবী মহিলা বেনাপোল দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ঝিকর-গাছায় ঢুকেছিলেন। সেখানে কিছু বোমাও নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানকার বাঙালী ছেলেরাও কিছু বোমা যোগাড় করে জমা করত। তাঁরা খুব ইমো-শনে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। চিরকালই আমাদের অগ্নিযুগের অগ্নিদাহ আবেগের স্ফুলিঙ্গে জ্বলন্ত। আবেগের স্ফুলিঙ্গ প্রয়োজন, কিন্তু ভাণ্ডারে যথেষ্ট জ্বালানি না থাকলে দাহিকা-শক্তি কতক্ষণ থাকবে তার? যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা প্রবীণা। তবু অল্প বয়সের সেই উন্মাদনার সুখ আরেকবার ভোগ করে নিলেন মাত্র। আমার পরিচিত কেউ কেউ গিয়েছিলেন বটে, তবে আমি যাই-নি। দু'চারদিন পরই ওখানে পাকিস্তানী বোমা পড়তে শুরু করে। **B.S.F.** এদের জীপে তুলে পার করে দেয়। তাঁরা অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে ফিরে চলে আসেন। এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এই মহিলারা অত্যন্ত খাঁটি মানুষ এবং যথার্থই এই মুক্তিযুদ্ধে সহযোগী হতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যে কোন কাজে কৃতকার্য হতে গেলে কেবলমাত্র ভাবাবেগ যে যথেষ্ট নয় এ কথা তাঁরা নিজেরা শিখুন না শিখুন আমাকে শিখিয়ে গেলেন। আমার ভাল লাগছিল যে আমি ঐ দলে যাইনি।

বয়রার পথে 'মামা ভাগ্নে' বলে যে গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘ একটা ক্যাম্প করেছিলেন বিরাট জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড সে ক্যাম্প, সেখানে হাজার হাজার লোকের খাবার রান্না হত। সে কি প্রচণ্ড আয়োজন! ঐখানে তখন অল্পবয়সী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট রথীন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন

তিনি স্বামীজীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কাপড় বিলির সম্বন্ধে। দেখলাম সেখানে অনেক অল্পবয়সী ছেলে এসেছে যারা স্বেচ্ছাসেবক। এদের সাহায্য ছাড়া এত বড় বড় শিবির কিছুতেই এভাবে চলতে পারত না। আমি বুঝতে পারলাম সরকার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানদের সাহায্য চাইছেন, ভাবলাম আমরাও চেয়ে দেখি পাই কি না।

বনগাঁ থেকে একটা ছোট কাঠের ব্রীজ পার হয়ে বয়রার রাস্তা বাঁদিকে। ডানদিকে বেনাপোল। একদিন বেনাপোলের দিকে কি অবস্থা দেখতে গেলাম, বেনাপোল দিয়েই যশোর রোড চলে গেছে। সেটা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই, গিয়ে দেখি একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে একটা বড় বাড়িকে ঘিরে বিরাট ছাউনি। সামনে চাতালে বড় বড় হাঁড়িতে রান্না চেপেছে—লোকারণ্য। এটাও ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিবির। সেখানে দেখলাম আমাদের কলকাতার অরুণ লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এখনে কি করছ? সে আগে আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। নাটক করত—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর। সে বললে, আশুকে পুড়িয়েই আমরা কয়েকজন এখানে চলে এসেছি, আশু যে কে তা পরে শুনেছি তার কাছে। আশু যাদবপুরের একটি পরোপকারী ছেলে। নকশালদের কাছাকাছিই ছিল। মিলিটারীর গুলিতে আহত অবস্থায় তাকে লাঠি পিটিয়ে মেরে ফেলে। তার মৃত্যুতে ঐ এলাকায় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বড় কষ্ট পেয়েছিল। এ সমস্তই আমার অরুণের কাছে শোনা, তারপর এইসব ছেলেরা কেউ কেউ শরণার্থী শিবিরে শ্রম দান করছিল, আর কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছিল।

বোমা সরবরাহের দিকে তখন ঝোঁকটা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। একদিন আমরা ফিরছি, বনগাঁ পার হয়ে এসেছি, নির্জন জায়গায় গাড়িটা গোলমাল হয়ে গেল, দূরত্ব কম নয়। কলকাতা থেকে বনগাঁ হয়ে বয়রা পর্যন্ত ৮০ মাইল। আমাদের পিছনেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। তার মধ্য থেকে অনেকগুলি অল্পবয়সী ছেলে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ল। আমাদের তো বেশ ভয় ভয় করছে। কয়েকটা দুধের বাচ্চা দেখে কেন যে এত ভয়, তা তখনকার আবহাওয়ায় না থাকলে কেউ বুঝতে পারবে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে গাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বললে—মাসিমা, আমি লালির ক্লাসফ্রেণ্ড। আপনি লালির মাসিমা? আমায় নাম—যতদূর মনে হয়, বলেছিল, স্পুটনিক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে কি করছ? আমরা বোমা এনেছিলাম বাংলা দেশে পাঠাব বলে, কিন্তু ডেটোনেটার আনতে ভুলে গেছি। তাই কিছু

কাজ হল না।

আমরা হাসছিলাম—এত কঠিন কাজ করতে এসে আসল জিনিসটাই আনতে ভুলে গেল! যাই হোক, এতক্ষণ তো ঘাবড়ে ছিলাম। এখন একটা কচি চেনা মুখ বেরিয়ে যেতে বোমা শব্দটা আগের মত মনে হচ্ছিল না। আমি ভাবছিলাম এই ছেলেমানুষী হয়ত একেবারে ফেলনা নয়। এর মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় স্বার্থশূন্য কর্মের উদ্যম। সারা পথ তারা আমাদের গাড়ি ঠেলাঠেলি করল। এই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় ওদের পেয়ে খুব ভালই লাগল।

আমি সীমান্তের গল্প করতে গিয়ে কলকাতায় আমরা কি করেছিলাম তা বলতে ভুলে যাচ্ছি। এপ্রিলের ১লা বা ২রা তারিখে আমি মুর্শিদাবাদ থেকে একটা ফোন পেলাম। গোলাম মুর্শিদ রাজসাহী থেকে নদী পার হয়ে ঢুকেছেন। ইনি আমার পরিচিত। অর্থাৎ পেনফ্রেণ্ড বলা যায়। তিনি ফোনে বললেন—একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় ইণ্ডিয়ায় (বাংলাদেশের লোকেরা এই ভারতভূমিকে ইণ্ডিয়া বলে) ঢুকেছি। কলকাতায় আসতে পারি? একটু জায়গা হবে কি? 'নবজাতক' পত্রিকার সূত্রে গোলাম মুর্শিদের সঙ্গে আমার বহুদিন থেকে পত্রালাপ চলছে। হিন্দু মুসলমানের ভেদের বিরুদ্ধে তো বটেই, হিন্দু সংস্কৃতির তিনি অনুরাগী। আমাকে দিদির মত ভক্তি করেন। আজ একবস্ত্রে বহু মাইল চরের ওপর দিয়ে হেঁটে আমাদের কাছে শরণার্থী। এঁদের জায়গা হবে না! প্রাণপূর্ণ ভালবাসায় আমার স্বর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম—হবে ভাই হবে। যত শীঘ্র পারো চলে এস। সে সময় কলকাতার অবস্থা এরকম ছিল না। দু-একখানা ফ্ল্যাট খুঁজলে পাওয়া যেত। আমার বন্ধু জাস্টিস মাসুদ সহকর্মী ও সহমর্মী,—তাঁর সুন্দর একখানি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেন।

আর একটি দলের কথা মনে পড়ছে। এরাও খুব প্রথম দিকেই এসেছিল। তাদের সঙ্গেও দেখা জাস্টিস মাসুদের বাড়িতে। মাসুদ বললেন টেলিফোনে, শীঘ্র আসুন, বিশেষ দরকার।

একথাও বলতেই হবে যে, শিক্ষিত মুসলমানরা এসে বেশীর ভাগই খোঁজ করতেন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের এবং তাঁদের ওপরই নির্ভর করতেন বেশী। কিন্তু ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। আমার তো অনেকেই আপন হয়েছিল। আমীরুল কাজ করতেন তাজউদ্দীন-এর (বিদেশস্থিত স্বাধীন বাংলার প্রধান মন্ত্রীর) চিফ এইড পদে। তাজউদ্দিনের কাছ থেকে একটি ব্যক্তি একটা ঘরের সন্ধানে আমার কাছে আসেন। আমি ঘরটা

দিতে পারি শুনে আমীরুল এসে আমাকে বললেন—তাজউদ্দিন সাহেব খুব খুশি, উনি বলছিলেন একজন স্ত্রীলোকের উপর যে এতখানি নির্ভর করা যায় তা জানতুম না। আমার বেশ রাগ হল। আমি বললুম—আমীরুল, তাজউদ্দিন সাহেবকে ব'লো, একজন স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করেই তাঁরা এই ভারতভূমিতে ঢুকেছেন।

আমি জানি ইন্দিরা গান্ধীর সম্বন্ধে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সত্ত্বেও এঁদের অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষত মুক্তি-ফৌজরা সেই রকমই অভিযোগ করত। যে কথা বলছিলাম, মাসুদ আমায় ডেকে বললেন—তিনজন বাংলাদেশ থেকে এসে পড়েছেন, এঁরা খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। একজন লম্বা, মাথায় টাক। চুপচাপ মানুষ। তাঁর নাম নুরুল ইসলাম। আর একজন বেঁটে, খুব চটপটে স্মার্ট, তাঁর নাম জাকেরিয়া; আর একজন গোল মুখ, খুব ফর্সা,—নাম ওবেদ। কিন্তু এঁদের কেউই সেদিন ঠিক নামগুলো বলেননি। আত্মগোপন করতে চাইছিলেন ভয়ে। এঁদের ধারণা পাকিস্তানের চর এঁদের এখানে মেরে ফেলতে পারে। মাসুদ বললেন—একদিনের মধ্যে এঁদের পাসপোর্ট করে দিতে হবে। ডঃ নুরুল ইসলাম দারুণ বিদ্বান। দেশ স্বাধীন হলে উনি একটি সম্পদ হবেন। একদিনের মধ্যে কি করে পাসপোর্ট হবে, যাঁদের কোন কাগজপত্র নেই, কে জানে? আমি বললুম,—চলুন অজয় মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করা যাক। উনি তখন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরে থাকেন। পথে যেতে যেতে জাকেরিয়া বললেন—আপনি ঠিক আমাদের মাসিমার মতন, আপনাকে সহায় পেয়ে খুব ভাল লাগছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মাসিমা কে? সে বললে—কবি সুফিয়া কামাল। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের কাছে সুফিয়া খাতুন নামে একজন আমার বয়সী মেয়েকে দেখেছিলাম। পরে জেনেছি ইনিই তিনি। অজয় মুখার্জীর বাড়ি পৌঁছে দেখি তাঁরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। থালা ভরে মিষ্টি সাজানো। সকলেই কৌতূহলী। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে অজয়বাবুর বিধবা বৌদি গল্প শুনবেন বলে প্রস্তুত, একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেছেন—কোন পথে পালিয়ে এলেন? মুজিবের কি হল? কি হতে পারে? জীবিত কি মৃত? ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের অতিথিরা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁদের খাবারও ইচ্ছে নেই, গল্প করারও ইচ্ছে নেই। তাঁদের চাই পাসপোর্ট।

এদিকে পাসপোর্ট বিষয়ে অজয়বাবুর বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে

হচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণ ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। ওরা গজগজ করতে লাগল। এত বড় একটা দেশের মুখ্যমন্ত্রী, ইনি কিনা ছেলেমানুষের মত গল্প শুনতে চান? কাজের কথায় কান নেই! যাই হোক পরের দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ গেলাম। কার পরামর্শে গিয়েছিলাম, কার সঙ্গে দেখা করেছিলাম তা মনে নেই--শুধু এইটুকু মনে আছে যে ঐখান থেকেই পাসপোর্ট পেয়েছিলাম। পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয়নি। কোন যাদুমন্ত্রে এই অসাধ্য সাধন হয় তা কে জানে! শুধু এইটুকু বোঝা যায় সমগ্র দেশ কি রকম ব্যগ্র হয়ে ছিল বাংলাদেশকে সাহায্য করতে।

নুরুল ইসলামের কথা আগেই বলেছি—তিনি কি রকম খ্যাতিসম্পন্ন লোক। কিন্তু তাঁর যে কি ভয় তা ধারণা করা যায় না। কোথায় যে গা ঢাকা দিলেন! পাসপোর্ট এল। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে প্লেন ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে ডঃ নুরুল ইসলাম কাঁপতে কাঁপতে এসে উপস্থিত হলেন। তড়বড় করে জামাকাপড় গুছোতে গুছোতে একপাটি জুতো এখানে ফেলে আরেক পাটি ব্যাগে ভরে নিয়ে আমেরিকার ওয়াশিংটনে **Woodroo Wilson Research Centre**-এ চলে গেলেন। আর জ্যাকেরিয়া লণ্ডনে গিয়ে বাংলাদেশের জন্য অনেক টাকাপয়সা তুলেছিলেন। ওবেদও বিলেতে গিয়ে দিব্যি ব্যবসা-বাণিজ্য করে গোলগাল হয়ে একবার এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল বিলেতে গিয়ে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতে যেন থাকি। বিলেতে গিয়েওছিলাম, খুব অসুস্থ অবস্থায় ওবেদকে ডেকেওছিলাম। কিন্তু তাঁর টিকি কিংবা দাড়ি কিছুই দেখতে পাইনি।

এইরকমভাবে পর পর লোক আসছে যারা শিক্ষিত, তথাকথিত ইন্‌টেলিজেন্সিয়া—বুঝতে পারলাম এমনিতেই তাদের চোখ কলকাতার দিকে পড়ে ছিল, সুযোগ পেয়েই তারা কলকাতায় এসে পড়েছে। যার যেখানে বন্ধু বা কোন যোগসূত্র আছে সেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। আমাদের যোগসূত্র অনেক, তাই এদের জন্য বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান।

প্রথমদিকে একদিন হঠাৎ ডাঃ গাঙ্গুলী বললেন বি. এস. এফ.-এর সমরবাবু কয়েকটা কথা আলোচনা করতে চান। তাঁর সঙ্গে তো কয়েকদিন আগেই আলাপ হয়েছিল। সমর বসু বয়সের তুলনায় গম্ভীর মানুষ। তিনি আরও গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার বাড়িতে শুনেছি একটা প্রেস আছে। কতগুলো গোপনীয় কাগজপত্র ছাপাতে পারবেন? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত? আমরা একটা প্রেস খুঁজছি, যেখান থেকে কখনও কথা

বেরুবে না। আমি বললাম—আমার প্রেস বাড়ির নীচেই। আমি বসে থেকে লেখা ছেপে নিয়ে কম্পোজ ম্যাটার ভেঙে দেব। তারপর লেখা আমার শোবার ঘরে নিয়ে চলে যাব। তিনি আমাকে কতকগুলো প্রুফ দিয়ে বললেন—এইগুলো সংশোধন করে ছেপে আনুন। এ কাজ আমার পছন্দ হল। বোমা দেওয়া নেওয়া আমার কাজ নয়। কিন্তু প্রেস প্রুফ কাগজ কলম এগুলিই তো আমার কাজ।

বাড়ি এসে বসবার ঘরে বসে প্রুফটা দেখছি—হঠাৎ দেখি সামনে ছিপ-ছিপে সুন্দর চেহারার একটি অল্পবয়সী ছেলে। আমি প্রুফটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে? কি চাই?

আমার নাম মহম্মদ আলি। যে কাগজটা লুকিয়ে রাখলেন ঐটা চাই। ওটা একটু সংশোধন করতে হবে। তাজউদ্দিন সাহেবের স্পিচ। আমি তাঁর চীফ এইড। যেটা স্বাধীন বাংলার উদ্বোধনের সময় পড়া হবে।

আমি সতর্ক হয়ে বললাম—আপনাকে আমি চিনি না। আপনার সঙ্গে আমি কোন কথা আলোচনা করব না। মহম্মদ আলি মুচ্‌কি হসে বললেন—আপনি ঠিক্‌ই বলেছেন, যাই, সমর বোসের চিঠি নিয়ে আসি। এমন সময় আরেকজন বাংলাদেশের ছেলে এসে ঢুকল। তাকে দেখে চমকে উঠি—এ কি আমীরুল, তুমি দাড়ি কামাইয়া ফ্যালছ?

এইভাবে আমার প্রেসে বাংলাদেশের প্রয়োজনের প্রচুর ছাপার কাজ হতে লাগল। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ছাপা হল আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো। এ সমস্ত কাগজপত্র আমীরুল (ছদ্মনামে মহম্মদ আলি) নিয়ে আসত। বাংলাদেশের ম্যাপও ছাপা হয়েছিল। এতো গোপনীয়তার কারণ (এখন আর গোপনীয়তার অর্থ নেই) কিন্তু তখন আমাদের সরকার চেষ্টা করছিলেন যেন পৃথিবীতে কেউ না টের পায় যে আমরা বাংলাদেশকে সাহায্য করছি। যদিও পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে যে দুটো দেশ একই। ভারত ও পাকিস্তান কিরকম কৃত্রিমভাবে ভাগ হয়েছে এবং দু দেশে বসবাসকারীদের মধ্যে একই নাড়ীর বন্ধন। থেকে থেকে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগে বটে,—ভারতেও লাগে, পাকিস্তানেও লাগে, এই দুটি লাগাই যে এক ধরণের সে কথা কারু মনে আসতে চায় না। কিন্তু দাঙ্গা বাধলেই ঝাঁকে ঝাঁকে হিন্দু ভারতে অনুপ্রবেশ করে। দাঙ্গা না বাধলেও হিন্দুরা ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসে। কারণ ওদেশকে তারা ভালবাসতে পারেনি। আর আমরাও তাদের পর মনে করতে পারিনি। এতদিন জানতাম শুধু বুঝি

হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা সত্য। এবারের দুর্যোগে বোঝা গেল মুসলমানদের সম্বন্ধেও সে কথা তেমনই সত্য। পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রাণভয়ে যেসব মুসলমানরা পালিয়ে আসছিলেন আমাদের সাধ্য ছিল না তাঁদের আমরা তাড়িয়ে দিই। আমার মনে আছে কল্যাণীতে আমাদের শিবিরে একজন আমেরিকান পাদ্রী এসেছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম—তুমি কি দেখছ? আমরা শরণার্থীদের কিরকম রেখেছি? তিনি বললেন—আশ্চর্য ভাল। ভারতের এ দয়ার তুলনা হয় না। ইউরোপের দেশগুলি যদি এইভাবে তাদের দরজা খুলে দিত তাহলে হিটলারের জার্মানীতে ছয় মিলিয়ন ইহুদীকে ওভাবে গ্যাস চেম্বারে পুড়ে মরতে হত না।

এই সময়েই বন্যার মতন বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে মানুষ ঢুকেছে। কিন্তু শুনেছি চট্টগ্রাম থেকে যে সব মানুষ ডিঙ্গি করে নৌকো করে বর্মার দিকে গেছে, বর্মায় তো তারা ঠিকভাবে ঢুকতেই পারেনি। বাঁশ দিয়ে ঠেলে তাদের আবার জলে ফেলে দিয়েছে। বর্মায় একটি ছেলে এইভাবে ঢুকতে পেরেছিল, টিঁকতে পারেনি। হাঁটা পথে সে যখন কলকাতায় এসে পৌঁছল তার কাছে এসব গল্প শুনেছি। একমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া ভারতবর্ষের মত কোন দেশ দু-হাত বাড়িয়ে শরণার্থী নেয়নি। ইংল্যাণ্ডে এখন একটু কড়াকড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু বহু দেশের বহু মানুষ অত্যাচারিত হয়ে সেখানে আশ্রয় পেয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

পাকিস্তানের মানুষরা তো সবাই আমাদের আপন জন। দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করেছি ম্যাপে একটা লাইন এঁকে দিয়ে বা পতাকা তুলে একটা ঘোষণা করে দিলেই কি তাদের উপর ভালবাসা চলে যাবে? তাই পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচার শুরু হতেই দলে দলে যখন শরণার্থী ঢুকতে লাগল তখন ভারত সরকার কি করবেন? তাদের কি অর্ধচন্দ্র দিয়ে বার করে দেবেন? আবার কি গুলির মুখে ঠেলে দেবেন? যদি তা রাজনীতির চাপে পড়ে ভারত সরকার করতেন তাহলে দেশে যে রকম অবস্থা হয়েছিল তাতে নিঃসন্দেহে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই সারা পৃথিবী তখন পাকিস্তানের দুঃখে আকুল।

বাঙালীরা যে মার খেয়ে ঘরছাড়া হয়ে ভারতের কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই সত্যটা যেন কারুর লক্ষ্য হচ্ছে না। এক কোটি মানুষ নানা পথে ঢুকল ভারতবর্ষে। এতগুলো মানুষের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান ভারত করবে কি করে? সে কথার উত্তর কারো কাছে ছিল না। অথচ সেটাই প্রধান কারণ যাতে

ভারতের বাংলাদেশের সহায় হয়ে ওঠা অনিবার্য ছিল। কিন্তু সারা পৃথিবী বিশেষ করে আমেরিকা বৃটেন এরা যদি সকলেই বিমুখ থাকে তাহলে ভারত একা কি করে এই কুরুক্ষেত্র সামলাবে?

চীন এবং আমেরিকা দুই-ই ভারতের বিপক্ষে। পাকিস্তানের সপক্ষে। আমাদের এই সভ্যতার যে প্রকৃতি এখন দাঁড়িয়েছে তাতে সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত ছাপিয়ে, ন্যায়ধর্মের চেয়ে, সুবিধাবাদটাই হয়ে উঠেছিল বড়। সে জন্য ঠিক তখনই ভারত সরকার তথা ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারছিলেন না। অথচ সাহায্য না করে উপায় ছিল না। তাই সাহায্য গোপনে করতে হচ্ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করার মুশকিল ছিল। সেই কারণে মুক্তিফৌজের লোকেরাও অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। আমরাও ভাবছিলাম এরা আর কতদিন ধরে মার খাবে, আমরা বসে বসে দেখব? এই সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর প্রাজ্ঞতা-র তুলনা নেই। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন জগতের কোনও বৃহৎ শক্তি আমাদের সহায় না হলে আমরা কি করে এ কাজে নামব? কিন্তু তাঁর মনের কথা তো আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না, আর রাজনৈতিক জ্ঞানই বা কজনের আছে? তাই ঘরে ঘরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল—এখনই কেন ভারত মিলিটারী সাহায্য পাঠাচ্ছে না?

এদিকে ইউরোপের অনেকগুলি দেশ, বিশেষত ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা, এই সব পাশ্চাত্য শক্তি একযোগে ভারত সরকারের নিন্দা করে চলেছে। ম্যাপ দেখিয়ে বলছে—ঐ দেখ কত বড় বৃহৎ ভারতবর্ষ, আর কতটুকু ছোট্ট পাকিস্তান, আহা বেচারী! ভারত একে টুকরো টুকরো করার জন্য ব্যস্ত! একটা ছোট্ট মূষিককে বাঘটা গিলে ফেলবে। এই অবিশ্রাম করুণাধারা যখন সরকারী তরফ থেকে বয়ে আসছিল, তখন কিন্তু সেই সেই দেশের লোকেরা এসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়নি। বাংলাদেশের দুঃখে তারা যে কি পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ এ দেশে আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। এটা কি করে সম্ভব হল? সরকার যখন পাকিস্তানের সপক্ষে, এবং প্রচারও সেই রকম চলছে যে ভারতের উস্কানিতেই বাংলাদেশ যুদ্ধে নেমেছে কিংবা নামতে সাহস পেয়েছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সরকারের এতখানি প্রচার সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশের মানুষ কিন্তু বাংলাদেশের দুঃখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। আমার যতদূর মনে হয় ভিয়েৎনামের ব্যাপারেও তারা এতখানি বিচলিত হয়নি। সম্ভবত বাংলাদেশের দুঃখ বিষয়ে প্রচারকার্য খুব ভাল হয়েছিল। কে করেছিল? ভারত তো প্রচারকার্যে একেবারেই দড় নয়।

বিশেষত ভারত সরকারের প্রচারের ফলে ধারণা উল্টোই হয়।

পরে জেনেছি বাংলাদেশের ছেলেরা যারা বিদেশে থাকে তারা সেখানকার ভারতীয় বাঙালী ও সহানুভূতিশীল ইংরেজদের সঙ্গে নিয়ে এই প্রচারকার্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিল। ফলে ক্রমেই তাদের দিকে জনসাধারণের মন সহানুভূতিতে ভরে গেল। এই ব্যাপারটা আমেরিকা তথা সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে ঘটেছিল। বাংলাদেশের দুঃখের প্রচার আর যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের পাদ্রী সমাজ। এই বই লিখতে এঁদের কথা আমাকে মাঝে মাঝেই বলতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই অবাঙালী ভিন্নধর্মী মানুষদের অফুরান দান অস্বীকার করা যায় না। যদিও তাঁরা বারে বারেই সন্দেহভাজন হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমাদের সরকার ও বিদেশে স্থিত বাংলাদেশ সরকার এবং কিছুসংখ্যক অজ্ঞ জনসাধারণ এঁদের সদিচ্ছাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ভেবেছেন এঁদের সদিচ্ছা কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অবশ্য সাহায্য নিতে কেউই দ্বিধা করেননি। দিনের পর দিন এঁদের অত্যন্ত কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখে আমি সে অপবাদ বিশ্বাস করতে পারি না।

প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ করবার শুরুতেই আমার পুরনো বন্ধু জন হেস্টিংস যিনি সদর স্ট্রীটের চার্চের প্রধান তাঁর কথা মনে পড়ল। তিনিও শরণার্থী ঢোকামাত্রই কাজ শুরু করেছিলেন। একদিন তাঁকে দেখি জীপে করে কিছু বীজ ধান নিয়ে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলো কি করবেন? তিনি বললেন—এখন মুর্শিদাবাদের দিকে নদীর এপারে বীজ বুনব। জায়গা তৈরী করাচ্ছি, বীজ যোগাড় করছি। ওরা যখন নদীর ওপারে চলে যাবে, তখন তৈরী চারা নিয়ে চলে যেতে পারবে। তাহলে ওদের আর কোন অসুবিধা হবে না। এত চিন্তা এত ভালবাসা কু-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ভাবলে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর পাপ হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হল—জন হেস্টিংস পঁচিশ বছরের বেশী ভারত-ভূমিতে ছিলেন। তিনি খুব ভাল বাংলা বলেন।

তিনি তাঁর এদেশের কর্তব্য শেষ হওয়াতে দেশে ফিরে গেছেন। তারপর আর দেশে মন টেঁকে না। কাজ নিয়ে এখানে ফেরবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারত সরকার অনুমতি দিলেন না। এত আদিখ্যেতা কেন? নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। ভদ্রলোক, দেখেছিলাম, আকুলিবিকুলি করছেন ভারতে আসার জন্য। তিনি বাংলাদেশে কাজ করবার জন্য অনুমতি পেয়ে গেলেন।

প্রবচনে যেমন বলে, 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ', মধুর অভাবে যেমন গুড় তেমনি ভারত না হলে বাংলাদেশই সই—তাই সেখানে কাজ করছেন। সম্প্রতি এখানে কোন কাজে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি বললাম—ভাবছি একবার বাংলাদেশে যাব। আমার পুরনো চেনারা কে কোথায় গেছে ঠিক নেই। আমি আপনার ওখানে উঠব তাহলে। ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন—না, না, না। ওখানকার সরকার ভারতকে বড় সন্দেহ করে। আপনি আমার কাছে গেলে আমার অবস্থাও খারাপ হবে, আপনারও।

এই তো হলো রাজনৈতিক সন্দেহ বাতিকের বিকট চেহারা। সাধারণ মানুষের ওপরেও এর প্রভাব প'ড়ে তা সরলতা, বিশ্বস্ততা, মানুষের প্রতি ভালবাসা সব নষ্ট করে দেয়। এই সব সন্দেহের ফলে আমি নিশ্চয়ই জানি, আমরা যতটুকু জিতি তার চেয়ে হারি অনেক বেশী।

অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ কনস্যুলেট যেখানে হুসেন আলি নামে এক ব্যক্তি কর্তা ছিলেন তিনি চুপচাপই ছিলেন। কি কর্তব্য বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে তাঁদের প্রাসাদচূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা! আমাদের সকলকে এগিয়ে নিয়ে চলল এক বিরাট মিছিল করে। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গিয়ে হুসেন আলি সাহেবকে অভিনন্দন জানালাম।

বাংলাদেশ থেকে প্রফেসর, ব্যারিস্টার, সরকারী উচ্চ নিম্ন নানা পদের কর্মচারীরা যখন আসতে লাগল তখন ক্রমে ক্রমে আমি ওদেশের ইন্‌টেলি-জেনশিয়ার চরিত্রটা বুঝতে পারলাম। দু-একজন ছাড়া অধিকাংশেরই মধ্যে কোন রকম স্বার্থ ত্যাগের চিহ্ন দেখতাম না। বেশীর ভাগই এসে আনন্দ-বাজারের দপ্তরে, যুগান্তরের দপ্তরে ছুটতেন, সেখানে লিখে যদি নাম খ্যাতি ও রোজগার হয়। যে সব পত্রপত্রিকার ঘোর সাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্য আমাদের সঙ্গে বার বার দ্বন্দ্ব বেধেছিল সেই সব পত্রিকার অফিসে এঁদের নির্লজ্জের মত ধরণা দেওয়া আমার তো মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতা বলে কিছু ছিল না। বরং কোন বাংলাদেশী মুসলমানকে সাহায্য করতে পারলে, আশ্রয় দিতে পারলে, প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করত। প্রায় স্ট্যাটাস সিম্বল আর কি!

পত্রপত্রিকার পাতা থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সম্পূর্ণ উড়ে গেল। বাংলাদেশের লেখকদের বেশ কাঁচা লেখাও সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাতে ছাপা হয়ে

তাদের প্রবাসবাসের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের লেখকরা এতদিন পশ্চিমবঙ্গের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তাঁদের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য।

এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুসলমানরা তেমনভাবে যোগ দেয়নি। আজ তাদের সামনে সে রকম কোন নেতা নেই যে স্বার্থত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যে নির্লোভ, যে এমন এক আদর্শ মনুষ্যত্বের বুনিয়াদ তৈরী করেছে, যে-দিকে তাকিয়ে অন্য সাধারণ স্বার্থবদ্ধ মানুষ প্রেরণা পায়, যে রকম নেতার কথা গুরুগোবিন্দের মুখে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন—

তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা তাঁদের নিজস্ব জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন—তার প্রথমটি হচ্ছে মূল্যবোধ—কি ভাল কি মন্দ চেনা। রবীন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র হয়ে চাষীদের জন্য সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। কলকাতার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে মেঠো প্রান্তরে সারাজীবন বাউণ্ডুলেদের নিয়ে কাটান। গান্ধীজী যে কৌপীনবন্ত হয়ে বাকিংহাম প্যালেসের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন সে কি একটা পাগলামী না তামাসা? তিনি সারা পৃথিবীকে বুঝিয়েছিলেন যে সাজগোজ ধনসম্পদ-এর উপর মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে না। শুনেছি রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে যখন তিনি নেমে আসছিলেন তখন রিপোর্টাররা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, রাজার সামনে এই পোশাকে যেতে তোমার লজ্জা করল না? তিনি নাকি বলেছিলেন,—তা কেন করবে? 'The king was wearing enough clothes for both of us : অর্থাৎ সাজসজ্জা এ সব বাহ্যবস্তু। এর উপর মানসম্মান সুখ কিছুই নির্ভর করে না বরং এই সব বাহ্য জিনিসকে মূল্য দিলে অন্তরের সম্পদ ক্ষুণ্ণ হয় এবং তখনই মনুষ্যত্বের মর্যাদা নষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী যদি গহনামণ্ডিত হয়ে থাকতেন, তবে তিনি আশ্রমজননী হতে পারতেন না। আর কস্তুরবা যদি বেনারসী পরতেন তাহলে তিনি যে সম্মানের আসন পেয়েছিলেন তা পেতেন না।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাও শুধু প্রাণ ত্যাগ করতেই শেখেননি, লোভ ত্যাগ করতেও শিখেছিলেন। একদিন উন্মাদনার ঝোঁকে প্রাণ দেওয়া সোজা, কিন্তু

দিনে দিনে সব লোভ কামনা বাসনা ত্যাগ করে নিরলস পরোপকার করা বড় কঠিন কর্ম। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে—তার প্রয়োজন কি? দেশ স্বাধীন করবার জন্য ত্যাগী হতে হবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আজ এই উপমহাদেশে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। স্বার্থচর্চার ফলেই যে স্বাধীনতার ফল ফলছে না তা তো বাংলাদেশের বেলায় আরও বেশী করে প্রত্যক্ষ হল। আমাদের বেলাতেও গুরুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি, শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। নানা মতের দ্বন্দ্বে তা পথহারা। পরের প্রজন্ম তা গ্রহণ করতে পারেনি, ফলেই এ অবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে ঠিক সেই সময়েও যে মূল্যবোধের অভাব দেখেছিলাম এ দেশে অনেক কু-দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তা আমাকে বিস্মিত করেছিল। এখানে যা লিখলাম নানা ছোটখাট ঘটনায় বার বার তার প্রমাণ পেয়েছি। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

এই সময়ে সীমান্তের শিবিরগুলিতে আমি প্রত্যহ যেতাম। অনেক কাজ থাকত। কি কি কাজ তা পরে বলছি। তবে আমার বয়সী সহকর্মীরা কেউই রোজ যেতে পারতেন না। তাঁরা তো আমার মত বেকার নন। তাই বেশ কিছু অল্পবয়সী স্বেচ্ছাসেবী জুটিয়ে নিয়েছিলাম। অনেক সময় যাকে হাতের কাছে পেতাম সঙ্গে নিয়ে যেতাম। এই সময় কবি স্বর্গীয় জীবনানন্দ দাশের কন্যা মঞ্জু আমার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন।

বাংলাদেশের ব্যাপারে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতই তথা সারা পৃথিবী উদ্বিগ্ন এবং সাহায্য করতে আগ্রহী। আমাকে কেউ জানিয়েছেন যে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও মালতী চৌধুরী বেশ কিছু টাকা তুলেছেন বাংলাদেশের সাহায্যার্থে। বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে হুশেন আলি আমায় বলে পাঠালেন, এই টাকা যদি তাঁরা ভারত সরকার মারফত না পাঠিয়ে সোজাসুজি বাংলাদেশকে দেন তাহলে ভাল হয়। মহম্মদ আলি, বা আমীরুল ইসলাম আমাকে তাই বললেন। ইতিমধ্যে খবর পেলাম নবকৃষ্ণ চৌধুরী সস্ত্রীক বনগাঁ এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের লিখে জানালাম বাংলাদেশের কনস্যুলেট থেকে কাউকে নিয়ে যাব। আমীরুল সেই রকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। অর্থাৎ গাড়ির ব্যবস্থা। তখনও আমার ঠিকমত কোন গাড়ির ব্যবস্থা নেই। আর ওদিকে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু জীপ, ভ্যান এসে গেছে। বেনাপোলের কাছে একটা জায়গায় সেগুলো আটক আছে। সেগুলোর তো কোন নম্বর নেই, কলকাতার রাস্তায় চলবে কি করে? আস্তে আস্তে ব্যবস্থা হচ্ছিল। সেই রকমই একখানি ভ্যান আমীরুল আমায় সকাল বেলায় পাঠিয়ে দেবে বলে-

ছিল। গাড়ি এলে আমি ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে বাংলাদেশের ঐ অফিসারটিকে তুলে নিয়ে নবকৃষ্ণবাববুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব এই রকমই কথা ছিল। ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরী বাংলাদেশের মামলা নিয়ে বিশ্ব-সভায় লড়বেন শুনছিলাম।

তিনি ধনী। তাঁর সুসজ্জিত বিরাট বাড়িতে অনেকেই স্থান পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের এই পলাতক ইনটেলিজেনশিয়ারা এই রকম বাড়িতে থাকতে ভালবাসতেন। এ বিষয়ে পরে আরও কিছু বলব বা কথাপ্রসঙ্গে আসবেই। আর ওদিকে সীমান্তের ধারে ধারে শরণার্থীর শিবিরে শিবিরে জলে কাদায় দুর্গন্ধে দারুণ কষ্টকর অবস্থায় যে হাজার হাজার মানুষ দুঃখ ভোগ করছিল তারা এঁদেরই চিন্তার ফলে, এঁদেরই রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে, এই কষ্টের মধ্যে এসে পড়েছিল। তারা তো বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়, তাই তাদের দুর্গতির জন্য মোটামুটি যাঁরা দায়ী ছিলেন তাঁরা কিন্তু তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি।

কনস্‌লেট থেকে যে যানটি আমাকে পাঠানো হয়েছিল তার ড্রাইভারের সিটের পাশে ঠেসাঠেসি করে দুজন বসতে পারে। পিছনটা মাল নেবার উপযুক্ত, সিট নেই। এই রকম যান ছাড়া আর কিছু সচরাচর পাওয়া যেত না। যদিও সীমান্তের কাজ আমার ভাল মতই শুরু হয়ে গেছে, তবু যান-বাহনের জন্য বড়ই মুশকিল হচ্ছিল। সে কথা গৌরী প্রথমেই বলেছিলেন, কিন্তু আসল কাজ তো সেখানেই। সেখানেই তো বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ। বাংলাদেশের কাজ করতে হলে তাদের পাশেই তো দাঁড়াতে হবে। যাহোক মঞ্জু আর আমি ভ্যান নিয়ে সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ির সামনে এলাম, বাংলাদেশের ছেলেদের নিয়ে কাজে বেরোবার আরেক মুশকিল ছিল। ওরা সব দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে। অত দূর পাল্লায় যেতে হলে খুব ভোরে ওঠা দরকার। আমি তো ছটায় তৈরী, কিন্তু গাড়ি আসা চাই, অন্য সঙ্গীদের তৈরী হওয়া চাই, এই সব অনেক কিন্তু ছিল।

অবশ্য সেদিন তিনি তৈরীই ছিলেন। ধরা যাক তাঁর নাম সিরাজ। তিনি ঘরের থেকে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—বনগাঁয়ে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে? আমি বললাম—হ্যাঁ, আজ আমরা থাকব। অনেক সময় আমরা বনগাঁয়ের ডাকবাংলোতে থাকতাম। ভদ্রলোক বললেন—তাহলে নাইটস্যুট নিয়ে আসি,—বলে দৌড়ে একটা তোয়ালে মোড়া প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর গাড়ির কাছে এসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—sittin[illegible] arrangements এইরকম? আমি বললাম, হ্যাঁ, রোদ [illegible]

ছিল। গাড়ি এলে আমি ব্যারিষ্টার সুব্রত রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে বাংলাদেশের ঐ অফিসারটিকে তুলে নিয়ে নবকৃষ্ণবাববুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব এই রকমই কথা ছিল। ব্যারিষ্টার সুব্রত রায়চৌধুরী বাংলাদেশের মামলা নিয়ে বিশ্ব-সভায় লড়বেন শুনছিলাম।

তিনি ধনী। তাঁর সুসজ্জিত বিরাট বাড়িতে অনেকেই স্থান পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের এই পলাতক ইনটেলিজেনশিয়ারা এই রকম বাড়িতে থাকতে ভালবাসতেন। এ বিষয়ে পরে আরও কিছু বলব বা কথাপ্রসঙ্গে আসবেই। আর ওদিকে সীমান্তের ধারে ধারে শরণার্থীর শিবিরে শিবিরে জলে কাদায় দুর্গন্ধে দারুণ কষ্টকর অবস্থায় যে হাজার হাজার মানুষ দুঃখ ভোগ করছিল তারা এঁদেরই চিন্তার ফলে, এঁদেরই রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে, এই কষ্টের মধ্যে এসে পড়েছিল। তারা তো বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়, তাই তাদের দুর্গতির জন্য মোটামুটি যাঁরা দায়ী ছিলেন তাঁরা কিন্তু তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি।

কনস্যুলেট থেকে যে যানটি আমাকে পাঠানো হয়েছিল তার ড্রাইভারের সিটের পাশে ঠেসাঠেসি করে দুজন বসতে পারে। পিছনটা মাল নেবার উপযুক্ত, সিট নেই। এই রকম যান ছাড়া আর কিছু সচরাচর পাওয়া যেত না। যদিও সীমান্তের কাজ আমার ভাল মতই শুরু হয়ে গেছে, তবু যানবাহনের জন্য বড়ই মুশকিল হচ্ছিল। সে কথা গৌরী প্রথমেই বলেছিলেন, কিন্তু আসল কাজ তো সেখানেই। সেখানেই তো বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ। বাংলাদেশের কাজ করতে হলে তাদের পাশেই তো দাঁড়াতে হবে। যাহোক মঞ্জু আর আমি ভ্যান নিয়ে সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ির সামনে এলাম, বাংলাদেশের ছেলেদের নিয়ে কাজে বেরোবার আরেক মুশকিল ছিল। ওরা সব দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে। অত দূর পাল্লায় যেতে হলে খুব ভোরে ওঠা দরকার। আমি তো ছটায় তৈরী, কিন্তু গাড়ি আসা চাই, অন্য সঙ্গীদের তৈরী হওয়া চাই, এই সব অনেক কিন্তু ছিল।

অবশ্য সেদিন তিনি তৈরীই ছিলেন। ধরা যাক তাঁর নাম সিরাজ। তিনি ঘরের থেকে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—বনগাঁয়ে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে? আমি বললাম—হ্যাঁ, আজ আমরা থাকব। অনেক সময় আমরা বনগাঁয়ের ডাকবাংলোতে থাকতাম। ভদ্রলোক বললেন—তাহলে নাইটস্যুট নিয়ে আসি,—বলে দৌড়ে একটা তোয়ালে মোড়া প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর গাড়ির কাছে এসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—**sitti**-
arrangements এইরকম? আমি বললাম, হ্যাঁ, রোদ

আমি তো পিছনে একটা সতরঞ্জি বিছিয়ে দিই। তাতেই সবাই ছাতা বা একটা কাগজ মাথায় ধরে বসে চলে যায়। অন্য গাড়ি তো নেই, আপনার কষ্ট হবে। তিনি বললেন—না, না, কষ্ট হবে না, কষ্ট কিছুই না,—প্রেস্টিজ। একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছি, প্রেস্টিজ তো আছে! আমার কথাটা কানে খট্ খট্ করে লাগছিল। তাই আমি বার বার করে বলছিলাম, আপনার কষ্ট হবে। যাতে উনি সেই কথাটাই ধরে নেন। কারণ, অনভ্যাসের দরুণ শারীরিক কষ্ট হওয়াটা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু প্রেস্টিজ হানি হবে—এ কথাটা বলার মধ্যে যে লজ্জা আছে তা তাঁর খেয়াল হল না। তিনি বার বারই সেকথা বলতে লাগলেন। আমি খুব বিরক্ত বোধ করলাম। আমি বললাম —তাহলে আপনাকে যেতে হবে না। পরে ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের গাড়িটা একটু দূরে যাবার পরে হঠাৎ মঞ্জু বললে, একটা ভুল হয়ে গেল। আমি বললেই পারতাম, আপনি এখানে বসুন, আমি পিছনে যাচ্ছি। আমিও ভাবলাম, সত্যিই তো, আমিও তা বলতে পারতাম এবং আমাদের তা করাই উচিত ছিল। মঞ্জুর কথাতেই আমি বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে অভ্যাসবশতঃ অগোচরে কত ভ্রম লুকিয়ে থাকে। আমার হয়ত প্রেস্টিজ হানি হত না, তবে গায়ে ব্যথা হত। যা হোক, ঐ ব্যক্তির জন্য আর ফিরলাম না আমরা।

এদিকে বনগাঁয়ে পৌঁছে নবকৃষ্ণবাবুর সন্ধান করতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিবিরে গিয়ে এক দৃশ্য দেখলাম। যাঁদের কাছে assigr.ment নিয়ে আসতে ভাল গাড়ি বিহনে প্রেস্টিজ হানির কথা সিরাজ ভাবছিলেন তাঁদের প্রেস্টিজের অবস্থা শোচনীয়। মালতী চৌধুরী একখানা ঝাড়ু নিয়ে শিবির ঝাঁট দিতে শুরু করেছেন। তিনি বলছেন—জমাদার আসেনি বলে শিবির নোংরা। কিন্তু এখানে যারা আছে তারা নিজেরা কেন ঝাঁট দেবে না ? জমাদার থাকবেই বা কেন ? একে পরের দেশে পরান্নভোজী হয়েছে ঘটনাচক্রে, কিন্তু এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকবে না কেন যে নিজের কাজ নিজে করব ? ইংরেজী শব্দ প্রেস্টিজ ও বাংলা শব্দ আত্মসম্মান—এ দুইএর যে পার্থক্য আছে সেই বোধটা বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত অনেকবার বিলেত ঘুরে আসা মানুষের মধ্যেও অনুপস্থিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। কারু কারু ছিল তো নিশ্চয়ই। তাদেরই জন্য আজও ওদেশের প্রতি মমতা [illegible] আছে।

[illegible] যেতাম ? কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে টানত। এসব

কাজ তো আমার নয়। এদেশে তো ছোটখাট যুদ্ধ ও নানারকম দৈবদুর্যোগ ঘটে গেছে। কিন্তু এরকমভাবে জড়িয়ে এর আগে কখনও পড়িনি। অত মানুষ এক সঙ্গে এক অসীম দুর্গতির মধ্যে পড়েছে—সেখানে করণীয় কাজ অনেক থাকে। বিশেষত শিশুদের জন্য।

ইতিমধ্যে বয়রার পথে তিন-চারটি বড় বড় শিবির হয়েছে। আমি ভাবছিলাম এই সব শিবিরে শিবিরে কয়েকটা স্কুল করব। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জলে কাদায় নোংরায় সারাদিন বেড়াচ্ছে—এদের জন্য কিছু করা দরকার, প্রচুর সাহায্য আসছে। তার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দরকার। সরকারী কর্মচারীরা তো কাজ করছেই। কিন্তু তাদেরও সাহায্য দরকার। ইতিমধ্যে যুদ্ধের বেগ আরও প্রচণ্ড হওয়াতে ডাক্তারী সাহায্যের প্রয়োজন বেড়ে ওঠে, এবং বয়রায় সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স শিবির করে। তাঁদের সুযোগ্য হাতে আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রটি তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই। আমরা এ্যামেচার, আর ওঁরা পটু।

কত কাজ আছে কিন্তু রোজ রোজ গাড়ি পাই কোথায় ? তাই একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এর রিলিফ সেক্রেটারীর ঘরে গেলাম গাড়ি চাইতে। তাঁর নামটা আজ মনে করতে পারছি না। তাঁকে বললাম, আমাদের একটা জীপ দিন, অনেক কাজ করছি আমরা, আরও করব।

তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন—আপনাকে জীপ দেব কি করে ? জীপ কোথায় ? **Vehicle**-এর অভাবে আমাদেরই কত কাজ আটকে যাচ্ছে। —আমিও তর্ক করছি, আমরা বিনা পয়সায় কাজ করছি, আর সরকার আমাদের এতটুকু সাহায্য করবে না ?

ইতিমধ্যে একটি অল্পবয়সী ছেলে ঘরে ঢুকল। সে ডাক্তার, কাজ চাইছে। বুঝলাম সে আগে আরও দুই-একবার এসেছে। সেক্রেটারী বললেন, আমি তো কাজের ব্যবস্থা কিছু করতে পারিনি। আমি বললাম—আমার ডাক্তার দরকার। কাজ চলার মত টাকা দেবো। কিন্তু সেই নবীন ডাক্তারটি বাংলাদেশ থেকে এসেই কলকাতার মহিমা বুঝে গেছে। সে কলকাতায় কাজ করবে।

তার সঙ্গে তর্কাতর্কি চলছে এমন সময় ঐ ঘরে একজন ব্যক্তি ঢুকলেন। মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। সেক্রেটারী তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন। খুব সমীহ করে কথা বলছেন। বুঝলাম, ইনি দিল্লী থেকে এসেছেন, একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের ম্যাপ আছে ? ঘরে একটা ম্যাপ ছিল বটে

তবে সেটা অভঙ্গ বঙ্গের।

সেক্রেটারী বললেন, না, পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ তো নেই।

সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি, যাঁর নাম পরে জেনেছি কর্নেল লুথরা (তখন নয় কারণ তখন তাঁর সঙ্গে কেউ আমায় পরিচয় করিয়ে দেয় নি), তিনি বললেন, কিন্তু একটা ম্যাপ তো দরকার। যোগাড় করা যায় না? সেক্রেটারী বিপন্ন মুখে মাথা নীচু করে আছেন, ভাবখানা—এখন বাংলাদেশের ম্যাপ পাই কোথায়? আমি বসে বসে ভাবছি, ইনি তো মিত্র পক্ষ, এঁকে দেওয়া যেতে পারে। অনেক লেখার সঙ্গে আমরা তো এই ম্যাপ ছেপেছি। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনার কি পূর্ববঙ্গের ম্যাপের প্রয়োজন আছে? লুথরা বোধহয় অবাক হয়ে ভাবছিলেন, এই শাঁখা সিঁদুর পরা মানুষটি তাঁর মত মিলিটারি পার্সনেলকে কি সাহায্য করবে? তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ, কেন? আপনি দিতে পারবেন?

—পারি।

—কবে?

—যখন বলবেন। ক'খানা চান?

…ক'খানা…! আচ্ছা, ছ-খানা। কাল কখন দেবেন?

আমি ঠিকানা নিলাম থিয়েটার রোডের একটা বাড়ির। আমি ম্যাপ পাঠালাম না, নিজে নিয়ে গেলাম। আমার প্রেসে তো ছাপা হয়েছে… অসুবিধা কি? লুথরা বিস্মিত হয়ে গেলেন—আপনি কে? আপনি কি করে এই ম্যাপ পেলেন বলতেই হবে।

তখন আমি দেশ বিভাগের পর থেকে বাঙালী মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, ভাষা-আন্দোলনের কথা, পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলমানের অন্তর্জগতের বিবর্তনের কথা এবং আমাদের কাজের কথা সবিস্তারে বললাম। সকালে গিয়েছিলাম, দুপুরে খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল. ইনি কেন্দ্রের রিলিফ ও রিহ্যাবিলেটেশনের সেক্রেটারী। জিনিসপত্র বিতরণ থেকে রিফিউ-জিদের সমস্ত সমস্যা, মুক্তি-ফৌজের সমস্ত অভাব মেটাবার ভার তাঁর হাতে। তিনি পাঞ্জাবী। তাঁর কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনলেই বা কি হয়, না শুনলেই বা কি হয় তা তাঁর ঠিক মতো জানা নেই।

কাব্য সাহিত্যের জন্য যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে এ কজন লোক বুঝবে? এই সাহিত্যেরও ভাষার কথাটা হয়ত ছিল আবরণ, ভিতরটা পলিটিকাল। অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত। আমাদের এদিকে

কেউ কেউ সেই আবরণটি ছিঁড়ে দেখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পর্দার পর পর্দা সরিয়েও আমরা পলিটিক্সের চেয়ে অন্য জিনিস পাচ্ছিলাম। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গান, কবিতা, দেশপ্রেম সাধারণের মধ্যে উথলে পড়ছিল। বাঁধভাঙা দেশপ্রেমের গানে গানে ক্রমে দুই বঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল। আশ্চর্য কথা এই যে বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের এই ভারতে একদা সত্য সেই সব বিস্ময়কর স্বদেশী গান আজকের জীবনের অসত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় জোলো এবং মরা বলে বোধ হত। সেই গানই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠল—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি,

তবে এই ছবিটা তো অবাঙালীরা ঠিকমত বুঝতে পারবে না। আয়ুব খাঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা বন্ধ করেছিলেন—তাতে বাঙালী মুসলমানদের কি এমন ক্ষতি হচ্ছিল তা অবাঙালীরা কি জানে! পাঞ্জাবীরা তো রবীন্দ্রসঙ্গীত কখনও-সখনও শোনে বটে তবে তা বন্ধ করলে কি যুদ্ধ বাধাবে? আমার তাই মনে হল কর্নেল লুথরা যে কাজের কর্ণধার সে কাজের ভিতরের ব্যাপারটা তাঁর পরিষ্কার করে জানা দরকার। তাঁরও হয়ত সেই রকম কিছু মনে হয়ে থাকবে। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে করে বহু কথা শুনে নিলেন। অবশেষে যখন বিদায় নিয়ে উঠে পড়েছি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো অনেক কাজ করছেন, কিছু সাহায্য চাই আপনার। কাল ওখানে কি করছিলেন?

আমি বললাম, সীমান্তে সীমান্তে ঘুরি আমি, একটা জীপ হলে অনেক কাজ করতে পারি। তিনি বললেন, এই কথা? কাল সকাল থেকে আপনি জীপ পাবেন। ভোরবেলা আপনার কাছে গাড়ি যাবে। ছাড়বার সময় লগ বুক সই করে ছেড়ে দেবেন।

তারপর থেকে প্রতিদিন আমি জীপ পেয়েছি। ১৮ই মার্চ বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যশোরে ঢুকলাম। তারপরও প্রায় দু-তিন মাস বাংলা-দেশের কাজে জীপেই যাতায়াত করেছি। এ ছাড়াও প্রত্যেকটি কাজে লুথরা আমায় সাহায্য করেছেন। আমিও তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা যথাসাধ্য করেছি। অনেকদিন পর্যন্ত লুথরা ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। পরস্পরের প্রতি অটুট বিশ্বস্ততা ছিল। এতটা কোন রাজকর্মচারীর সঙ্গে কোনোদিন হয় নি। তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা অতি সুন্দরী সাবলীল মেয়ে। খুব স্নেহ করতাম তাঁকে। ওঁরা দুজনেই আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলতেন। বয়সে সে তো যথেষ্ট ছোট। ইন্দিরাকে তো নাম ধরেই ডাকতাম, কিন্তু তাঁর স্বামীকে সম্ভব

হচ্ছিল না। আর কোন কারণে নয়, শুধু তাঁর নামের কারণে—তাঁর নাম হচ্ছে প্রাণনাথ। কেন বাংলা ভাষায় এটা বলা যাচ্ছে না তা তাঁদের বলতে পারিনি।

আমার বড় বাড়ির স্কুলটা গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ছুটি না হলেও বন্ধ করতে হত। পশ্চিমবাংলার, বিশেষত কলকাতার আশেপাশে অনেক স্কুলই বন্ধ ছিল। কারণ সব স্কুলই শরণার্থীতে ভরা। সাধারণ মানুষের তখন শরণার্থী সম্বন্ধে এত বেশী সহানুভূতি যে, স্কুল বন্ধ থাকলে তো আপত্তি নেই বটেই, নিজের শোবার ঘরটিও ভাগ করতে পারে। এই কলকাতা শহরে কত পরিবারে এক একজন পাঁচ-ছটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্থান পেয়েছেন। অনেক কষ্ট করেও অতিথি পরিচর্যায় তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ শরণার্থীই মুসলমান। সত্যি বলতে কি মুসলমান হলেই বেশী আনন্দ। শুধু সুব্রত চৌধুরীর মত বিত্তবান লোকেরাই নয়, অনেক স্বল্পবিত্ত মানুষরাও। এটা কি পলিটিকাল? না, এটা একটা যথার্থ সৌভ্রাত্রের বোধ যা ইতিপূর্বে কোনদিন এমন করে প্রকাশ পাবার সুযোগ হয়ত হয়নি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সবরকম ভাব আছে। কিন্তু সময় ও প্রেরণার সংযোগ হলে তবেই তার প্রকাশ হতে পারে। অন্যের জন্য কষ্ট সহ্য করার এই ক্ষমতা অনেক দিন হারিয়ে গিয়েছিল, অন্তত জনতার জীবনে। সবাই মিলে ত্যাগ করার প্রয়াস যা গান্ধীজীর আহ্বানে একদিন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, স্বাধীনতার পূর্বে যা বিপ্লবীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই রকমই একটা প্রেরণা যেন বাংলাদেশের মানুষদের দুঃখের সংযোগে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জাগিয়ে তুলেছিল। যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কয়েক-দিন আগেই দারুণ বিষ উদ্গীরিত হতে দেখেছি হঠাৎ যেন তারাই বড় আপন হয়ে গেল। দরজা খুলে গেল শুধু নয়, আমাদের মনের ঘরটাও বড় হয়ে গেল এই বিপুল জনস্রোতকে ধারণ করবার জন্য।

আমার স্কুল বাড়িটা বড়, যে বাড়িতে থাকি সেটা ছোট তাই ৮ই এপ্রিল ঐ স্কুলবাড়িতে একটা শিবির খুললাম, আমাদের ব্যবস্থা ছিল ঘরে ঘরে কার্পেট বিছিয়ে তার ওপরে চাদর দিয়ে ঢালা বিছানা, আর সকালে এক কাপ চা। আমার এখানে ছেলেরাই ছিলেন। বিশেষ বন্ধুত্ব যাঁদের সঙ্গে হয়েছিল সেই সব মেয়েরা আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে থেকেছেন। স্কুল বাড়িতে জন পঞ্চাশেক মানুষ থাকতেন। অর্থাৎ যাওয়া-আসা করতেন, কে যে কখন যাচ্ছেন তার ঠিকানা নেই। আর মাঝে মাঝে আমার বসবার ঘরে মিটিং বসত, প্রতিদিন অন্তত দুশো কাপ চা তৈরী হত। নানা রকম লোক আসতেন।

যেমন এক এক নূতন লোক আসছেন অমনি তাঁদের কাছে নূতন নূতন কথা শুনতে সবাই এসে জড়ো হচ্ছে, কি হল, কোন পথে কে কি করে এল ? মুজিব আছেন কি নেই, ভবিষ্যৎ কি রকম হবে ইত্যাদি। আমাদের ঘরে মধ্যমণি হয়ে আসর জমিয়ে বসতেন আর্টিস্ট কামরুল হাসান। ইনি আর্টিস্ট খালেদ চৌধুরীর বাড়ি উঠেছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় আমার বসবার ঘরে ফরাসে তিনি ও অন্যান্য অনেকে বসে আছেন। আমরা একটা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করছি। প্রয়োজনীয় বিষয়টা যে কি—তা আর এখন মনে পড়ছে না। প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো এই রকমই পরে আর মনেই পড়ে না।

তখন হঠাৎ ঘরের মধ্যে হাতে প্লাস্টার বাঁধা একটি সুদর্শন যুবক এগিয়ে এল, ঘরসুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল, বাদশা, বাদশা ! শুনলাম এই ছেলেটি মুজি-বরের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল। যখন মুজিবর রহমান বাড়িতে অপেক্ষা করছেন তাঁকে ধরতে আসবে বলে তখন বাদশাও সেখানে, তার আগে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তা মওদুদের কাছে শুনেছি।

মওদুদ আহমেদ ব্যারিস্টার—সে আমাদের বাড়ির সামনে জব্বার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। জব্বার সাহেব নবাব মোসারেফ হোসেনের জামাই। তাঁর বাড়ি একেবারে প্যালেস বললেই হয়। আরামে ছিল মওদুদ, সে যেদিন এসে পেঁছিয় সেদিন এ বাড়িতে আর একটি ছেলে এসেছিল, তার নাম কামাল চৌধুরী। তাকে বড় ভাল লেগেছিল। ইংরাজীতে লিখলে কমল আর কামাল নামটির পার্থক্য বোঝা যায় না। হিন্দু মুসলমান নাম দুটি একই দেখায়। এই ছেলেটি ছিল যেন সেই অভেদেরই প্রতীক, আরও একজন ছিল যার কথা ভুলতে পারি না, তার নাম ওয়ালি-উল-ইসলাম। নামে যতই আরবী গন্ধ থাকুক, একেবারে শ্যামবর্ণ বাঙালীর ছেলে। ভারি বুদ্ধিমান ও মিষ্টি স্বভাব। এ যে কি করে সরকারী কাজ করত কে জানে ? আমাদের যেমন **I.A.S.** ওদের তেমনি **I.P.S.** ওয়ালি-উল-ইস্‌লাম **I.P.S.** ছিল।

মওদুদ বলেছিলেন ২৫শে মার্চ সে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বসে ছিল। সেখানে প্রচুর বিদেশী জার্নালিস্ট ছিল। মিলিটারি এসে নোটিশ দিয়ে গেল যে, কেউ যেন ঘর থেকে না বের হয়। ওরা সব ছাদে উঠে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে যে রাস্তায় ট্যাঙ্ক বেরিয়ে পড়েছে। একজন সাহেব জার্নালিস্ট সাহস দেখিয়ে হোটেল থেকে যেই রাস্তায় বেরিয়েছে—তার কলার ধরে একটা সৈন্য ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বন্দুক, আর বেয়নেটের কাছে সংবাদ সংগ্রহের উৎসাহ টিঁকিয়ে রাখা শক্ত।

তারপর সে রাতের খবর তো সকলেরই জানা, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা জানে, যাঁদের উপর হামলা হয়েছে, তাঁরা ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা বিস্তারিত ভাবে বলেছেন ও লিখেছেন। বাদশার কাছ থেকে মুজিবকে ধরতে আসা, ধরার ও নিয়ে যাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ সবাই খুব আগ্রহ ভরে শুনছিলেন। কিছু বোঝা গেল না—তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল? তাঁকে যে অ্যারেস্ট করতে আসবে তা তো জানাই ছিল। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পালাতে রাজী হননি। ভোটের জোরে তখন তো তিনি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবার যোগ্য। কিন্তু বেয়নেটের জোরে, কামানের জোরে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল। সমস্ত যুদ্ধের সময়টা বোঝা যায়নি তিনি কোথায় ছিলেন, জীবিত কি মৃত? এই দুশ্চিন্তা সকলকেই বড় উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। সেইজন্যই বাদশা খুব প্রাধান্য পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে 'মুজিবনগরে' শপথ নেওয়া হয়ে গেছে। সকলেই জানে 'মুজিবনগর' আছে কল্পনায়। সকলেই হাসে। রেডিও বাংলাদেশও চালু হয়েছে। কোথা থেকে অনবদ্য বাঙাল ভাষায় মুস্তাফা আক্তার কথা বলছে। এ যেন আঁচলে মুখ ঢেকে লুকোচুরি খেলা। আমাদেব প্রেসে অবিরাম ছাপা চলেছে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও নানা কাগজপত্র। দলে দলে শরণার্থী আসছে বর্ডারে ও কলকাতায়। কলকাতায় আসছে বলিয়ে কইয়ে, চতুর, লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা, তাদের ভালই লাগত। জহির রায়হান এসে পেঁছিলেন। ইনি শুনলাম বাংলাদেশের একজন নামকরা ফিল্ম ডিরেক্টর এবং একটি খুব বিপ্লবী ফিল্ম তৈরী করেছেন। কোনমতে তার রীলগুলো নিয়ে এসেছেন। জহির রায়হান আমার স্কুল বাড়িতে রয়ে গেলেন। সেখানে তখন প্রধান কর্তা দুই জন, কামাল চৌধুরী ও ওয়ালি-উল-ইসলাম। ওয়ালি সরকারী কর্মচারী। কিন্তু মতামত পকিস্তান বিরোধী হওয়ায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। একদিন ওয়ালি এসে বলল যে, জহির রায় যে মহামূল্য ফিল্ম ও পাকিস্তানীদের গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের ছবিগুলো এনেছিল তা চুরি গেছে। কয়েকটা ছবি আমি দেখেছিলাম। তার মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস ছিল একটি ধর্ষিতা মেয়ের ছবি। সে মেয়েটি উল্টে পড়ে আছে আর তার পিঠের মাংস শেয়ালে খুবলে খাচ্ছে। এই ভয়ানক ছবি কে যে তুলল, কি করে উঠল, কে জানে। ফিল্মটাই বা চুরি করল কে এবং কি উদ্দেশ্যে? এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমি এদের বললুম,—তোমরা ঘর খোলা রেখে কে যে কখন বেরিয়ে যাও—আমি তো টেরও পাই না। এর পর সব শেষে যে যাবে আমার বসবার ঘরে চাবি রেখে যাবে। দরজায় নোটিশ টাঙাও যেন

আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে যায়। সেইরকম ব্যবস্থা হল। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি রোগা কালো মত ছেলে অত্যন্ত মুখচোরা, এসে আমার কাছে চাবি চাইল। আমি বললুম, তোমাকে আমি চিনি না। তোমার কথাও কোনদিন শুনিনি। জহির রায়হানের ফিল্ম চুরি গেছে। তোমাকে আমি চাবি দেব না। বেচারা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সবাই ফিরলে ফিরে এল। পরের দিন শুনি সে ডঃ বিলায়েৎ হোসেন, অধ্যাপক, বিলাতের ডক্টরেট আছে। আমি ওঁকে চোর ধরেছি বলে সবাই ক্ষ্যাপাতে লাগল। অবিশ্রাম ক্ষ্যাপানি। মওদুদ বললে, বেচারার লেগপুল করতে করতে ওর লেগ দুটো আর নেই, একটা হুইল চেয়ারের অর্ডার দিন।

সকাল নটার সময় স্নান-টান সেরে সবাই বেরিয়ে যায়— এক এক জন এক এক ধান্দায়। ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলা। তখন আমার বৈঠকখানা-ঘরে চা সহযোগে আড্ডা জমে, এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মজলিস ও মজাও যে হয় না তা নয়। নানারকম লোক আসছে, ফিল্ম অ্যাকট্রেস, অ্যাক্টররাও আসছেন। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। যতদূর মনে হয় সেই হয়ত সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছিল। একেবারে সরল ছেলেমানুষ। ঘরভর্তি লোক, সকালের দিকে সে রূপের তরঙ্গ তুলে এসে ঢুকল। তারপর যত আলোচনা হচ্ছে কিছুতে মন দেয় না। আর আমাকে একজন বিরাট মাতব্বর ভেবেছে। আমার গা ঘেঁষে বসে কেবল বলছে—ও দিদি, আপনি ইন্দিরা গান্ধীরে বইল্যা যুদ্ধটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ কইর‍্যা ফ্যালান। করেন না দিদি, আপনারা যা করবেন তাড়াতাড়ি কইরা ফ্যালান। বোধ হয় দেশে কোন ফিল্ম অসম্পূর্ণ ফেলে এসেছিল এবং আমাকে বিরাট প্রভাবশালী কেউ ভেবেছিল।

সারাদিন আমি ঘুরতাম হয় বর্ডারে, নয় নানা খৃশচান সংস্থায় সাহায্যের জন্যে। খাদ্য, কাপড়, ঔষধ নানা দেশ থেকে এসে জমা হচ্ছে। সন্ধ্যায় সেগুলো বিতরণ চলে। বড় বড় ধনীর ছেলেরাও এক বস্ত্রে চলে এসেছে। **M. C. C. (Mennonite Central Committee)** অনেক চাদর দিয়েছিল। সেই চাদরের স্তূপীকৃত বোঝা নিয়ে বসে একজন মেয়ে দিবারাত্র প্রমাণ সাইজের শার্ট বানিয়েই চলেছে। যে কেউ আসছে গায়ে মাপমত হলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শ্রদ্ধেয় লেখক আবুল ফজলের পুত্র মঞ্জুর এ কাপড়ের একটি লাল শার্ট নিয়েছিল। ঐ শার্টটি তার বড় প্রিয় ছিল। বহুদিন পর্যন্ত সে ঐ স্মৃতি-চিহ্ন আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। মঞ্জুরের মত মধুর স্বভাবের ছেলে দেখা

যায় না। কিন্তু ওর বড় ইচ্ছে ছিল হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে। এদিকে হিন্দু মেয়েরা একবার এগোয় একবার পিছোয়—ফলে ইচ্ছেটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

খুব ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে সামাদ। সেও একটা শার্ট পরেই এসেছিল। তার দ্বিতীয় শার্ট আমরাই দিয়েছিলাম। আরও একজন বেশ কিছু পরে এসেছিলেন—এক বস্ত্রে, একটি শার্ট পরে, শুনতে পাই তিনিই নাকি নৌকোর মধ্যে স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করেন। তখন এ নিয়ে বামপন্থী দল যাঁরা স্পষ্টতই আওয়ামি লীগের সমালোচনা করতেন, তাঁরা খুব গর্ব বোধ করেন। কিন্তু পরে শুনেছি, এ অকাল ঘোষণার দ্বারা সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশী হয়েছিল। তবে তিনিও একটি ছিন্ন শার্ট পরে ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় শার্টটি সম্ভবত আমার কাছ থেকে কামাল নিয়ে গিয়েছিল, কিংবা অন্য কেউ। বোধ হয় আমার সব শার্টের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সম্মানিত, কারণ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্টের গাত্রলগ্ন হবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল—ইনিই জিয়াউর রহমান। শার্ট পরিবেশনের আমাদের বেশ খ্যাতি হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত আব্দারও হত। একদিন একজন বেঁটে মত ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুনলাম—তিনি বাংলার নাম করা অধ্যাপক। এখানে আমি একেবারে অন্তরঙ্গ দুই-একজন ছাড়া কারুর নাম করতে চাই না। ঘটনাগুলি ইন্টারেস্টিং. কিন্তু যাঁদের বিষয়ে তাঁদের ভাল নাও লাগতে পারে। নাম করব তাঁদেরই যাঁরা অতি কাছের মানুষ এবং যাঁদের অবজেকটিভ দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, যাঁরা দু-একটা ঠাট্টাবিদ্রূপ নিন্দা-মন্দ সয়ে নিতে পারবেন। ভদ্রলোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ পনের দিন এক বস্ত্রে আছি, কাপড় বদল করতে চাই। কিন্তু এখানে তো শুনছি শুধু শার্টই তৈরী হচ্ছে, আমার ধুতি-পাঞ্জাবী লাগবে।

আমার স্বামীর এবং এই মুসলমান অধ্যাপকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রায় একই ছিল। তাই ধুতি পাঞ্জাবী পাওয়া গেল, এই ধুতি পাঞ্জাবী পরবার ইচ্ছার মধ্যে আমি একটা ভয় দেখতে পেলাম, সেটা সত্যি না অনুমান জানি না, যে এদেশে থাকতে গেলে হিন্দু পোশাকে থাকলে সুবিধে হয়।

নাম করা কোন অধ্যাপক বা পরিচিত কোন বন্ধু আসছে শুনলে, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতাম তাঁদের জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ব্যবস্থা করতে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম—বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষরা অদ্ভুতরকম বিলাসী। এরা কথায় কথায় বিলেত যাচ্ছে, প্রত্যেকের বিলাতী গাড়ি আছে,

এসব তো আমাদের কল্পনার বাইরে। সাধারণ কলেজের অধ্যাপক, তিনিও সস্ত্রীক কয়েকবার বিলেত ঘুরে এসেছেন। এমনটা কি করে সম্ভব তা ঠিক বুঝতে পারতাম না।। একদিন কামাল, যাকে আমি কমল বলেই ডাকতাম, আমায় বললে, সেদিন আপনাদের এস.পি.র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অত বড় চাকরী করেন ভদ্রলোক, বাড়িতে একটা কার্পেট পর্যন্ত নেই, কয়েকটি বেতের চেয়ার, সোফাও নেই। আমাদের দেশে এই পোস্টের মানুষের বাড়িতে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট আঁটা। গদি দেওয়া সোফার ছড়াছড়ি। এ দেশে এমন হল কেন? এরা কি সব গান্ধীবাদী? আমি তো তখনও আধুনিক বাংলাদেশ দেখিনি। আমাদের সেই ছায়া-সুনিবিড় পূর্ববঙ্গ, সুজলা সুফলা, উঁচু ভিটা চার চালা খড়ের ঘর, বাঁশবন, খালবিল সেখানকার তো এই সব চিত্রই মনে পড়ে। সেখানে কবে যে এমন চেয়ার, টেবিল, সোফা কৌচের রাজত্ব হল কে জানে? এত সাহেবিয়ানা বেড়ে উঠল কেন? আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। এদিকে বাংলা ভাষা নিয়ে যতই উত্তেজনা হোক, শুদ্ধ বাংলায় খুব কম লোকই পারবেন কথা বলতে। সংস্কৃতের ভিত্তি একেবারেই নেই বলে ভাষা যথেষ্ট সংস্কৃত বা মার্জিত নয়। কিন্তু বিলেতিয়ানা খুব বেশী, এটা আমার লক্ষ্য হচ্ছিল। কমলের প্রশ্নে একটু হোঁচট খেলাম। বিলাতিয়ানার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের সব ঠিকমত মেলাতে পারছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কমল কোন্‌টা তোমার ভাল লাগে? কমল একটুও না ভেবে বললে, আপনাদেরটাই ঠিক, আপনাদেরটাই সুন্দর, আমাদেরটা মেকি।

বিলাসিতায় অভ্যস্ত বলেই, যাঁরা আসতেন তাঁদের ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেক সময় মুস্কিলে পড়তে হত। এমনও হয়েছে বহু কষ্টে ফ্ল্যাট যোগাড় করেছি, দু-তিনখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম সবই আছে। কিন্তু সস্ত্রীক শরণার্থী অধ্যাপক নাক তুলে বললেন, বড় আলো কম। ফলে আমাদের সাতদিনের ঘোরাঘুরি নিষ্ফল হল। একবার এক বিখ্যাত ব্যক্তির জামাতা আসবেন বলে সোরগোল পড়ে গেল। আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে সাজিয়ে গুছিয়ে বসে আছি এমন সময় তিনি বললেন, এ ঘর তাঁর চলবে না। অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম নেই। পরের দেশে এসে বিপ্লব করতে গিয়ে খাওয়া শোওয়া নিয়ে এত খুঁত-খুঁতানি দেখে আমার রাগ হত। বাংলাদেশের অনেক ছেলেরাও রাগ করত, এইসব বাবুয়ানী দেখে। কিন্তু এখন একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে, যাতে বুঝতে পারছি এই রকম ব্যবহার এঁদেরই একচেটিয়া নয়। সেই গল্পটা বলছি। ১৯৭৪ সালে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম,

তাঁরা রেফিউজীদের নিয়ে কাজ করেন। ইংরেজের বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে এখনও কত মানুষ তাঁদের সাহায্য চায়। ইংল্যাণ্ডে যত শরণার্থী, যত দেশ থেকে এসেছে, এত আর কোথাও থেকে গেছে কিনা সন্দেহ। সরকার যাঁদের সাহায্য করছে—তাছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও আছে। আমি যাঁদের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কর্ত্রী মিস পিয়ার্স নানা দেশের—বিশেষ করে তিব্বতী, ভিয়েতনামী প্রভৃতিদের নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁর কাছেও এই রকম গল্প শুনেছি।

লণ্ডনে গিয়ে পেঁাছলাম—হীথরোতে বেরিয়ে দেখি আমাকে নিতে কেউ আসেনি। পথঘাট কিছু চিনি না, এ বড়ো মুশকিল—অবশেষে একটি ভারতীয় মেয়ের সাহায্যে আমার একজন আত্মীয়ের বাড়ি উঠলাম। তাঁরা থাকেন চিংফোর্ডে, আর আমার গন্তব্য স্থান সারে। বাড়ি পেঁাছে ফোন করলাম। মিস পিয়ার্স কথা বললেন। তিনি বলতে লাগলেন একজন তিব্বতী ও একজন রুমানিয়ান শরণার্থীকে হীথরোতে পাঠানো হয়েছিল আমাকে আনবার জন্য, কিন্তু তারা বহুক্ষণ চেষ্টা করেও কোনো পাত্তা পায়নি। আমি বুঝতে পারলাম মাইকে তাদের মুখে আমার বিজাতীয় নামটা কি প্রকার শুনিয়ে থাকবে, যাতে আমি বুঝতেই পারিনি যে আমাকে ডাকা হচ্ছে। পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে একটি অল্পবয়সী সুন্দর ছেলে আমাকে নিতে এলো। সে রুমানিয়ান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার বাবা পালিয়ে এসেছিল। আর ফিরতে পারেনি বটে, তবে দেশে মন পড়ে আছে। সে-ই আমাকে নিতে গিয়েছিল। এখন যে গাড়িটা এনেছে সেটা একটা বিরাট ঢাকা লরি। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এতো বড়ো গাড়ি এনেছ কেন? আমার সম্বন্ধে কি শুনেছিলে ছোট গাড়িতে ধরবে না? সে হেসে বললে—না, এটাতে রেফিউজীদের ফার্নিচার নিয়ে যাচ্ছি। এম্পারার হেল সেলাসীর ফার্নিচার! শুনলাম, এম্পারারের আত্মীয়-স্বজন ইথিওপীয়া থেকে রেফিউজী হয়ে এসেছেন। এদেশের ফার্নিচারে তাঁদের সুবিধা হচ্ছে না, তাই এম্পায়ার তাঁদের জন্য ফার্নিচার পাঠিয়ে দিয়েছেন।...রেফিউজীদের এ হেন আবদারের কথা শুনে আমি তো স্তম্ভিত। মিস পিয়ার্স বললেন, কেন? চিলিয়ান রেফিউজীদের কথা শুনবে? তাঁদের খুঁতখুঁতানি আরও বেশী। কাটলারী সম্বন্ধে পছন্দ খুব কড়া। হাফ প্লেট ও কোয়ার্টার প্লেটের এবং সসার ও কাপের মিল না থাকলে খাবার রুচবে না।

এই সব অভিজ্ঞতার কথা ভাবলে অ্যাটাচড্ বাথের প্রসঙ্গটা আমার কাছে ততো অস্বাভাবিক মনে হয় না।

বেশীর ভাগ শিক্ষিত বাংলাদেশের পরিবার যাঁরা কলকাতা ও দিল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা জানতেন না যে সীমান্তে ব্যাপারটা ঠিক কি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আসার পথে ওঁরা কষ্ট পেয়েছিলেন কিন্তু এসে রাজার হালেই আছেন। প্রথমে এসে পেঁাছেছিলেন এম. এল. এ. রা। তাঁদের কিড স্ট্রিটে সরকারী অতিথিশালায় জায়গা করে দেওয়া হল। বহু আমলারা আসা-যাওয়া করছে। দেখলাম বাংলাদেশের রাজনীতির মানুষ যাঁরা, তাঁরা একেবারে চুপচাপ, চোখে শূন্য দৃষ্টি। সকলেই কেবল বলছে—মুজিবের খবর পাওয়া গেল না। আর একজনের কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের একজন অধ্যাপক। খুব সম্ভব হুসেন আলীর বিরাট গাড়িতে। স্যুটেড-বুটেড জমজমাট ভদ্রলোক এসে বসলেন। সেদিন আমার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে উমাশংকর যোশীর দেখা হবার কথা। উমাশংকর যোশী এলেন বিনয়নম্রভাবে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের পোশাকে। দুজনে যেন দুই মেরুর মানুষ। আমি সবিস্ময়ে দুজনের কথাবার্তা শুনছি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ভদ্রলোক সেখানে তাঁর নাম, খ্যাতি, সম্পদ ও সম্মান বিষয়ে আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন এবং কিভাবে তিনি স্বয়ং রিভলবার চালিয়ে পাকিস্তানীদের আক্রমণ থামিয়ে চলে এসেছেন সে গল্প সবিস্তারে বলে আমাদের মনোহরণ করলেন। আমি এবং শ্রীযুক্ত যোশী দুজনেই অভিভূত হয়ে পড়লাম। তবে আমার ভাবাবেগ একটু ঠোক্কর খেয়েছিল, যখন তিনি বললেন একটি মাত্র স্যুট পরে চলে এসেছেন, অথচ সেখানে ওয়াড্রোব বোঝাই তাঁর অনেক স্যুট ঝুলছে। আর তাঁর সাইডবোর্ড বোঝাই সিলভার কাটলারি। তখনকার অবস্থায় জিনিসপত্রের জন্য তাঁর এই শোক ভালো লাগেনি। তবে আজ সর্বত্রই মানুষের ঝোঁক পড়েছে জিনিসপত্রের দিকে—অর্থাৎ **Consumer goods**-এর দিকে। এদেশেই বা কি কম? কিন্তু একদিন যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করেছিল তারা বুঝেছিল জিনিসপত্র, পদমর্যাদা ইত্যাদি মূল্যবান নয়—মানুষই মূল্যবান। মানুষের কাজে নামলে তাই অনেকখানি ত্যাগ করতে হয়। তা না হলে স্যুট-বুটের ব্যবধান, অলঙ্কারের ব্যবধান মানুষে মানুষে যে দূরত্ব গড়ে তোলে তাতে আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন হবার নয়। এ বিষয়ে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি বটে, কিন্তু মনের তলায় তলায় সে চিন্তার প্রসার অস্বীকার করা যায় না। তারই বশীভূত হয়ে কখনও কখনও কে যেন মনের মধ্যে তর্জনী তুলে আমাদের ভর্ৎসনা করে এবং তখনই আমাদের মাথা নীচু

হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে চেষ্টা করেছিলেন জীবনের আয়োজনে অর্থমূল্য কমিয়ে তাকে সৌন্দর্যের মূল্যে মূল্যবান করতে। শ্রীনিকেতনের তৈরী মাটির পাত্র, মোটা কাপড়, তার নক্সার সৌন্দর্যে অমূল্য। শান্তি-নিকেতনের প্রতিটি জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই কথাই বোঝায় যে অর্থের চেয়ে সৌন্দর্য বড়ো। ওদিকে গান্ধীজীর আশ্রমে নিরাভরণ নিরলঙ্কার পরিচ্ছন্নতারও একটা দাম আছে। উপকরণের ভারে জীবনকে পীড়িত করা এঁদের অভিপ্রায় ছিল না। উপকরণের পিছনে ছোটার ফলে হিংসা-দ্বেষ, ছুরি, খুন এতখানি বেড়ে উঠেছে। পৌরাণিক কাল থেকে এই ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের বাণী—উপকরণ কমাও, এই প্রসঙ্গে যযাতির গল্পটি ভারতীয় ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক হাজার বছর পুত্রের যৌবন ভোগ করেও যযাতির তৃপ্তি হল না। তিনি বললেন, পৃথিবীতে যতো ধন, যতো শস্য, যতো সোনা, যতো পশু, যতো স্ত্রীলোক আছে তা একজনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কামনার কোন শেষ নেই। আগুনে ঘিয়ের মতো তা বেড়েই চলে। তাই একমাত্র পন্থা তৃষ্ণা ত্যাগ করা। মুসলমানদের মধ্যেও ফকির, দরবেশ, সুফী—এঁরা একথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও প্রতিদিনই এই ত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয়, ছোটখাটো বিষয় থেকে বড়ো পর্যন্ত। এই সব কথা আমাদের অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় সে সব ভাবকে দমিত করে লোকের জিহ্বা লক্‌লক্ করে বেড়াচ্ছে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের চেয়েও একটা সর্বব্যাপী বিষ সঞ্চারণ করছে এই লোভ এবং উপকরণের ক্ষুধা। বলতে গেলে এই নিউক্লিয়ার অস্ত্রও তো সেই লোভ থেকেই জন্ম নিয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে একটি কথা আছে। যজ্ঞে যদি মন্ত্রের ভুল হয় তবে কৃত্যা (দানব) আবির্ভূত হয়। আমাদের বিজ্ঞানের যজ্ঞে কোন্ মন্ত্রের ভুলে এই কৃত্যা জন্মেছে কে জানে।

যখন সারা পৃথিবীরই এক অবস্থা, তখন বিশেষ করে বাংলাদেশীদের কথা বললাম কেন? তার কারণ ঠিক ঐ সময় তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা খুব বেশী ছিল। যখন কারুর কোনো কাজ আমাদের মনঃপূত হয় তখন তার উপর গুণ আরোপ করতে করতে আর শেষ করতে পারি না। দোষের বেলাও তাই। এই আতিশয্যের জন্য অবশ্য অপর পক্ষ দায়ী নয়।

আবার সীমান্তের কথায় ফিরে যাই। দুটো সীমান্তে আমরা বিশেষ করে যেতাম। এক বেনাপোল, অন্য বয়রা। নদীয়াতেও পরে কাজ করতে গিয়েছি। বেনাপোলে বেশী কাজ ছিল না। বয়রার পথেই বড়ো বড়ো সব ক্যাম্প।

বাগদা, হেলেঞ্চা, মামা-ভাগ্নে ইত্যাদি। এই ক্যাম্পগুলি তৈরী করতেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে খেয়াল করে না, সেহেতু ক্যাম্পগুলি পূতিগন্ধময় হয়ে উঠতো। বেশ কিছু দূর থেকে ক্যাম্পের দুর্গন্ধ নাকে আসতো। ইতিমধ্যে কয়েকজন ছেলে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অরুণ সবচেয়ে আগ্রহী। আমরা মাঝেমাঝেই এস. ডি. ও. নস্কর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতাম। সেদিন হেলেঞ্চা ক্যাম্প তৈরী হচ্ছে। বাঁশের বেড়া, উপরে পলিথিন। আর পায়খানাগুলো রাস্তার দিকে। সেটা আমাদের মনঃপূত হল না। আমরা ভাবলাম এস. ডি. ও.-কে বলি স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে না। নস্কর সাহেব বেশ ভালো মানুষ। সরকারী বড়ো কর্তার উচ্চমন্যতা নেই। তিনি বললেন—বেশ তো। আপনারা কাল একটা প্ল্যান নিয়ে আসুন। পরের দিন আসতেই বাজারের মুখে দেখি প্রচণ্ড ভীড়। আমাদের জীপ দেখে সব ঘিরে ফেলল—চাল চাই, চাল দিন। গাড়িতে বেশী কেউ ছিল না। ভীড়ের মধ্যে নানা লোক। কে এদেশের কে ওদেশের বোঝা যায় না। সিল্কের গেরুয়া পরা কিছু আনন্দমার্গীদের দেখলাম। ভীড় আমি সহ্য করতে পারি না। 'চাল দাও', 'চাল দাও' চিৎকার, আর আমি শূন্য হাতে বসে আছি। গাড়ি চলছে না। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে ওয়ালি-উল-ইসলামকে দেখতে পেলাম। শান্ত ধীর ছেলেটিকে দেখে ভালো লাগলো। ভরসা পেলাম। বাংলাদেশের রথী-মহারথীদের মধ্যে ওয়ালিকেই সীমান্তে অনেকবার দেখেছি। ওয়ালি এসে আমার জীপের উপর দাঁড়িয়ে অনেক করে বুঝিয়ে দিল যে আমি সরকারের কেউ নই এবং আমার কাছে চাল নেই।

আমার জীপটা ঘুরিয়ে নস্কর সাহেবের অফিসের দিকে এলাম, আমাদের সঙ্গে স্যানিটারি ব্যবস্থার প্ল্যানটা ছিল। এসে দেখি অফিসেও লোকারণ্য। কোনো রকমে ভীড় ঠেলে পৌঁছতে শ্রীযুক্ত নস্কর বললেন—আজ আর কোনো পরিকল্পনা করা যাবে না মৈত্রেয়ী দেবী, আজ শুধু ভাবছি চাল। কোথা থেকে এখন চাল পাই? কাল যে ক্যাম্পে সতের হাজার লোক ছিল আজ সেখানে আরও বিশ হাজার লোক এসে ঢুকেছে। এখন এদের এক মুঠো ভাতের যোগাড় কি করে হবে তাই ভাবছি।

যারা ঢুকে আসছিল তারা যে শরণার্থী হয়ে কৃপাপ্রার্থী হয়ে নম্রভাবে আসছিল তা নয়। তারা যে কতো দূর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারতো সে কথা পরে বলব। সমস্ত বনগাঁতে মানুষ চলতে পারে না। কোনমতে জীপ চালিয়ে

আমরা বনগাঁ শহর পার হয়ে হেলেঞ্চা ক্যাম্পের দিকে এগোতে চেষ্টা করলাম। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল মে মাস। মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে। সুন্দর পীচঢালা পথ। সীমান্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে বলেই হয়তো এদিকের রাস্তা এত মসৃণ। সেই পথের দুধারে মানুষের বন্যা নেমে আসছে। যাঁরা এরকম Exodus দেখেননি তাঁরা এ ছবিটা দেখতে পাবেন না। দুধারে তিনজন তিনজন করে পাশাপাশি। আর মাথায় মাথায় মানুষের স্রোত। কারুর কোলে বাচ্চা, কারুর কাঁধে বৃদ্ধ পিতা কিম্বা ঠাকুরদা, ব্যস্ত-সমস্ত ন্যুব্জ-দেহ বৃদ্ধা—মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে—একটা মুরগী, দুটো হাঁস কিম্বা কোলে ছাগলছানা। এই সব সামান্য সামান্য সম্পত্তি নিয়ে হাজার হাজার মানুষ দৌড়োচ্ছে—দৌড়ে আসছে প্রখর রৌদ্রে, অনাহারে তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে। দুশ্চিন্তাকাতর মানুষ তার এতটুকু অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, শিশুকে বুকে নিয়ে কি অপরাজেয় জীবনতৃষ্ণায় ছুটে আসছে আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের কি গৌরব—যদি এদের ক্লান্তি ও দুঃখ একটু দূর করতে পারি : বোধ হয় সব স্বেচ্ছাসেবীর মনের এই ভাবনা। কপোতাক্ষ নদী পার হয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে এই যারা এসে পৌঁছচ্ছে এদের জন্য সেই রাত্রেই ক্যাম্প বাঁধা শুরু হয়ে যাবে। কত দ্রুত কাজ হতে পারে এই সময় তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। যদি অন্য সময় এই উপমহাদেশের মানুষ এর সিকিভাগও কাজ করত তবে আজ দেশ তৈরী হয়ে যেত। সেদিনের দৃশ্যটা এত গভীর দাগ কেটে গেছে আমার মনে যে এক-একটা মুখ যেন চির-পরিচিতের মতো মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেদিন ফেরার পথে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা আমি অন্যত্র গল্প করে লিখেছি তা এখানে তুলে দিলাম ঃ

৬

দীর্ঘ জীবনে অনেক দৃশ্যই চোখে পড়ে, দু-একটা স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গিয়ে সারা জীবন ধরে নানা কথা বলে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় তারা বারবার ফিরে এসে পথ দেখায়। যখনই মৃত্যুশোকে কাউকে কাতর দেখি একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। সেদিন বাংলাদেশ থেকে বন্যার মতো শরণার্থী ঢুকেছিল কপোতাক্ষ নদী পার হয়ে। দলে দলে দিকভ্রান্ত নরনারী পোঁটলাপুঁটলি মাথায়, কাঁখে ছেলেপিলে, কাঁধে বৃদ্ধ ঠাকুরদা, বগলে হাঁস মুরগী প্রভৃতি নানা বস্তুতে ভারাক্রান্ত হয়েও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিল ভারতভূমিতে। ঐ বিশেষ দিনটিতে

একটি পথ দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিশ হাজার মানুষ ঢুকে পড়েছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই তারা কোনো না কোনো শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, আমরা ফিরছি একটা দ্রুতগামী জীপে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও দু-একজন সরকারী কর্মচারী। পথের ধারে দু মাইল তিন মাইল অন্তর অন্তর শিবির খোলা হয়েছে, দলে দলে যূথবদ্ধ নরনারী সেখানে এসে উপস্থিত হলে আশ্রয় পাচ্ছে, খাদ্য পাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকদের দল নানা কাজে নিযুক্ত হয়েছে। আমরাও স্বেচ্ছা-সেবক। জীপটা চলেছে দ্রুতগমনে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, রাস্তাও প্রায় জনহীন। কিছুক্ষণ আগেই যে এই পথ এত লোকের পায়ে মর্দিত হয়েছে, এত কোলাহল উঠেছে, এখন তার চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে গাছের ভিতর অন্ধকার ঘন হয়ে জমে উঠেছে।

এমন সময় মনে হল, পথের ধারে একটা বড়ো গাছের নিচে যেন সাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি পড়ে আছে। জীপ এগিয়ে আসতে আসতে পুঁটলিটা একটা মানুষের আকৃতি হয়ে উঠলো এবং সেটি একটি মেয়ের। জীপ থামালাম আমরা। এই নির্জন পথে কে বসে আছে দেখা দরকার। কাছে এগিয়ে দেখি একটি অল্প বয়সের মেয়ে উবুড় হয়ে কাঁদছে। আমাদের ভীড় দেখেও বা অনু-মান করেও সে মুখ তুললো না। আমাদের মনে হল হয়তো তার আপনজন কেউ নিহত হয়েছে। এরকম ঘটনা তো তখন হামেশা ঘটছে। কিন্তু ঐ রকম অবস্থায় একটি অল্প বয়সের মেয়েকে নির্জন পথে একলা ফেলে চলে যাওয়া যায় না। আমরা স্থির করলাম জীপে তুলে তাকে নিকটবর্তী শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দেব। বহু অনুনয়ের পরে সে মুখ খুলল। সে মুখে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে। তার ফোলা ফোলা চোখের নিচে গভীর কালি। সে বললে—আপ-নাদের সঙ্গে যাব, কিন্তু আপনারা কি ওপারে আমাকে পৌঁছে দিতে পারবেন?

অদ্ভুত ইচ্ছা!

পাকিস্তানে? সেখান থেকেই তো এলেন! এলেন কেন তবে? রশিদের গলায় ঈষৎ উষ্মা।

তপনবাবু বললেন—আঃ, শোনাই যাক না।

মেয়েটি পাগলের মতো রাস্তায় এসে পড়ল। হয় আমাকে গাড়ির তলায় চাপিয়া মারিয়া ফেলান নয় আমারে ফুলতলায় পাঠাইয়া দ্যান। বহু অনুনয়েও তাকে গাড়িতে ওঠানো যাচ্ছে না। আমি তো নিশ্চয় বুঝেছি এখানে ওকে ছেড়ে গেলে ও এখনই ওর শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে তার

আশ্রয়দাতা গাছটির ডালে ঝুলে পড়ে এখানেই সদ্গতি লাভ করবে। সকলেরই বাড়ি যাবার তাড়া। কিন্তু ঐ উদ্‌ভ্রান্ত শোকের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। তার এক কথা। সে পাকিস্তানে ফিরে যাবে। অবশেষে বলা গেল—আচ্ছা, তাই হবে। আপনাকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানে ঢোকা তো আমাদের কর্ম নয়—আমরা আপনাকে শিবিরে নিয়ে যাব। সেখান থেকে গভর্ণমেণ্টের লোকেরা নিশ্চয় আপনার কথা শুনে আপনাকে পৌঁছে দেবে।

শরণার্থী শিবিরে যাবার পথে রহস্য বোঝা গেল। পাকিস্তানে ফিরে যাবার আশায় সে একটি মর্মান্তিক কাহিনী বললে।

গ্রামের কাছে ক্ষেতে কাজ করছিল একদল লোক। সেও এসেছিল তদারকি করতে। এমন সময় আকাশ থেকে বাজের মতো নিচু হয়ে নেমে এলো প্লেন আর তার থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগলো—ছর্‌র্‌র্… । বৃষ্টির মতো গুলি দেখে সেও ছিট্‌কে পড়ল আর অন্য লোকেরা দৌড়তে লাগলো ঊর্ধ্ব-শ্বাসে—যে যেদিকে পারে দৌড়োচ্ছে। কোন্ দিকে লোক ছুটছে, কেন ছুটছে, জানে না। পোড়া প্রাণের মায়ায় কোথায় যায় তাও খেয়াল করেনি। ঝোপ জঙ্গল মাড়িয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও দৌড়ে এসে, দলে দলে মানুষ জলে ঝাঁপ দিয়ে, সাঁতার দিয়ে এপারে এসে উঠেছে। সুশীলাও তাদের সঙ্গে ছুটে এসেছে। মনে তখন এক চিন্তা, কি করে বাঁচি; কিম্বা কোনো চিন্তাই নেই—ছুটেছে শূন্য মনে, আতংকগ্রস্ত ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। এপারে এসে যখন সবাই নিশ্চিন্ত, তখনই সুশীলার মনে পড়েছে সেই নিদারুণ কথাটা। একলা ঘরে সে কয়েক মাসের শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে। ঘরে শিকল তোলা। আর কিছু ভাবতে পারে না সুশীলা। পথও তার জানা নেই। পথের দিকে সে তাকায়ওনি। শুধুই ছুটেছে। এখন বুঝতে পারছে মা হয়ে সে সন্তানকে মরণের মুখে দিয়ে এসেছে আর সেটা করেছে নিজের প্রাণের মায়ায়। এখনও এক রাত্রি পার হয়নি, এখনও ফিরে যাওয়া যায়—গেলে হয়তো সে ছোট্ট প্রাণটা বাঁচে। কোনো কি দয়ালু নেই যে সুশীলাকে বাচ্চাটার কাছে ফিরে যাবার পথ করে দেয়? তা না হলে ওর বেঁচে কোনো লাভ নেই—যে প্রাণের জন্য এত বড়ো পাপ সে করেছে সে প্রাণ ও রাখবে না, রাখতে পারবে না। তার আর্ত চিৎকার অন্ধকার আকাশে দ্রুতগামী জীপ থেকে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে। আমরা ওকে জোর করে চেপে বসে আছি।

শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে সুশীলা অনুমান করতে পারলো এখানে আশ্রয় মিলবে, খাদ্য মিলবে কিন্তু কোনো সশস্ত্র বাহিনী তাকে ওপারে পৌঁছে দেবে না বা কোনো পথপ্রদর্শক তাকে সেই পরম কাম্য ঘরের ছায়ায় নিয়ে যেতে রাজী হবে না।

যখন আমরা চলে আসি সেই দৃশ্যটি মনে পড়ে।

আলুলায়িত চুলে সুশীলা ছুটে আসছে জীপের তলায় পড়বে বলে। হঠাৎ আমাদের হেডলাইট ছুটো জ্বলে উঠে ওর চোখের উপর পড়ল। সে চোখের করাল দৃষ্টি যেন মৃত্যুর প্রত্যক্ষ রূপ—মনে হল মৃত্যুকেই দেখলাম, জীবন্ত মানুষকে নয়।

দীর্ঘ পথ আমরা ফিরে এলাম নীরবে, আমি ভাবতে লাগলাম—ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কোনো একটা সুযোগে আত্মহত্যা করে ফেলবে। আর বাঁচিয়েই বা কি হবে? ওকি কোনো দিন সুস্থ জীবন ফিরে পাবে?

তারপর নানা কাজে ব্যস্ত দিনগুলি গড়িয়ে চলল। সুশীলাদের কথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভুলে গেলাম। ঠিক ছাব্বিশ দিন পরে ঐ পথ দিয়েই চলেছি —শরণার্থীর ভীড় আরও বেড়েছে। বিশেষ করে শিবিরের চৌহদ্দিতে ঠেলা-ঠেলি করে এগোতে হয়। এমনি একটা জায়গায় গাড়ি বিগড়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল অল্পবয়সী ছুটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। কোনো সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে একটি সেই সুশীলা। আজ তার চুল বাঁধা পড়েছে পরিপাটি একটি খোঁপায়। ঠোঁট ছুটি পান রসে সিক্ত, হাসতে হাসতে সে পার্শ্ববর্তিনী সখীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছে। ছুজনের হাতেই র‍্যাশন কার্ড ও চটের থলি। বুঝলাম তণ্ডুল আহরণে চলেছে, জীবনধারণের জন্য যা অপরিহার্য। সুশীলা আমাদের খুব কাছ ঘেঁষে গেল কিন্তু আমাদের চিনতে পারলো না। ফিরেও তাকালো না।

মৃত্যুর হাত থেকে জীবন তাকে কেড়ে নিয়েছে। তবে কি মৃত্যু নেই? তাহলে সেদিন ওর চোখে কাকে দেখেছিলাম? নিঃসন্দেহে মৃত্যুকে। সে মৃত্যু আজ মরে গেছে। মৃত্যু যে বারবার নিজেকেই মারে, জীবনকে মারতে পারে না।

বাংলাদেশ থেকে যারা পালিয়ে আসছিল তাদের মধ্যে ভয় এক অন্ধকার রাজ্যে রাজা হয়ে বসেছিল, যারা শহরে যারা গ্রামে যারা ক্যাম্পে কেউই ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত না এবং এই ভয়ই তাদের অন্যের প্রতি নৃশংস করে তুলতো। সেজন্য প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্পের মধ্যে একটা না একটা হুজুগ লেগে থাকতো। এদিকে কলকাতায়ও ক্রমেই জনসমাগম হচ্ছে।

সেটা হয়তো জুন মাসের প্রথম দিকে। আমরা ভাবছিলাম বিভিন্ন ক্যাম্পে স্কুল খুলব, এখনও আমরা গাড়ি ছাড়া সরকারী সাহায্য কিছু পাইনি। মিশনারীরা কিছু কিছু দিচ্ছেন। আমি স্কুল করব শুনে জন হেস্টিংস্ আমাকে পাঁচশো শ্লেট দিয়ে গেলেন। প্রতি ক্যাম্পে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ ভাবে মাঠে মাঠে পথে পথে ধূলোয় কাদায় উদ্দাম হয়ে ঘুরছে। এদের একটা জায়গায় একত্র করে কোণে কোণে ব্লাকবোর্ড রেখে একটু পড়ানো বা শান্ত করে রাখা এই ছিল সে স্কুলের অর্থ। আর শিবিরে শিবিরে মহিলাদের মধ্যে সেলাই-এর চর্চা করে একটু মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনা, সামান্য পড়াশোনা করানো। বাংলাদেশের মেয়েরা সে সময়ে ভালো ভালো কাঁথা সেলাই করেছিল। ঐরকম জমাট বুনুনি কাঁথা এদেশে এখন আর হয় না।

বাংলাদেশের কাজে মিশনারীদের দান অনস্বীকার্য। জন হেস্টিংস্ খুব ছুটোছুটি করছিলেন। হঠাৎ শুনলাম তাঁর সময় শেষ হয়েছে, তিনি দেশে ফিরে যাবেন। এদেশে প্রায় তেইশ বছর ছিলেন। সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রালে সুন্দর শোভাসজ্জার মধ্যে তাঁর বিদায় সম্বর্ধনা হল। পুরোহিতের মঞ্চ থেকে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার কাহিনী বলছিলেন। সকলের চোখ অশ্রুপূর্ণ —কথা যখন শেষ হয়ে আসছে তখন হঠাৎ বললেন—এমন সময় আমায় একজন মহিলা বলেছিলেন আমি কয়েকটি স্কুল করব এই শিবিরে শিবিরে, আর তখনই আমি ঈশ্বরের করুণাময় মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। —জন আমার নাম করেননি—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁর ভাষণ বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এই কথাটি শোনামাত্র আমার শরীর-মন কম্পিত হল। আমি অভাবনীয়ভাবে পুরস্কৃত বোধ করলাম। সভা শেষে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, একজন বাঙালী পাদ্রী এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁকে আমি আগেও দেখেছি কিন্তু সেদিন যেন নূতন করে পরিচয় হল। তারপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বয়সে আমার সন্তানতুল্য হলেও তাঁকে বন্ধু, সুহৃদ ও সহায়রূপে পেয়েছিলাম। বলতে কি আমি যে আজ খেলাঘর শিশুনিবাস গড়ে তুলতে পেরেছি সেও তাঁরই জন্য।

কর্নেল লুথরা ইতিমধ্যে বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে ডেকে পাঠালেন। কে কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য। তিনি আমাকে বললেন—আপনারা অনেক কষ্ট করছেন। কিন্তু নানা ক্যাম্পে দৌড়োদৌড়ি না করে নিজেরা একটা ক্যাম্প করুন অনাথ ও স্থানচ্যুত ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের জন্য এই রকমই নির্দেশ

পাঠিয়েছেন—যাতে অনাথ শিশুরা ঠিকমতো শুশ্রুষা ও আশ্রয় পায়। কথাটা আমার খুব ভালো লাগলো। কোথায় ক্যাম্প করা যায় ভাবছি এমন সময় গৌরী আমাকে বললেন কল্যাণীতে তিনি প্রফেসর আরতি সেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐ পথে বিরাট ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে একটি ক্রীশ্চান গ্রুপের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়েছে যারা ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। তাদের সঙ্গে কাজ করার সুবিধা আছে। কল্যাণীতে আরতি সেনের বাড়ি আছে। সেখান থেকে কাজ করা যায়।

কল্যাণীতে গিয়ে দেখি বিরাট ক্যাম্প। প্রায় লক্ষ লোক বাস করছে। আধ মাইল দূর থেকে তুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আমি ঠিক করলাম আমাদের ক্যাম্প একেবারে দূরে অন্য এলাকায় করব। ক্যাম্পটা যেন দেখবার মতো হয়। কল্যাণীতে পিকনিক গার্ডেনের পাশে **P. & T.**র অনেক জমি ছিল। সে সমতল মাঠটাই আমাদের পছন্দ হল। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ দিকে সব স্থির হওয়া সত্ত্বেও জুলাই মাস পর্যন্ত ক্যাম্প বাঁধা হয়ে উঠছিল না। একটি অনাথ-আশ্রম করব মনস্থ করেও ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাজের বিরাম ছিল না আমাদের। নানা কারণে ক্যাম্পে যেতে হত। অনাথ শিশুদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি তারা কারুর না কারুর খপ্পরে পড়েছে। প্রতি শিশুর র‍্যাশন কার্ড আছে। তাছাড়া আছে তুধ ও দৈনিক আড়াই টাকা করে বরাদ্দ। আরও নানা জিনিসপত্র তো আছেই, সে জন্য অনাথ শিশুদের কেউ ছাড়বে না। ওদের আধপেটা খাইয়ে বাকি অর্থে নিজেরা পুষ্ট হবে।

এত দিন বড়ো বড়ো ক্যাম্পে অনেক চোরাগলির নিশানা আমরা পেয়েছি। বনগাঁর দিকের পাঁচ ছটি ক্যাম্পের প্রত্যেকটিতে পাঁচ ছটি করে ভলান্টিয়ার আমরা নিযুক্ত করেছি। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের ছেলেরাও কাজ করছে, আমরা কেবলই চেষ্টা করি ক্যাম্পের ছেলেদের দিয়েই ক্যাম্পের কাজ করাতে। আগেই বলেছি আর একটি চেষ্টার কথা। বাংলাদেশের নামী লোক-দের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া। আমি খুব একটা সফল হইনি।

অবশেষে একদিন মিঃ মোমিন (মন্ত্রী) ও কামরুল হাসান (শিল্পী)— এই তুজনকে নিয়ে আমরা একটি বড়ো ক্যাম্পে ঢুকলাম। বেশ কিছুদিন থেকে যাকে দেখছি তাকেই বলছি ক্যাম্পে চলুন। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়ে এসে পড়েছে এরা ভুলে যাচ্ছে কেন এসেছে। বসে খাওয়ার সুখ, পরের দ্রব্যে লোভ করার বদগুণ—এ সবই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। এমন কি নিজেদের ক্যাম্পের হাতা তারা ঝাঁট দেবে না, পায়খানায় তু' বালতি

জল ঢালবে না। এ মানুষদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদের চৈতন্য সজাগ রাখার কাজ শিক্ষিত মানুষদের। কিন্তু এ কাজে যাঁরা এগিয়ে আসবেন বলে ভেবেছিলাম অর্থাৎ যাঁদের লেখা 'নবজাতকে' ছাপাতাম, যাঁদের উচ্চ আদর্শের সত্যতায় বিশ্বাস করে আমি এতখানি উদ্বুদ্ধ, যে পরিশ্রমের কাজে একান্ত অনীহা সত্ত্বেও রোদে জলে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়াচ্ছি তাঁদের সঙ্গে পেলাম না। তাঁরা খবরের কাগজের অফিসে অফিসে বা ইণ্টেলেকচুয়ালদের ড্রইং রুমে যুদ্ধবিবরণ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্খতা বা সদাশয়তা ইত্যাদি বিষয়ে তর্কালাপ করে কালক্ষেপ করতেন। এই কারণে আমার কয়েকটি পেনফ্রেণ্ডের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল। যাহোক সেদিন সম্ভবতঃ কোনো একটা পরবের দিন ছিল। আমি, কামরুল হাসান, মিঃ মোমিন ও আরও কয়েকজন একটা ক্যাম্পে ঢুকলাম। মনে হয় সেটা হেলেঞ্চা ক্যাম্প। কলেরার আক্রমণ হয়েছে। কি কি করা হচ্ছে সে সব দেখে ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের অফিসে ঢুকে দেখছি নানা জিনিস এসে ক্যাম্পে পেঁছচ্ছে। বিদেশ থেকে কতো সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় এসেছে। দেশবিদেশের দাক্ষিণ্য অবারিত ঝরে পড়ছে। এই সব আলোচনা করছি এমন সময় এক বিকট চিৎকার।—'বাঁচাও, বাঁচাও'। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি একটা বিরাট মনুষ্যশরীর কিন্তু মহিষের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কাদাজল থেকে উঠে আসা মোষ যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমনই কাদামাখা বিরাট লোকটা দৌড়োচ্ছে আর তার মাথা থেকে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত ও কাদায় মাখামাখি সেই মানুষটার চিৎকার শুনে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না তাকে বাঁচাতে। এক বিরাট জনতা ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার পিছন পিছন ছুটছে, যেন কুকুর মারছে।

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। এইমাত্র যারা এতখানি অত্যাচারিত হয়ে ব্যাধতাড়িত জন্তুর মতো অন্য দেশে এসে ঢুকেছে তারাই আর একজনকে এরকম কুকুরমারা করতে উদ্যত! দুঃখ কি মানুষকে কিছুই শেখায় না? কি করে মানুষটাকে বাঁচানো যায় ভেবে আমরাও চিৎকার করছি—'থামো থামো!' ওদিকে উন্মত্ত জনতা চিৎকার করছে—'স্পাই, স্পাই।' লোকটা এসে কামরুল হাসান সাহেবের পায়ের কাছে পড়ল। 'বাঁচান আমায়।' কিন্তু 'গণরোষ' পদার্থটি তো সোজা নয়। জানি না কোথা থেকে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের মধ্যে এরকম হিংস্রতা জেগে ওঠে, অপরাধী বা নিরপরাধী বিচার না করে একটা নিরস্ত্র ভীত মানুষকে নখী-দন্তীর মতো ছিঁড়ে খেতে চায়। আমি ভাবছি এখনই আমাদের চোখের সামনে লোকটা মারা পড়বে।

অন্য কোনো উপায় না পেয়ে অফিস ঘরে একটি মাইক ছিল আমি সেটির সামনে গিয়ে বললাম—'যারা মারতে এসেছে তারা যদি এখনই না থামে তাহলে এই ক্যাম্পে এ সপ্তাহের র‍্যাশন বন্ধ হয়ে যাবে।' এ কথা বলবার আমার কোনোই অধিকার ছিল না। কিন্তু সেই মুহূর্তে এই ছলনার আশ্রয় নিয়ে মেঘদূতের যক্ষের মতো স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে গেলাম। কথাটা কিন্তু মন্ত্রের মতো কাজ করল। জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মোলায়েম স্বরে দু-একজন বলল—'ও ব্যাটা স্পাই, পাকিস্তানের চর।'

জানলে কি করে?

ওর তো এ ক্যাম্পে ঘর নেই। ও এখানে ঘোরাফেরা করবে কেন?

সে বেচারা বার বার বলছে সে আজই এসে পৌঁছেছে। তার গায়ে কপোতাক্ষের কাদাজলের কাদাই তো প্রমাণ। সে শুনেছে হেলেঞ্চা গ্রামে তার চেনা লোকজন এসেছে। তাদেরই খোঁজ করছিল। দু-একজনের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতেই এই কাণ্ড।

ইতিমধ্যে আমাদের ভলান্টিয়াররা ওর মাথার ক্ষত ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করে স্নান করিয়ে একটা শার্ট পরিয়ে দিয়ে সামনের পুলিস স্টেশনে নিয়ে গেল। আমি তখন মিঃ মোমিনকে বললাম—দেখলেন তো এরা র‍্যাশন কার্ড ছাড়া কিছু বোঝে না? আপনারা কথা বলুন এদের সঙ্গে।' ওঁরা দুজনেই খুব সুন্দর দুটি বক্তৃতা দিলেন বাঙালী জাতীয়তা সম্বন্ধে। মনে করিয়ে দিলেন কেন তারা দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কি এবং সকলে সমবেত হয়ে কাজ করলে শীঘ্রই নিজের নিজের ভিটায় ফিরে যেতে পারবেন। তাঁরা আরও বললেন হিন্দু-মুসলমান যুবকেরা সকলে একত্র হয়ে মুক্তিফৌজে যোগ দিন, অযথা মারামারি করে বলবীর্য নষ্ট করবেন না। মুক্তিফৌজের উপরই আমাদের সব আশা-ভরসা। বক্তৃতা শেষ করে তাঁরা দুজনেই 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিলেন—'বলুন জয় বাংলা।'

ক্যাম্প কম্পিত করে হাজার হাজার কণ্ঠে একই শব্দ নিনাদিত হল—'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা।'

যেন সুন্দর এসে অসুন্দরকে ঢেকে দিল। যে বীভৎসতার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে ফুলের বাগান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কলকাতায় বাংলাদেশের কিছু গায়ক-গায়িকার সমাগম হয়েছে। এই সব শিল্পীরা প্রাণ ঢেলে গান গেয়ে একদিন বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। এঁদের গানগুলো আমাদের কানে ভূয়ো স্বাদেশিকতা

বলে মনে হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি এ দেশে কোনো স্বাদেশিকতার গান আজকাল আমার মনে আর কোনো প্রেরণা জাগাতো না। দেশ জুড়ে অনাচারের মাঝখানে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' বলে লাভ কি ? সেই সময় বাংলাদেশের গানগুলি যে সত্যের আস্বাদ দিয়েছিল তাতেই তো এতটা শক্তি পেয়েছিলাম আমরা।

একটু ধাক্কা খেলাম যখন একজন বিখ্যাত গায়িকার বিখ্যাত স্বামী কলকাতা আসবার পথে একটি বালিকাকে পছন্দ করলেন এবং কলকাতায় এসে তার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে গেলেন শরিয়তের আইনের সুযোগ নিয়ে। এটা খারাপ লেগেছিল তবে এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। যুদ্ধের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

এই সব গায়ক-গায়িকারা কলকাতায় বাংলাদেশের একটি গানের দল করেছিলেন। তারা ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে কয়েকবার গান শুনিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া মঞ্চে গান গেয়েও টাকা তুলেছেন। গানগুলি অনবদ্য হত। আমরা মোহিত হয়ে যেতাম ও বাংলাদেশের জন্য কাজের প্রেরণা পেতাম। গানের যে কতোবড়ো শক্তি তা যেন নতুন করে আবার বুঝতে পারছিলাম।

গান একটা জাতি গঠন করতে পারে। একটা রাষ্ট্রনীতি চুরমার করে দিতে পারে। শত্রুনিধন না করেও শত্রুতা নষ্ট করতে পারে। বহু পুরাতন সংস্কার তো ভাঙতে পারেই। শ্রীচৈতন্য গান গেয়েই মানুষের শৃঙ্খল মোচন করেছিলেন। পর্দা থেকে মুখ বার করে হতভাগ্য স্ত্রীলোকেরা জগতের আলো দেখতে পেয়েছিল। বিধবা চিতায় না পুড়ে নূতন জীবন শুরু করতে পেরেছিল। বাউলরা গান গেয়ে গেয়ে গানের তত্ত্বে ও জীবন সত্যে মিলিয়ে দিয়ে মানুষকে সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাইরে এনেছিল। এই সব কঠিন কাজ বক্তৃতা বা অস্ত্রচালনায় হতে পারতো না। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সে সুরের আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের প্রাণে মনে। তাই উদ্দীপনার যেন সীমা ছিল না।

এদিকে মুক্তিফৌজের কাজকর্ম দ্রুতবর্ধমান। ক্যাম্প থেকে ছেলেরা রেক্রুটেড হয়ে এক একটা সেক্টরে চলে যাচ্ছে। ওদের জুতো, জামা, টর্চ—বহু জিনিসের দরকার। দরকার শুকনো খাবারের। তখন অনেক বাড়িতেই চিড়ে মুড়ির মোয়া, নিমকি গজা ইত্যাদির প্যাকেট তৈরী হচ্ছিল। আর শার্ট কম্বল ইত্যাদি যোগাড় করতে হচ্ছিল নানা স্থান থেকে। জিনিসপত্র যোগাড়ের প্রধান জায়গা হচ্ছে ক্রীশ্চানদের ফিলানথ্রপিক প্রতিষ্ঠানগুলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্যাম্পে কাম্পে বহু জিনিস বিতরণ করছিল, আবার অন্য

সংস্থাদেরও দিচ্ছিল বিতরণ করবার জন্য। বিতরণ করাও একটা বড় কাজ। সদর স্ট্রিটের চার্চের বাড়িতে বারেবারেই এদের মিটিং হত। এইখানেই বাংলাদেশের রেডক্রশের জন্ম হয়। যে লোকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি সাদাসিধে ভালোমানুষ। পরে তাঁর হাত থেকে এই প্রতিষ্ঠান গিয়ে যে দুর্বৃত্তের হাতে পড়ল তিনি অনেক পরিমাণে মুজিবের মৃত্যুর কারণ।

বাংলাদেশ রেডক্রস যেদিন গঠিত হল সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যে সব বড়ো বড়ো সহায়ক সমিতিগুলি এই সভা ডেকেছিল তার মধ্যে ছিলেন সেণ্ট পলস ক্যাথেড্রালের ভীকার সুবীর বিশ্বাস। মেননাইট্‌স্ সেণ্ট্রাল কমিটির রাইমার, জন হেস্টিংস, ইণ্টারন্যাশনাল রেডক্রসের একজন বড়ো কর্তা, ক্রীশ্চান এইডের একজন প্রতিনিধি ইত্যাদি। রেডক্রস সংস্থা গঠনের নানা নিয়মকানুন আলোচিত হচ্ছিল। সারা দুনিয়ার তখন যে সহানুভূতি, তাতে অচিরে বাংলাদেশের রেডক্রস যে ফুলেফেঁপে উঠবে তাতে আর সন্দেহ রইল না। এই সভার নির্দিষ্ট কার্যক্রম শেষ হবার পর আমি বললাম—মুক্তিফৌজের জন্য জুতো, জামা, কম্বল এখন দরকার। পাওয়া যাবে কি?

পাদ্রীরা সমস্বরে বলে উঠলেন—না, না—ফৌজকে কোনো সাহায্য দেওয়া যাবে না। আমরা যুদ্ধে সাহায্য করব না। আমি ভাবছি যুদ্ধে আহত হয়ে এলে রেডক্রস সাহায্য করবে কিন্তু যাতে প্রাণ বাঁচতে পারে তা করবেনা, এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক করেছি কিন্তু একজনের একেবারে ধনুকভাঙা পণ। কিন্তু তার কারণও আছে। কারু-কারুর **Constituton**-এ আছে যে তারা যুদ্ধে কোনো সাহায্য করবে না। কেউ বা টাকা তোলার সময় কথা দিয়েছে যে পলিটিক্যাল কারণে এ টাকা ব্যয় হবে না। সে ক্ষেত্রে তারা মুক্তিফৌজকে সাহায্য করবে কি করে। এই সময়ে অর্থাৎ মে মাসের শেষাশেষি মুক্তিফৌজের ট্রেনিং জোর শুরু হয়েছে। তবে তাদের এক আফসোস 'ইণ্ডিয়া' তাদের ঠিকমতো সাহায্য করছে না। জামা জুতো অস্ত্রশস্ত্র কিছুই দিচ্ছে না। এঁদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা জিনিসপত্রের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। আমরা যথাসাধ্য যোগাড় করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু যাদের কাছে অর্থ ও অন্যান্য বস্তু প্রচুর তারা এদের দেবে না। একবার একটি খৃষ্টীয় সংস্থায় গিয়ে আমি বললাম—টাকা চাই, একটা ক্যাম্পের লোকদের জন্য জুতো দরকার।

—জুতো? জামা নয়, খাদ্য নয়,—জুতো?

—হ্যাঁ, জুতোই দরকার।

আসলে তখন বোধহয় পাট কাটা হয়ে গেছে। কিম্বা পাট লাগানোই হয়নি, আগের বছরের খোঁচাগুলো জেগে আছে। মাঠের মধ্য দিয়ে অ্যাকশনে যেতে গেলে পায়ে প্রচণ্ড খোঁচা লাগবে। তাই অন্ততঃ কেডস্ অপরিহার্য।

পাদ্রী বললেন—ঠিক আছে, তবে আমি টাকা দেব না। জুতো কিনে দেব। সাইজ কি?

প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেললাম—এই প্রমাণ সাইজ আর কি।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।

—একটা শরণার্থী শিবিরে সবাই এক বয়সের লোক? এক সাইজের পা?

লিখতে গিয়ে সময়ের এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। এটা সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকাল। একদিন অরুণ সেন, যার কথা আমি আগেই লিখেছি এবং যে ক্যাম্পেই পড়ে থাকতো সে আমাকে বললে—একটা বড়ো ক্যাম্প খোলা হবে। নূতন জায়-গায় এবং সেটা তাকেই দেখাশোনা করতে হবে। আমি বললুম,—সেটা নদীর ধারে হলে বেশ হয়।—তখন জানি না নদীর তীরে কি ভয়ানক পরিণতি দাঁড়াতে পারে। অরুণ বললে—দেওয়ারা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানটা পরিষ্কার, নদীর ধারে, প্রচুর জায়গা। আপনি দেখে আসুন।

আমি আর মঞ্জু জীপ নিয়ে সেই পথে চললাম। একটু এগোতেই দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হল। তারা বললে ওদিকে পাকিস্তান থেকে গুলি এসে পড়ছে। ওদিকে যাবেন না। তখন মাঝে মাঝেই এরকম কাণ্ড হচ্ছিল। ভীত নরনারী যখন বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতভূমিতে ঢুকছিল তখনই তাদের পিছন পিছন পাকিস্তানী সৈন্যও ঢুকে আসছিল। এবং এপারে এসেই তাদের গোলাগুলি বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা শুনছিলাম ভারতীয় সৈন্য ওপারে ঢোকেনি কখনও। তবে সে শোনা কথা। আমরা সঠিক খবর খুব কমই জানি। তা ছাড়া আমাদের দেশপ্রেম আমাদের ইচ্ছামতো ভাবতে বলে।

অরুণ আমায় বললে—হেলেঞ্চার কাছ থেকে বাঁ দিকে বেঁকলে ইছামতী নদীর ধারে দেওয়ারা বলে যে জায়গা আছে, সেখানে ক্যাম্প করলে ভালো হয়। আপনি গিয়ে দেখে আসুন। ক্যাম্প-সাইট দেখতে সেদিকে চলেছি, একজন সৈন্য এসে আমাদের জীপ আটকাল।—ওদিকে যাবেন না, গোলা-গুলি চলছে, ছিটকে এসে লাগতে পারে—।

—আমরা দেওয়ারা জায়গাটা খুঁজছি। সেটা এদিকে কি?

—হ্যাঁ, এদিকেই। তবে নিষেধ করছি, যাবেন না।

আমার গায়ে গুলি লাগলে তোমার কি ক্ষতি হবে?

তাকিয়ে দেখি আমার ড্রাইভার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। দেখলাম কেউই বিশেষ ভীত নয়। সৈন্যটি অবাক। আমরা জানতে চাইলাম এগিয়ে গেলে আরও সৈন্যের দেখা মিলবে কিনা। সে জানালো—সামনেই ছাউনি পড়েছে। গাড়ি একটু চলতেই একেবারে ঘাঁটির সামনে পড়লাম। দড়ি দিয়ে একটি বাঁশ নামিয়ে আমাদের পথ বন্ধ করে দিল। একজন সৈন্য এগিয়ে এলেন। এদিকে আর যাবেন না। পথ বিপজ্জনক।

—আমরা দেওয়ারা যাব।

—সে চলবে না। সেও তো এই পথেই।

—কিন্তু ওখানে একটা ক্যাম্প বাঁধতে হবে। শরণার্থীরা শীঘ্র এসে পড়বে।

—না, সে যে কারণেই হোক আপনাকে যেতে দিতে পারছি না। তবে যদি কিছু ভালো কাজ করতে ইচ্ছা হয় একটা কাজ করুন। আমাদের এখানে কোনো গাড়ি নেই। সকাল থেকে ক্রমাগত বনগাঁ হাসপাতালে আহতদের পাঠাচ্ছি। এখন দুটি সিরিয়াস কেস আছে। এদের যদি হাসপাতালে পৌঁছে দেন তাহলে অত্যন্ত উপকার হবে।

আমি রাজী হলাম। কিরকম আহত তখনও জানি না। লোকটাকে দুজন মানুষ বয়ে নিয়ে এলো। দেখলাম হাঁটুর কাছ থেকে পায়ের হাড়টা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু চামড়া দিয়ে জোড়া আছে। ক্ষতটাকে একটা কাপড়ের পাড় দিয়ে বেঁধেছে। এই অবস্থায় ওপার থেকে সম্ভবতঃ কারুর সাহায্যে নদী পার হয়ে এসেছে। আর একটি লোককে নিয়ে এলো। তার কাঁধে গুলি লেগেছে। তবে সেটা ততো সাংঘাতিক নয়। অতটা পথ চলেছি, কারুর কোনো কাতরোক্তি নেই। কেউ কোঁকাচ্ছে না, উঃ আঃ কিছুই নেই। যার পাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে কাত হয়ে পড়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি আবিল—এই পর্যন্ত। কয়েকবারই এরকম দেখলাম।

বনগাঁর হাসপাতালের অবস্থা সাংঘাতিক। কতো যে লোকের হাত পা কাটা হয়েছে। আর তাদের কি কোনো স্বস্তি আছে? সেই কাটার উপরে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। সে দুঃসহ দৃশ্য মনে আসছে, সেখানে আবার আর দুটি নিয়ে চললাম। পা ছিন্ন লোকটি পাটা যে শাড়ির পাড়টা দিয়ে বাঁধা ছিল সে পাড়টা আমাকে কাঁদাচ্ছিল। সুন্দর চওড়া পাড়। কতো বেদনা নিয়ে কতো অসহায় কোনো নারী তার সামান্য সম্বলটুকু দিয়ে এই অক্ষম যত্ন করেছে। জানি না এই মানুষ কোনোদিন সুস্থ হয়ে তার প্রিয়জনের কাছে

সেই স্নেহের পরিমণ্ডলে ফিরে যাবে কিনা। হে ঈশ্বর—যেন তাই হয়। একজন মানুষও যদি হৃত আনন্দ ফিরে পায় তবে আমার ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘোরা সার্থক হবে।

বনগাঁ হাসপাতালের সামনে এসে পোঁছলাম। সেখানে একটু ভীড় মনে হল। হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচার এলো। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। রোগীকে একটু দেখলেন। নিয়ে যাবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ওর পা কি কেটে ফেলতে হবে?

পা তো গেছেই, এখন প্রাণটা যদি···বলতে বলতে উনি এগিয়ে গেলেন।

নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখা আমার মতো গৃহস্থ নারীর পক্ষে অত্যন্তই অস্বস্তিজনক। এর প্রতিক্রিয়া যে কি তা তখন বুঝতে পারিনি। মানসিক আঘাত কিছু পেলাম বলে মনে হল না। আঘাতটা যেন সরাসরি একেবারে শরীরে লাগলো। স্ট্রেচারে করে ওকে তো নিয়ে গেল। এমন সময় কে যেন আমার জীপের কাছে এসে দাঁড়ালো।—কে সে? অরুণ সেন বলেই মনে হচ্ছে। কিম্বা হেলেঞ্চা ক্যাম্পের রতন। সে বললে—দিদি, খারাপ খবর আছে। আপনাদের দিলীপ মারা গেছে।

—দিলীপ? কোন্ দিলীপ? বয়রার দিলীপ?

—হ্যাঁ, বয়রার দিলীপ।

তারপর ঘটনা যা শুনলাম তা এই—দিলীপরা বেশ কিছুদিন আগে ওপার থেকে এসে এপারে অনেক জমি কিনে নিজেদের মনোমত বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছিল। তাদের বহু আত্মীয়স্বজন আছে। স্বাধীনতার পর থেকেই তো এই চলছে। ক্রমাগত দলে দলে মানুষ খেপে খেপে এসেছে এই ভারত-ভূমিতে। সর্বদাই যে দাঙ্গায় তাড়িত হয়ে এসেছে তা নয়। ওপারে জীবিকা সংস্থানের অসুবিধা, সাংস্কৃতিক জীবনের পার্থক্য, আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে হিন্দুরা হঠাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেল।

দিলীপরা সপরিবারে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে এখানে এসে বসবাস করে। সীমান্তের এত কাছে থাকা মানে—এক পা এদিকে এক পা ওদিকে। অনেকেরই এ অবস্থা দেখেছি। আসতেও পারে না, থাকতেও পারে না। যা হোক, সেই দুর্যোগের দিনে যখন বিশ-বাইশ হাজার লোক ঐ একফালি সীমান্ত দিয়ে ঢুকে এলো তাদের মধ্যে যারা দিলীপদের চিনত এরকম

অনেকেই এসেছিল। যতোদূর শুনেছি তাদের মধ্যে ওদের আত্মীয়ও ছিল। শত্রুতাড়িত হয়ে দাঙ্গার মনোবৃত্তি নিয়ে যারা ঢুকেছিল তারা দিলীপদের সুন্দর বাড়িঘর অধিকার করতে চাইছিল। দিলীপের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে ওদের তর্কাতর্কি চলছিল এমন সময় দিলীপ এসে বাবাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে ভীড়ের মধ্যে একজন একটা তীক্ষ্ণ শলা তার বুকে বিঁধিয়ে দেয়। শলাটা হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে চলে যায়। দিলীপের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। দিলীপের আহত পিতা তখন ঐ হাসপাতালে।

—দিদি, দিলীপের বাবাকে দেখতে যাবেন?

—না ভাই।

আমি আশী কিলোমিটার পথ ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম দিলীপের কথা। কি মিষ্টি স্বভাব, কি পরোপকারী—কেন তার এই অপঘাত মৃত্যু হল …যে সব কেনর উত্তর নেই যদি তারা বারবার কাউকে খোঁচায় তবে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়। আমার তো তাই হল। সেদিন এই দুটো ঘটনা একেবারে সরাসরি আমার শরীরকে আঘাত করেছিল। প্রায় সাতদিন আর বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারিনি।

কল্যাণীতে অনাথ-আশ্রম হবে নির্দিষ্ট হবার পরেও অনেক দেরি হতে লাগলো। তাই আমরা একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম। সেখানেই প্রথম ‘খেলাঘর’ আশ্রম খুললাম। কল্যাণীতে আরতি সেন ছিলেন। তাঁর সুন্দর বাড়িটি আমাদের খুব কাজে লাগতো, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে তিনি অনাথ বালকবালিকা সংগ্রহ করে এনে তাদের ধুয়ে মুছে পাঁচড়ায় ওষুধ লাগিয়ে আশ্রমবাসী করে তুলতেন। কাজটা বড়ো সোজা নয়। এই সময়ে আবু সয়ীদ আয়ুবের পূর্ব পাকিস্তানবাসী আত্মীয়েরা এসে পৌঁছলেন। ক্যাপ্টেন জামান তাঁর দুই কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে ওঁদের বাড়িতে উঠলেন। ক্যাপ্টেন জামান পাকিস্তান আর্মিতে ছিলেন। ওঁদের ছেলেটি বোধহয় তখনও দেশের বাইরে। দুটি মেয়ে চমৎকার গাইতে পারে ও নাচতে পারে। এসব বিষয়ে পুরাতনপন্থী মুসলমানদের বাধা আছে। কিন্তু এঁরা সে বাধা অতিক্রম করেছিলেন। যদিও এঁরা আগে উর্দুভাষী মুসলমান ছিলেন, এখন তাঁরা বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। অবশ্য উর্দুও বলেন। এবং এঁদের আত্মীয়স্বজন অধিকাংশই উর্দুভাষী। এতে বোঝা যায় কতো অল্প পার্থক্যের উপর নির্ভর করে এত বিতর্ক। কে উর্দুভাষী, কে বাংলাভাষী,—তা দিয়ে কি মানুষে-মানুষে কোনো পার্থক্য হতে পারে? অথচ এই ছোটো ছোটো পার্থক্যগুলোকে

অবলম্বন করেই রাজনীতির খেলা জমে ওঠে। সভ্যতা, সংস্কার, জীবন—সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন জামানের পত্নী সুলতানা ও তাঁর দুই কন্যা লায়লা ও লুব্‌না আমাদের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সুলতানার স্বামী মুক্তিফৌজে যোগ দিয়ে নানা ক্যাম্পে থাকতেন। তিনি একটু দূরের মানুষ। সুলতানা আমাদের আশ্রমে স্থায়ী কর্মী নিযুক্ত হলেন। তাঁরা কল্যাণীতে বাড়ি পেয়েছিলেন—তাই সুবিধা হল। আরও দুটি বাংলাদেশের মেয়ে আমাদের কাজে লাগলো। তাদের বাবা মিঃ উদ্দীন সিলেটের মানুষ এবং খুব ধনী। মেয়েরা,—বিশেষ করে বড়ো মেয়ে রেহানা খুব ভাল কর্মী। সে নিয়মিত আসতো এবং খুব যত্ন করে ছেলেমেয়েদের পড়াতো।

চট্টগ্রামের দুটি ছেলে আশিস চৌধুরী ও স্বপন চৌধুরী দুজনেই আর্টিস্ট। তার মধ্যে স্বপন আবার একাধারে শিল্পী ও গায়ক। চট্টগ্রামে চিরকাল হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ছিল। তা সত্ত্বেও আশিস খুব সন্দিহান যে তারা আর দেশে থাকতে পারবে কিনা। সে বলত—আপনারা যে সদ্ভাব দেখে এসেছিলেন তাতে চিড় খেয়েছে। হিন্দুরা আজকাল আর কোনো চাকরি-বাকরি পায় না। তাদের গুণের কোনো দাম নেই। আমিও অবশ্য শুনেছিলাম যে চট্টগ্রামে দু-একটি সাজানো দাঙ্গা হয়ে গেছে। আশ্চর্য এই যে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে। কারণ শুধু তো চোখই দেখে না দেখে আমাদের মন। সেই মনের পার্থক্য দিয়ে দর্শনীয় বস্তু পৃথক হয়ে যায়। আশিসের ভাই স্বপনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র নেই, সে বলত—কেন থাকা যাবে না? সকলেই তো আর অবিচার করে না। স্বপন পরে একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে বিয়েতে অনেক সমস্যা ওঠে। মেয়েটির মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই স্বপনকে মুসলমান হতে বলেন। সে তা হয়নি বটে, তবে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে একটা চালাকি করতে রাজী হয়েছিল। সেটা হচ্ছে—নিজেদের নাম সে লিখেছিল এস. চৌধুরী। অর্থাৎ বোঝা গেল না সে হিন্দু না মুসলমান। অতএব তার শ্বশুরের মুখ রক্ষা হল। হিন্দু নামের আঘাতে তা আর চুরমার হল না। এই ছেলেটিও আমাদের আশ্রমে বিনা পারিশ্রমিকে গান শেখাতো। বলতে গেলে তার জন্যেই 'খেলাঘরে'র সূচনা থেকেই অজ্ঞ মূর্খ নিম্নশ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বেজে উঠলো।

'খেলাঘরে'র অর্থনৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু ক্যাম্প বেঁধে

দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারের প্রতিভূদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বেশ সময় কেটে যাচ্ছে। অবশেষে অন্য ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে একটা প্রকাণ্ড লম্বা মাঠের মধ্যে আমাদের ক্যাম্প হল। বড়ো বড়ো চালাঘর, উপরে পলিথিন। জায়গাটা খুব সুন্দর, নির্জন, পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পলিথিনের বাড়িতে বাস করার বিপদটা অচিরেই বুঝতে পারলাম যেদিন ঝড় উঠলো। সেদিন সকালে অনেক লোক বেড়াতে এসেছিলেন। জাস্টিস মাসুদ এসেছেন, সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথেড্রালের সুবীর বিশ্বাস ক্রীশ্চান এইডের দুজন কর্তাব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন। সুবীরের আমাদের কাজ খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি তো প্রায়ই আসেন। প্রায়ই বিদেশী অতিথি নিয়ে আসছেন। আমাদের তো সাহায্য করছেনই।

সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত ক্যাম্প কাদা কাদা হয়ে গেল। ভয়ানক অবস্থা। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া দায়। প্রতি পদে পা পিছলে যাচ্ছে। ক্রীশ্চান এইডের বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি আমায় হাত বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যার্থে। সুবীর খুব রসিক ছিলেন। তিনি বললেন,— **No, no, once you let her hold your hand, she will never let it go.**

সেই দিন ক্রমে ক্রমে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল। সেই খোলা প্রান্তরে বড়ো বড়ো ঘরগুলির মাথা থেকে পলিথিনের কালো কাপড়গুলো পট্ পট্ করে ছিঁড়ে ঘূর্ণি বাতাসে পাক খেতে খেতে শূন্যে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। একটি মাত্র টালির ঘর ছিল। সেইখানে সবাই মিলে দৌড়োদৌড়ি করে জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে জিনিসপত্র জুটিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে জড়ো করতে লাগলাম। আমরা সবাই আপাদমস্তক ভিজে, বাচ্চাগুলিও ভিজে গিয়েছে। আমি সুলতানাদের বাড়ি গেলাম। সেখানে আমার স্বামী ও মাসুদ সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। মাসুদ সাহেবের স্ত্রীর কলকাতায় বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি থাকতে রাজী হলেন না। তাঁরা তিনজন কলকাতা রওনা হলেন। আমি রইলাম বাচ্চাদের সরাবার জন্য।

সেই তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওদের বার করাও মুশকিল। একখানা ছোট গাড়ি—তাও উলটে যাবার উপক্রম। কোনোরকমে যতোদূর মনে হয় পুলিস ক্যাম্প কিম্বা আর্মির কোয়ার্টারে পৌঁছলাম ও একখানি ভ্যান পাওয়া গেল। ভ্যানে করে ভীত ক্ষুধার্ত ভেজা চড়ুইএর মতো বাচ্চাগুলিকে গাদাগাদি করে আমাদের পুরোনো ভাড়া বাড়িটাতে নিয়ে গেলাম। ভাগ্যক্রমে সে

বাড়িটা তখনও ছাড়া হয়নি। সারা রাত ঝড়ের তাণ্ডব চলতে লাগলো। বড়ো বড়ো গাছ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গাছের ডাল চচ্চড় করে ভেঙে যাচ্ছে। আমি বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছি যারা কলকাতায় ফিরে গেল তাদের জন্য। এইরকম অবস্থায় তাদের যেতে দেওয়া কি আমার উচিত হয়েছে? একটা নিশ্চিত সর্বনাশের আশংকায় যখন বুকের ভিতরটা থরথর করছে তখন সুলতানার বৃদ্ধা পাচিকা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—নিজে যেতে পারলে না, দাদাকে পাঠালে কেন?

এই ভৎ'সনা ঐ বৃদ্ধার অন্তরের স্নেহ এমনভাবে আমার কাছে পৌঁছে দিল যা সেই বিষাদের মধ্যেও একটা সুন্দর অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছিল। তাই আজও সে কথাটা ভুলতে পারিনি।

পরদিন শরণার্থী-শিবির দেখে চোখে জল আসে। সমস্ত পলিথিন ছিন্ন-ভিন্ন। বেড়াগুলো চতুর্দিকে ভেঙে-চুরে ছড়ানো। কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র কোনোটা রাস্তায়, কোনোটা গাছের উপরে। যেন যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। কল্যাণী শরণার্থী শিবির খুব বড়ো। প্রায় লাখ খানেক লোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। নূতন করে আবার তাদের দুর্গতি ভোগ করতে হল। বারবার প্রকৃতির অত্যাচারে কুঠিরবাসীদের জীবন এইভাবেই বিপন্ন হয়। এই দৃশ্য দেখেও আমাদের করবার বিশেষ কিছু ছিল না। নিজেদের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হল।

মেরামতের কাজে সাহায্য করতে বিশপ্‌স্ কলেজের পঞ্চাশ-ষাটটি ছাত্র ভলান্টিয়ার হয়ে এলো। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যারা বাংলাদেশের কাজে হাত লাগায়নি। এরা কে কি করেছে সব খবর আমি জানি না। তাই লিখতে পারলাম না। আমি এইটুকু লক্ষ্য করেছি আমার চেনাজানা সকলেই অল্পবিস্তর কিছু না কিছু করছে। 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' দেশবিদেশে জয়-ধ্বনি উঠছে। এমন কোনো দেশ নেই যেখানে না জনসাধারণ সাহায্যের জন্য টাকা তুলছে। কেবল চীন নীরব।

চীনের বাসনা নয় যে ভারত পাকিস্তানকে টুকরো করে ফেলে। কিন্তু ভারত তো টুকরো করছে না, অসম জোড় আপনা থেকেই চিড় খেয়ে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া যে এক কোটি লোক দু-এক মাসের মধ্যে ভারতে ঢুকে এলো তাদের কি ভারত কোলে করে বসে থাকবে? বর্মা তো একটি লোককেও ঢুকতে দেয়নি। পাকিস্তান তো টুকরো হয়েই গেছে। ফাটল ধরা মাটির পাত্র যেমন টুকরো হবেই।

সে সময় স্বাধীন বাংলার বড়োই পক্ষপাতী হয়েছিলাম। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ জাগে। মনে হয় এভাবে কোনো সামান্য ঐক্য নিয়ে বড়ো ঐক্যকে কি খণ্ডিত করা ভালো? যেমন ধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষ ভাগ হল তাতে কার কি লাভ হয়েছে? কতোগুলি বেশী মন্ত্রী হওয়ায় সে ব্যক্তিগুলির লাভ ছাড়া সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয়নি।

পৃথিবীর অনেক মহৎ মানুষ যখন একদিকে এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে তখন আর এক দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরোয়া যুদ্ধ সেই মানব ঐক্যের বোধকে খণ্ডিত করছে। ধরাই যাক না সম্প্রতি আসামে বা পাঞ্জাবে যা হয়ে গেল বা যাচ্ছে সেখানে কি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বড়ো স্বার্থকে বলি দিতে অকুণ্ঠ হয়নি একদেশদর্শীরা! না হয় অখণ্ড শিখিস্তান হল কিন্তু তারও তো বদলা আছে। অন্যেরা যদি বলে যে শিখেরা আর অন্য দেশে ঢুকতে পাবে না তাহলে সেটা হবে কেমন? দেশটাকে ছোট করা মানে নিজেকেও সংকুচিত করা। এ কথা যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা অনেক বলেছেন, অনেক লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। কে আমাদের কানে তুলো দিয়েছে?—এতে সন্দেহ নেই সে হচ্ছে সংকীর্ণ দেশপ্রেম যা স্বজাতি প্রীতি।

দেশ-দেশান্তরে মানুষ যাবে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে, বিভিন্ন জীবন-বোধের সঙ্গে সংযোগে তার আত্মবোধ পূর্ণ হবে—এই তো বাঞ্ছনীয়। এমন কি পাসপোর্ট-ভিসাও মানুষের মুক্তিপথের বাধা—একথা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের কথা একটু স্বতন্ত্র। ভারত ভেঙে যে একদিন পাকিস্তান তৈরি হল এ সেই কর্মের সূত্র ধরে এসেছে, তারই সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ। পাকিস্তানের মানুষরা ভারতের মানুষদের থেকে পৃথক নয়—তাদের ঐতিহ্য, রক্ত, আকৃতি, খাদ্য সবই এক—যে প্রদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই প্রদেশের মতো। আজকের পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মানুষই তো পূর্ববঙ্গের। সে ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ যারা অখণ্ড ভারতে বাস করেছিল তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে বিদেশ ভাবা শক্ত। অথচ কৃত্রিম ভাবে বিদেশ ভাবানো হয়েছিল, আবার এখনও হচ্ছে।

এই সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে একদল বাঙালী শিল্পী, বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁরা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের কাছে ইংল্যাণ্ডও যতোটা বিদেশ ভারতও ততোটা বিদেশ—। এই অভিনব বাক্যটি শুনে আশ্চর্য হইনি। কারণ কৃত্রিমতার রূপই এই রকম। এই নকল বিদেশী সাজ

যখন নীরবে লক্ষ্য করছিলাম তখন ওদেরই মধ্যে একটি ছেলে আমাকে এসে বললে—মাসীমা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়েছি, খেয়েছি,—তাছাড়া আপনি আমাদের ক্যাম্পে এসেছিলেন। —সে একটা ক্যাম্পের নাম বলল।

—সে ক্যাম্পটা কোথায়?

—ইছামতী নদীর ওধারে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প।

আমি মনে মনে ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি—তোমরা তো বিদেশী। তোমাদের মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে আমি কি করছিলাম?—কিন্তু করিনি। যে হৃদয় সংবেদনশীল নয় সেখানে বেদনা পোঁছানো বড়ো লজ্জার কথা।

অনেকদিন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী প্রচেষ্টা চলছিল মিলিটারী শাসন বিরোধী বাঙালীদের ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত প্রমাণ করবার। আগরতলা কেস নামে প্রসিদ্ধ কেসে মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করে চরম সাজা দেবার চেষ্টা চলেছিল। বাঙালী সমস্ত আইনজীবী এ নিয়ে লড়েছিলেন। এ কেসের কতোটা সত্যতা ছিল জানি না। এখনও লোকের মুখে সন্দেহের কথা শুনি।

যা হোক, চীন এবং আমেরিকা রাজনৈতিকভাবে এই পাকিস্তান-ভঙ্গ সমর্থন করেনি। তবে আমেরিকার স্বাধীন জনসাধারণ দু-হাত উজাড় করে ক্ষুধিতের অন্নপাত্র পূর্ণ করে দিয়েছিল। কি জিনিসই না এসেছে আমেরিকা থেকে। বস্তা বস্তা চাল গম তো আছেই, ময়দা, গুঁড়ো দুধ, ড্রাম ভর্তি সাবান, কৌটা ভর্তি মাছ-মাংস—সে মাংস কিছুটা নিষিদ্ধ মাংস হলেও দাতাদের বদান্যতা তাতে কমে যায় না। আর এসেছে টিন টিন হলদে রঙ-এর গাওয়া ঘি (**Clarified butter**)। আমাদের ছোট ক্যাম্প হলেও বহু লোক দেখতে আসে বলে আমরা যথেষ্ট জিনিস পেয়েছি। কেউ কি বিশ্বাস করবে আমরা সেই শিবিরে গাওয়া ঘির লুচি ভেজে একশো ছেলেমেয়েকে খাইয়েছি।

রাজনৈতিক ভাবে আমেরিকার মতো বড়ো দাদা আমাদের বিপক্ষে গেছে বলে ইউরোপের অন্য দেশগুলো তারই সুরে বাঁশী বাজাতে লাগলো। বাংলা দেশকে তারা স্বীকৃতি দেবে না। আবার দিলও অনেকে। কে কে দিল পর্যায়ক্রমে ঠিক মনে পড়ছে না। এদিকে আমাদের জনসাধারণ এবং বাংলাদেশের মানুষ সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে কেন ভারতীয় সৈন্য আরও সাহায্য করছে না। প্রতিদিন নূতন নূতন মানুষ আসে নিজেদের দুঃখের খবর নিয়ে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও বহু মানুষের নিষ্ঠুর নিধনের কাহিনী শুনতে শুনতে

আমরা দিশেহারা।

রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে এমন যে উচ্চশিক্ষিত পরিবারটির কথা আগে লিখেছি তারা তু'মাস গ্রামে লুকিয়েছিল। কৃষকের বাড়িতে তেলচিটে মাতুর ও বালিশে শুয়ে পান্তাভাত ও পোড়া লংকা খেয়ে তারা ভালোই ছিল। শুধু অনিশ্চিত ভাগ্যই ছিল তাদের তুশ্চিন্তার কারণ। শুনেছিলাম সেই সময় ঐ গ্রামে কয়েকজন রাজাকার ধরা পড়ে। তারা বাঙালী, তবে পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে। অতএব তাদের গ্রামের লোকেরা মেরে ফেলল, কষ্ট দিয়ে মারল। ঐ পরিবারের একটি মেয়ে সেই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে একটা কথা অসতর্কভাবে বলে ফেলেছিল। কথাটা আমার কানে তপ্ত শলাকার মতো বিঁধে গেল। মানুষের অসীম নিষ্ঠুরতার যেন কোনো শেষ নেই। কোনোদিকে তাকানো যায় না যেখানে করুণা আছে। অথচ এই দেশে কতো করুণার কথা বলা হয়েছে। বাঙালীর নরম মনটা কোথায় গেল? এই মেয়েটি আমায় বলেছিল ঐ গ্রামে তিনটি লোক ধরা পড়ে যারা সৈন্যদের খবর দিত। তাদের ধরে মারা হল। কয়েক-দিন লাগলো। কালুমিয়ার এমন কঠিন প্রাণ—যে 'যায়ই না'। এই কথা-টুকুর মধ্যে যে নিষ্ঠুরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে তা আমার মনকে আঁকড়ে রইল। আমার কেবল মনে হতে লাগলো সবাই যদি সমান নিষ্ঠুর হয় তাহলে মুক্তি কিসের থেকে? এ মুক্তিতে ক'জনের লাভ হবে? দেশে ফিরে গিয়ে এরাও তো প্রতিহিংসার তাণ্ডব চালাবে। আমি যে ভাবছি এই স্বাধীনতার যুদ্ধে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবে—সেটা কি তবে ভুল?

যাঁরা আসছিলেন তাঁদের কাছে নানা খবর পাচ্ছিলাম। সৈন্যরা তো বাংলা দেশের গ্রাম চেনে না। কোথায় হিন্দু আছে, কোথায় আওয়ামী লীগের লোক আছে এসব দেখিয়ে দিত যারা তারা বাঙালী হলেও নিঃসন্দেহে শত্রু। অতএব বধ্য। অবাঙালী মুসলমানরাও এই বাঙালী অভ্যুত্থানের ঘোর বিরোধী। এদের পূর্ববংগে নামকরণ হয়েছে বেহারী। সবাই যে বিহারবাসী ছিল তা নয়। তবে বেহারের দাংগার সময় বহু মুসলমান, পূর্ব-পাকিস্তানে পালিয়েছিল। তাঁরা কেউ কেউ উর্দূভাষী হলেও বেশীর ভাগই বিকৃত বাংলা-বলিয়ে এবং গোঁড়া মুসলমান। সুতরাং এরাও পরম শত্রু এবং বধ্য। কতোটা যে শত্রু তা স্বাধীনতার পরই রাজাকারদের কীর্তিকলাপে বোঝা গেছে। তাই যুদ্ধ যে দিকেই মোড় নিক হানাহানি যে চলতেই থাকবে তা বোঝা যাচ্ছিল। সৈন্যেরা যখন যুদ্ধ করে তার মধ্যে হিংস্রতা থাকে কম। সে যেন

অন্যান্য কাজের মতই একটা কাজ। কিন্তু এই চোরা গোপ্তা যুদ্ধের নৃশংসতা চরিত্রের মধ্যে যে হিংসার বীজ উপ্ত করে তা যেন শেষ হতেই চায় না।

নিষ্ঠুরতার কথা বলতে গিয়ে আর একটা কাহিনী মনে পড়ল। আমরা যখন বয়রার দিকে যেতাম তখন দীর্ঘ পথে কোথাও খাওয়ার জায়গা ছিল না তাই বনগাঁ থেকে একটু এগিয়েই মামা ভাগ্নে ক্যাম্পে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধুর ঘরে বসে একটু চা খেয়ে নিতাম। তাঁরা হিন্দু মুসলমান সবাইকে সমভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও সেবা করেছিলেন বটে তবু মন সব সময় সায় দিত না। ঐ সাধুটি আমার জীপের উপর ব্যানারে **Council for promotion of Communal Harmony** লেখা আছে দেখে একটু মুচকি হেসে বলতেন, দিদি এ আপনার স্বপ্ন—একি হবে!

তারপর একদিন বয়রা থেকে ফিরছি জীপ থেকে নামবার আগেই সাধু এসে দাঁড়ালেন, আজ তাঁর রুদ্র মুর্তি গলায় ও চূড়ায় গাঁদার মালা জড়ানো, কপালে লাল চন্দনের টিপ, হাতের ত্রিশূলে মালা জড়ানো। আমার ব্যানারটার দিকে রক্ত চোখে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিন—আমার আর সহ্য হয় না। আমি ক্রোধে কাঁপছি—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে ভাই এরকম কথা কি বলা চলে। এখন যদি হিন্দু মুসলমানে ভেদ হয় তবে সবই তো নষ্ট হবে।

তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন অসম্ভব আশা করে লাভ নেই। আমি সহ্য করতে পারছি না, যদি পারেন আমায় ট্রান্সফার করিয়ে দিন। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতে বল্লেন, চলুন দেখবেন। তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখি **Camp**-এর পিছনে একটা সামিয়ানার মত টাঙিয়ে হাসপাতাল করা হয়েছে। সেখানে পর পর খাটিয়া পাতা—একটা খাটিয়াতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। তার পিঠের উপর একটা চাদর টানা, আর একজন একটা পাখা হাতে মাছি তাড়াচ্ছে—সাধু বল্লেন চাদরটা তোল।

চাদরটা তুলতেই শিউরে উঠলাম। লম্বা লম্বা চাবুকের দাগ কেটে বসে গেছে সেই ঘায়ের মাঝে মাঝে চুমড়ি পড়ে এক বীভৎস দৃশ্য হয়েছে, লোকটা গোঙাচ্ছে। সাধু অন্য দিকে আঙুল দেখালেন—দেখুন দেখি ঐ দিকে—তাকিয়ে দেখি একটা চেয়ারে এক ব্যক্তি বসে আছে—তার মুখ হা করে মাড়িতে আর একজন ওষুধ লাগাচ্ছে—মাড়িতে একটিও দাঁত নেই—এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমার পা কাঁপতে লাগল। আমি তার সামনে বসে পড়ে বললাম—ভাই, কে তোমার এ দশা করেছে—মুসলমান?

লোকটি অতি কষ্টে বল্লে—"না দিদি, গুণ্ডা।"

সাধুর মাথা নিচু হয়ে গেল আমার আর কিছু বলার ছিল না।

পূর্বের কথায় ফিরে যাই। ভারতের সব মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছিল আমরা কেন সৈন্য পাঠাচ্ছি না। ইন্দিরা গান্ধী এ কি করছেন? বাঙালী বলেই কি? বাঙালীর প্রাণের প্রতি তাঁর কোন মায়া নেই। জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লীতে বিরাট কনফারেন্স করলেন। তাঁরও বক্তব্য আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করব। বাঙালীদের এই স্বায়ত্তশাসনের প্রয়াস মানুষের স্বাধীনতা-লিপ্সার প্রমাণ। একে অভিনন্দন জানাতেই হবে। সেই সম্মেলনে নানা প্রদেশ থেকে বহু মানুষ এসেছিল। এদেশের সকলেরই একই মত। আজকে ভাবি আমরা যারা রাজনীতির লোক নই তাদের আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা রাজনীতির রীতিমতো সমজদার তারা কেন এভাবে ভারতকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ দিচ্ছিলেন এবং বিলম্ব হচ্ছে বলে প্রধান মন্ত্রীকে কুবাক্য বলছিলেন তা বুঝতে পারি না। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যে কতোখানি হঠকারিতা হত তা বুঝতে পারলাম যখন আমেরিকা seventh Fleet পাঠিয়ে দিল। অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও কূট রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্না আমাদের প্রধান মন্ত্রী দেশ বিদেশ ঘুরে বিশ্বের সামনে আমাদের বক্তব্য বলে শক্তিশালী রাশিয়াকে সংগে নিয়ে তবে সম্মুখসমরে নেমেছিলেন। তার আগে সমর ছিল নেপথ্যে।

এই নেপথ্য সমরটা আবার বিদেশীদের কাছে গোপন। সেইজন্য বিদেশী-দের সীমান্তে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসে। বাংলাদেশের এই যুদ্ধ যেন চুম্বকের মতো লোক ডেকে আনছে! সেই চুম্বকের আকর্ষণে বহু দ্রব্যসম্ভারও আসছে। যে যা পারছে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

একবার শুনলাম বিলেত থেকে এক জাহাজ ফারকোট এসেছে। কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে বেশ হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

Save the Children Fund বিরাট শিশু হাসপাতাল খুলেছে এবং অত্যন্ত নিপুণতার সংগে কাজ করছে। এইসব যখন ভাবি তখন আমার মনে হয় এক একবার যে হুজুগ ওঠে সব খ্রীশ্চানদের তাড়িয়ে দিতে হবে, ওরা খৃষ্টান করে—ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা অকৃতজ্ঞতা। সে সময় ওদের আন্তরিক সাহায্য আমাদের কি কাজেই না লেগেছে।

যাই হোক আমেরিকা পাকিস্তানের স্বপক্ষে এবং নির্লজ্জের মতো **Fleet** ও

পাঠিয়ে দিয়েছে। আর ইংল্যাণ্ডও আমেরিকার কারণেই দোদুল্যমান। কারণ আমেরিকাই তো টাকার জোরে সকলের বড়ো। অতএব সারা ইউরোপই দ্বিধায় পড়েছে। আমেরিকা পরিষ্কারই বলেছে ভারতই উস্কানি দিচ্ছে, যুদ্ধ লাগাচ্ছে—পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার জন্য—অতএব আমাদের পক্ষেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই নিয়ম হয়ে গেল সীমান্তে কোনো বিদেশীর যেতে হলে অনুমতি লাগবে। কিন্তু অনেকেই তো সীমান্ত দেখতে চায়, বড়োই কৌতূহল। কটা মানুষের জীবনেই বা স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখার সুযোগ ঘটে? আমারও অবস্থা তাই। পঞ্চান্ন বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি। কাজেই ওদের কথা আমি ভালো বলতে পারি।

একটা গল্প শুনেছিলাম। একজন স্বেচ্ছাসেবক গাড়ি করে যাতায়াত করে। একটি ইংরেজ ছেলে ধরে পড়ল তাকে নিয়ে যেতে হবে। সুবীর বিশ্বাস বললেন, ছেলেটা খুব ভালো—অনেক কাজ করেছে। ওকে কেউ একটু নিয়ে যেতে পারে না? একজন নিয়মিত যেতেন—তাঁর নাম করছিনা। তিনি বললেন—আচ্ছা ড্রাইভার সেজে চলুক আমার সঙ্গে। কাজ শেষ হলে চলে আসবে। পথে দ্বারীরা আটকায়নি, লক্ষ্য করেনি। নির্বিঘ্নে পার হয়ে সারাদিন কাটিয়ে কৌতূহল অবসানে যখন তাঁরা বাড়ির দিকে ফিরছেন হঠাৎ একটি স্ত্রীলোক ছুটে এসে রাস্তার মাঝখানে গাড়ির সামনে পড়ে ধড়ফড় করতে লাগলো। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে লোকারণ্য হয়ে গেল। এই সাহেব ব্যাটা চাপা দিয়েছে। ভদ্রলোক যতো বলেন ও তো গাড়ি থেকে অনেক দূরে, আমরা কি করে চাপা দিলাম—কে কার কথা শোনে। পিল পিল করে লোক জমা হতে লাগলো। ভদ্রলোক তো ভাবছেন এখন সবচেয়ে বিপদ এই বিদেশীকে নিয়ে। সহজেই বিদেশীরা সন্দেহভাজন। ইনি আবার তাকে নিয়ে গিয়েছেন বিনা অনুমতিতে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো আদালত, সেখানে কঠিন প্রশ্নোত্তর—কি জন্যে আপনি বিদেশীকে আইন অমান্য করে সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন? কাগজে কাগজে ফলাও হবে বিদেশী চক্রান্তে অমুক যুক্ত। ভয় তাঁকে পাথর করে দিয়েছে। এমন সময় ভীড় ঠেলে একটি আধবয়সী লোক এগিয়ে এসে মেয়েটিকে টেনে তুলে চটাপট চড় লাগাতে লাগলো। এই দৃশ্যে সকলে অবাক। তখন শোনা গেল মেয়েটির মৃগীরোগ আছে এবং অবাধ্য। কিছুতেই ঘরে থাকবে না। ক্রমাগত রাস্তায় বার হবে। সেইজন্য অভিভাবক প্রথমে চপেটাঘাত তার পরে কয়েকটি চট্টোপাধ্যায় দিয়ে দিলেন।

মউত্থদ আমাকে আর একটি গল্প বলেছিল। একবার সে অনুমতি নিয়ে কয়েকজন বিদেশীকে ক্যাম্প দেখাতে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য হয় অদূরে গেরিলা যোদ্ধাদের কুচকাওয়াজ চলেছে। কি সর্বনাশ! মউত্থদ তাড়াতাড়ি ওদের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই হাত আড়াল করে তারা বললে —না, না—কোনো ভাবনা নেই। আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিচ্ছুই না।"

সল্ট লেক ক্যাম্প বড়ো দুর্গন্ধ ছিল। ক্যাম্প গঠনের দোষে তো বটেই আর এদেশের মানুষের নোংরা স্বভাবের জন্য ওখানে ঢোকাই তো দুষ্কর ছিল। প্রত্যেক ক্যাম্পে দুর্গন্ধই প্রধান দুর্গতি। এ ছাড়া ক্যাম্পে বাস করা কিছুই কষ্টকর হত না। খাদ্য, চিকিৎসা, প্রয়োজন মতো ডাক্তার, জলসরবরাহ কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। সল্টলেক ক্যাম্পে সুবীর সুন্দর কাজ করছিলেন। আমাদের ক্যাম্প কল্যাণীতে। এখানে নানা ক্যাম্প থেকে অনাথ শিশু যোগাড় করে আনতে আমাকে খুব ঘুরতে হয়েছে। কখনও আমার সঙ্গে সুবীর থাকতেন, কখনও সদর স্ট্রীটের বিলাস দাস। ততোদিনে সদর স্ট্রীট থেকে জন হেস্টিংস চলে গেছে। তার তৈরি ধানের চারাগুলো ওপারে লাগানো হয়নি। অনেকেই ভাবেনি যে বাংলাদেশের এই গৃহযুদ্ধ এতদিন চলবে।

বিলাস আর আমি একটা মুসলিম ক্যাম্পের সামনে গাছতলা থেকে আমিনাকে এনেছিলাম। আড়াই তিন বছরের মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে এক বৃদ্ধ মুসলমান তাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সে এসে আমাদের কাছে মেয়েটিকে দিল। আমিনাই প্রথম বা একমাত্র মুসলিম মেয়ে আমাদের ক্যাম্পে এলো। এখানে একটা কথা উল্লেখ করছি যে যদিও এই শরণার্থী প্রবেশের সময় এবারেহিন্দু ও মুসলমান দুই-ই এসেছিল, মুসলমানদের জন্য সর্বত্রই আলাদা ক্যাম্প ছিল। এটা কি কারণে হয়েছিল জানি না। যে ভীষণ বিপদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই গৃহছাড়া হতে হয়েছে সেখানে তো জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। আমার সেই কবিতাটি মনে পড়ত—

"বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।"

তা আমাদের এই অভাগা দেশে বোধ হয় সে কথাও সফল হবে না। হয়তো বা পরের লাইনটির অপেক্ষায় থাকবে।

"মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

সাম্প্রদায়িকতার বীজ যে কখন কি সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে তা বোঝা দুষ্কর। আমিনা ক্যাম্পে আসার পর দেখলাম যে, যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত রবীন্দ্রসংগীত-গায়িকা মুসলমান মেয়েরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন ক্যাম্পকর্মী হিসেবে তাঁরা সকলে এই মেয়েটির দিকে বেশী নজর দিলেন। তাঁদের সব ভালোবাসা যেন এই মেয়েটির প্রতি উপচে পড়ল। এটা তাঁদের কাছে এতই স্বাভাবিক ছিল যে তাঁরা বুঝতেও পারেননি যে আমরা লক্ষ্য করছি। অথচ তাঁরা নিজেরা জানতেন যে তাঁদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। সে কথা সর্বদাই গর্ব করে বলতেন।

আর একবার বিলাস আর আমি ঘোর বর্ষার মধ্যে ক্যাম্পে ক্যাম্পে অনাথ ছেলেদের খুঁজে খুঁজে ঘুরছি। আমাদের কাছে খবর আসতো কোথায় কোথায় ক্যাম্পের ভিতরে অনাথ শিশুগুলি কার কার খপ্পরে পড়েছে—যারা আত্মীয় সেজে বাচ্চাগুলোকে আটকেছে। বাচ্চাদের দাম অনেক। তাদের র‍্যাশন আছে, শিশুখাদ্য আছে, দুধ ও চিনির কোটা বেশী। এইসব সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তারা শিশুদের হাতছাড়া করতে চাইতো না। কিন্তু কর্নেল লুথরা আবার বিশেষ তাড়া দিচ্ছেন—শিশুদের খুঁজে বের করুন। প্রচুর মা কলেরায় মারা গিয়েছে। তাদের বাচ্চাগুলোর কি হল? তাই তো, বাচ্চাগুলো গেল কোথায়! একবার খবর পেলাম দত্তপুকুর ক্যাম্পের ভিতর দিকে একটা গ্রামের মধ্যে তিনটি অনাথ শিশুকে নিয়ে গিয়েছে। যারা নিয়ে গিয়েছে তারা নাকি ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে, একটা ছোট নড়বড়ে ব্রীজ পেরিয়ে জীপ আর এগুতে পারলো না। পথপ্রদর্শককে নিয়ে বিলাস এগিয়ে গেল। আমি গাড়িতে বসে রইলাম। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। নদী পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে। মানুষের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন। কি নদী সে নাম সন্ধান করেছিলাম কিন্তু আজ মনে নেই। শুধু সেই বর্ষণক্লান্ত সকালবেলাটা কোনোদিন ভুলবো না। নদীর জলে হাত ডুবিয়ে বসে তার স্রোতটা অনুভব করতে করতে ভাবছি মানুষের জীবনও একরকম কতো কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। এই মানুষগুলি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে নদীর মতোই কি দুরন্ত বেগে ঢুকছে। প্রকৃতির কোনো বেদনা নেই। কিন্তু মানুষের?

এমন সময় বিলাস তিন-চারটি মনুষ্যশাবক নিয়ে উপস্থিত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ধুলো কাদা মাখা। পেটগুলো ডিগডিগ করছে। পরনে শতছিন্ন ন্যাকড়া।

হাড়পাঁজরা বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে এসেছে একটি লোক। সে নাকি এদের কাকা। চোখ মুছতে মুছতে সে যা বলছে তা হচ্ছে এই—তার ভাই নাকি মা-মরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিল। এখানে এসে মারা গেছে। এখন সে এদের বুকে করে রাখবে, অনাথ আশ্রমে দেবে না। এদের জন্যে র‍্যাশন কার্ড করেছি। এরা খেয়েদেয়ে কাকীমার যত্নে রয়েছে। যত্ন যে কিরকম হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। বিলাস বললেন—তিনি গিয়ে দেখেন কাকা র‍্যাশন আনতে গেছেন। একটু পরে র‍্যাশনের বোঝা-গুলো বাচ্চাদের কাঁধে চাপিয়ে স্নেহপ্রবণ পিতৃব্য যেন ছাগল তাড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমাদের যাওয়াই নিস্ফল হল। এই অনাথ অসুস্থ বালকবালিকা-গুলিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে ফেলে চলে এলাম।

সেদিন আমরা অন্য একটি ক্যাম্প থেকে পাঁচুকে এনেছিলাম। বহু পরে এই পাঁচুর বিষয়ে সেই দিনটির কথা মনে করে 'জগৎ পারাবারের তীরে' নামে আনন্দবাজারে একটি প্রবন্ধ লিখি। লেখাটি এখানে তুলে দিলাম ঃ

"জগতপারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা"

এই কবিতার অর্থ পরিষ্কার হয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে। শিবিরে শিবিরে তখন হাজার হাজার শিশু অশেষ দুর্গতির মধ্যে রয়েছে। আর যারা শিবিরে নেই অথচ র‍্যাশন কার্ড আছে তাদের আরও সর্বনাশ। ঐ র‍্যাশন কার্ডের লোভে তারা অজায়গায়-কুজায়গায় বন্দী হয়ে আছে। বাচ্চাগুলিকে প্রায় অর্ধাহারে রেখে সেই অভিভাবকরা তাদের চালগুলির সদ্ব্যবহার করছে। তখন শরণার্থীশিবিরে আর সবই বিস্মৃত, 'জয় বাংলা' ধ্বনি নীরব, লক্ষ্য শুধু র‍্যাশনকার্ড—'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

কর্নেল লুথরার সহযোগিতায় একটি সরকারী জীপ নিয়ে আমিও রেভারেণ্ড বিলাস দাস পরিত্যক্ত ম্যারাসমাসগ্রস্থ রিকেটে পঙ্গু শিশুদের সন্ধানে এক প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে শিবিরে শিবিরে ঘুরে মানুষের দুর্দশা ও নির্মম-তার ছবি দেখেছিলাম। যতোক্ষণ বাচ্চাটার প্রাণ আছে ততক্ষণ তার র‍্যাশন কার্ডও আছে। তাকে ছাড়ে কে। এই অবস্থা অবশ্য কলকাতার রাস্তায় যে সব শিশু ওদের 'মায়ের' কোলে দেখা যায় তাদেরও। অনেক সময়ই শিশুটা ভাড়া খাটে। যতো তার দুর্দশা, যতো সে ক্ষীণ, যতো সে রুগ্ন, ঘেয়ো, পিচুটিপড়া ততো আমাদের করুণাকে উসকিয়ে তোলে। তার খোঁচা থেকে নিষ্কৃতির জন্য আমরা দু' পয়সা ফেলে দিই। ফলে বেচারাদের যন্ত্রণা বাড়ে। বয়স্কদের ভিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা সে বিতর্কে আমি যাব না। তারা স্বেচ্ছায়

ভিক্ষা করে, লোকে স্বেচ্ছায় দিক বা না দিক। কিন্তু অসহায় শিশুদের নিয়ে এই ব্যবসা বড়ো করুণ, বড়ো শোচনীয়।

শিবিরের কম্যাণ্ডার একটি বছর তিনেকের বাচ্চা—নাম পেঁচো—নিয়ে এলেন। সে যে বৃদ্ধটির আঁচল ধরে শিবিরে ঢুকেছে দুদিন আগে সে মারা গেছে। "একে আপনারা নিয়ে যান। এখানে বাঁচা শক্ত।" চার পাঁচটি রুগ্ন শিশু যোগাড় করে সেই অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে সত্তর মাইল জীপে চলে আমরা কল্যাণীতে আমাদের আশ্রয় শিবিরে এসে পেঁছিলাম। সারা পথ পেঁচোর এক কথা। সেটা পরশুরামের ভাষায় Z-এ আকার দিয়ে ছাড়া বলা চলছে না। "ভাZা দে, ভাZা দে।" বিলাস বললেন বুড়ী ওকে চাল ভাজা-টাজা খেতে দিত বোধ হয়। শিবিরে পেঁছে ওদের পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করব—হঠাৎ এক বিরাট প্যাকেট এনে দিল। শুনলাম—সরকারী স্টোর থেকে দিয়ে গেছে। খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমাদের তিন ইঞ্চি পরিমাণ চকোলেটের প্যাকেট দেখা অভ্যাস। এ একেবারে তিন হাত চকোলেট বার। গোল্ড-বারের কথা শুনেছি, কিন্তু সুইস চকোলেট বার তার চেয়েও আশ্চয ব্যাপার। শুনলাম সুইজারল্যাণ্ড থেকে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য এসেছে। একটু ভেঙ্গে পেঁচোর মুখে দিলাম। "এই নে তোর ভাজা।" কোন্ সুদূর সুইজারল্যাণ্ড থেকে আসা এই বিশেষ উপহার আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা সি· আই· এ·-ফোবিয়ায় ভুগছিলাম। বিদেশ থেকে রাশি রাশি জিনিস শরণার্থীদের জন্য সরকারের গুদামে উপস্থিত হচ্ছে। ওষুধ, সাবান, গুঁড়ো দুধ ও কম্বল। এর মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে কখন সি· আই· এ·-র চর এসে পড়ে এই ভয়ে আমরা ভীত। দলে দলে বিদেশী সরকারী গাড়ি চেপে বেড়াতে আসছে। কিন্তু যদি তারা বলে—"তোমাদের ছেলেদের জন্য কিছু খেলনা পাঠাব কি?"—আমরা চমকে উঠি। ভাবি—'ওরে বাবা, এত সোহাগ কেন? কোন্ দেশের গুপ্তচর?' কিন্তু সেদিন পেঁচোর হাতে সুইজারল্যাণ্ডের মিল্ক-চকোলেট দিতে পেরে মনটা একটা প্রসন্নতায় ভরে গেল। সে প্রসন্নতা বিশাল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে রেভারেণ্ড বিলাসকে নিয়ে জীপ-এর শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। আর আমি টিম্‌টিমে লণ্ঠনের আলোয় শূন্য মাঠের মধ্যে তাঁবুর ঘরে বসে জগৎপারাবারের কিনারে পেঁছে গেলাম। মানতেই হবে এ জগৎ ক্রীশ্চান-দের জগৎ। এখান থেকেই জননী টেরেসার দু' হাত সম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠছে এবং সে সম্পদ সেবায় ধন্য হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম চেনা রেভারেণ্ড সুবীর-

কুমার বিশ্বাসও সেই জগতের মানুষ। তাঁর সেবার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। শুধু সেবা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষা দেবার পথ তাঁর। বাংলাদেশের ক্যাম্পে ক্যাম্পে যখন বহু ক্রীশ্চান সংঘ যুদ্ধে সাহায্য করব না বলে অনমনীয় সংকল্প নিয়েছিল তখন তিনি তা গলিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে এই জগতে তিনিই নিয়ে এলেন—আসুন আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। আমি ক্ষুদ্রচেতার মতো প্রথমেই বলছিলাম—কিন্তু আমার আশ্রমের কাউকে ক্রীশ্চান করা চলবে না। হো হো করে হেসে উঠেছিলেন সদাহাস্যময় মানুষটি। কোনো সন্দেহ মনে রাখবেন না। ওসব পথ আমার নয়।···

এই কাজে প্রবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি সারা পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষ শিশুদের সম্বন্ধে ভাবছে। জগতে টাকাও যথেষ্ট আছে। অনেক মায়ের কোলও প্রসারিত আছে অনাথের জন্য। যদি কর্মী থাকে, যদি আমাদের চেষ্টা থাকে, তাহলে আমাদের এ দেশের অনাথ শিশুদের দুঃখ দূর করা অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গায় আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে হয়তো আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণবন্যা এসে ইউরোপকে প্লাবিত করে দেবে। সেটা হবে তাদের কৃতকর্মের ফল। কিন্তু এতে আজ আর আশংকার কারণ নেই। সমগ্রভাবে মানবজাতির কল্যাণই কাম্য। কোনো এক বিশেষ ভূখণ্ডের মানুষের নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকাল দত্তক নেবার ঝোঁক খুব দেখা যাচ্ছে।···ভিয়েতনামের গৃহহারা অনাথ শিশু আজ ইউরোপের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের পরে এখন অনেকদিন কেটে গেছে। এই দত্তক নেবার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, পৃথিবীর নানা দরিদ্র দেশ থেকে পশ্চিমের সমৃদ্ধ দেশগুলিতে পিতৃমাতৃহীন শিশু আশ্রয় পাচ্ছে। এ সম্বন্ধে নানা মত আছে। প্রতিবন্ধকতাও আছে। কিন্তু যেখানে একদিকে প্রয়োজন এত বেশী, অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষা প্রবল সেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা টেঁকে না। জগতে নানা ঘটনা ঘটে যার প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও ভিতরে অন্য কোনো কারণ থাকে যা আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই।

উদহরণস্বরূপ বিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায়। দুই প্রান্তের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য ক্রমবিবর্তনের ধারা দেখলে কি বোঝা যায়? অথচ পরিবর্তনের ধারা সূক্ষ্মভাবে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে চলেছে। যেমন শারীরিক ক্ষেত্রে তেমন মানসিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এক জগৎকে অন্য জগতে পরিণত করছে। আজকাল ইউরোপে সাদা মায়েদের কালো ছেলে কোলে নেবার যে বিপুল

আগ্রহ দেখি তাতে বিশ্বাস করতে পারি না যে এই শ্বেতকায়রাই একদিন কালো মানুষের সঙ্গে এক গাড়িতেও চড়তে চাইত না। গাত্রবর্ণের অপরাধে মরেছে কতো মানুষ। যাদের অভিজ্ঞতা নেই বা যারা জন্ম-পেসিমিষ্ট, তারা এই পরিবর্তনকে বিশ্বাস করতে চায় না বা পারে না। কিন্তু আমার মতো যারা জাত-অপটিমিষ্ট, তাদের মনে হয় যে মানুষের মনের দিকে এই পরিবর্তন একদিন সকল মানুষকে মিলিয়ে দেবে। যতোই গোলাবারুদের সাধনা হোক, মিলন-সাধনার শক্তি তার অন্তর্জগতে কাজ করছে। সে পরাজিত হবে না। সেদিন কল্যাণীতে শিবিরের বেড়ার ঘরে বসে সুইস চকোলেটের বারটা হাতে নিয়ে আমার এই কথাই বারম্বার মনে হচ্ছিল।

খেলাঘর ক্যাম্প বাঁধবার পর বাংলাদেশের কাজের এই অংশটা আর যুদ্ধের কথা মনে করাচ্ছিল না। শিশুদের দিকে বেশী মন দিলাম। বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঁচটা স্কুল চলছিল বটে কিন্তু খেলাঘরই আমাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়েছিল। আশ্রমটা শিশুদের বাসযোগ্য এবং দর্শনীয় করবার চেষ্টা করলাম। যদিও সেখানে গাছ কমই ছিল তবে কয়েকটা আমগাছের ঝোপের পাশে একটা গোল কুটির বানালাম। বেশ আশ্রম—আশ্রম দেখতে হল। ভাগ্যক্রমে একটা মালীও পেয়ে গেলাম। সে সুন্দর বাগান বানালো। ক্রমে ক্রমে দূর দূর থেকে অনাথ বালক-বালিকা নিয়ে আসতো বিভিন্ন ক্যাম্পের ভলান্টিয়াররা। এর মধ্যে ভরত সাহাই এ কাজ করত খুব বেশী। সেই যমুনা ও সুমিত্রা—দুই বোনকে নিয়ে এসেছিল কোনো একটা সন্ধ্যাবেলায়। সদ্য-মাতৃহারা দুই বোন এসে দাঁড়ালো। কিন্তু দুজনের দুরকম ভাব। সুমিত্রা এসেই লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো আর যমুনা ডানা-ভাঙা পাখীর মতো ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তার কান্না আর থামে না। সেই মেয়ে আজ ফরাসী গৃহিণী হয়ে প্যারিসে বাস করছে।

কল্যাণী ক্যাম্পে একদিন কে যেন বছর পাঁচেকের একটি ছেলে এনেছিল। কোথা থেকে সে কাদের সঙ্গে এ দেশে এসে পড়েছে তারও মনে নেই, আমাদেরও কেউ বলেনি। তবে আমি যখন ভোরবেলায় দেখি তার গায়ে ছিল একটা ছোট সাদা সার্ট। আমি তাকে পরিষ্কার করাবার জন্য কাপড় ছাড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে মনে হল ওর সাদা জামায় ছিটে ছিটে রক্তের দাগ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ও কেষ্ট, তোর জামায় কিসের দাগ?—সে বলল—দাদাভাইএর রক্ত। অনেক কথোপকথনের পর যা বুঝলাম তা এই, যে শত্রুরা এসে ওর ঠাকুরদাকে টেনে নামায়। ওর কাকী গিয়ে জলে ডুব দেয়। তখন

"রামদা দিয়া ওরা দাদার গলা কাটছে।" ও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে কিছু করেনি। শুধু ওর সাদা জামায় পূর্বপুরুষের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু ধরা আছে। জানি না সে আজ কোথায়। জানি না এ স্মৃতি তার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে—মানুষের প্রতি বিশ্বাসে না অবিশ্বাসে!

আর দুটি ভাইবোন গৌরী ও নকুল এসেছিল সল্ট লেক ক্যাম্প থেকে। গৌরী তখন জ্বরে ভুগছিল। নকুল রিকেটি। রিকেটের নানা রকম রূপ দেখলাম। কারও বা মাংস ঝুলে পড়ে, বৃদ্ধের মতো দেখায়। কারু বা হাত-পা ডিগডিগে, পেটটা মোটা। কারু কারু জ্বরও থাকে। গৌরীর জ্বরও ছিল, অপুষ্টির জ্বর। গৌরীর আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই গৌরী ও নকুল এখন প্যারিসে বিদেশী মায়ের আদর যত্নে মানুষ হচ্ছে। গৌরীর উপরে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি তুলে দিচ্ছি ঃ

গৌরী

দগ্ধ গ্রামের ধোঁয়ায় আকাশে প্রেতের ছবি
সামনে এগিয়ে আসে আর্ত নরনারী দ্রুতপদে।
মাঝখানে কপোতাক্ষের কালো জলে
অস্থির ছায়া পড়ে
লক্ষ লক্ষ মানুষের শূন্য দৃষ্টি
সন্ধান করে আশ্রয়ের
এপারে আসমুদ্র হিমাচলে আসন বিছায়ে
সর্বংসহা ভারতভূমি।
অপমানিত লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখভার
তার মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কম্পিত করে ভালোবাসা।

তবু তোমরা কি দেখেছ সেই কালো মেয়েটিকে,
যার পাঁজরের হাড়ে হাড়ে লেখা
উপবাসের কাহিনী
যার শূন্য চোখে ভাষা নেই
যার দশ বছরের মনোবৃত্তে

বাঁধা পড়ে গেছে একটি দৃশ্য
গুলিবিদ্ধ ধাবমান মায়ের যন্ত্রণা।
শত প্রশ্নের উত্তরে ওর নিরুত্তর মুখে
একটি মাত্র জবাব—"গুলি,"
অজস্র মানুষের দুঃখের সমুদ্র মন্থনে উত্থিত
ঐ যে একটি মেয়ে
রং তার কালো, নাম তার গৌরী,
ঈশ্বরের প্রমাণ হবে
যেদিন তার চোখে আলো জ্বলবে
ঠোঁটে হাসি গলবে—
সে মনে মনে বলবে—সবই তো আছে।

এই সব ছেলেমেয়েদের দশ-বারো বছর পরে যখন দেখি যে এরা কতো সুন্দর জীবন পেয়েছে সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

কল্যাণীর খেলাঘর ক্যাম্পের নাম-খ্যাতি যথেষ্ট হওয়ায় অনেক লোক দেখতে আসে, বিশেষ করে বিদেশীরা। এই ক্যাম্প ভারত সরকারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ভারত সরকারের বিদেশী অতিথি অনেকেই দেখতে আসতেন। যে সমস্ত ধনী-মানী ব্যক্তিরা শরণার্থী শিবির দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডির কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। এদিকে আমেরিকান সরকার ভারত-বিরোধী মনোভাব নিয়েছে। পাকিস্তানের দুঃখে তারা কাতর। এতগুলি নিরুপায় মানুষের কথা সেখানে একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গেছে এবং ভারত কি করে এত শরণার্থীর ভার বইতে পারে সে প্রশ্নেরও আমল দিচ্ছে না। এই যখন অবস্থা তখন এডওয়ার্ড কেনেডি একেবারে অন্য মনোভাব নিয়ে শিবির দেখতে এলেন। বিকেলে রাজ্যপালের বাড়িতে তিনি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটি মিটিং ডাকলেন। আমরা গিয়ে অপেক্ষা করছি—কেনেডি বহু ক্যাম্প পরিবর্শন করে ফিরে এলেন। জল, কাদা দুর্গন্ধের ভিতরে সারারিন ঘুরেছেন। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট কাদায় মাখামাখি। পরে শুনেছিলাম ক্যাম্পে ক্যাম্পে কেঁদে ফেলেছিলেন।

কেনেডি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা ক্যাম্পে কাজ করছেন। শরণার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। বলুন এদের জন্য এখন কি কি দ্রব্য প্রয়োজন। নানা জনে নানা কথা বলতে

লাগলেন। কেউ একজন শুকনো মাছের গুঁড়োর কথা বললেন। কেউ আরও দুধ চাইলেন। আলোচনা খাদ্য নিয়েই চলল। আমি সুযোগ পাওয়া মাত্র সাহসে ভর করে বললাম—ওদের সবচেয়ে বেশী উপকার করা হয় নিজের দেশে শীঘ্র ফিরে যেতে সাহায্য করলে। কেনেডি বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকালেন। এই অভিনব আবদার তাঁকে খুব বিচলিত করল। তিনি হাতের পোর্টফোলিও খুলে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার কাটিংস থেকে পড়ে শোনাতে লাগলেন এবং বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর সরকারের সঙ্গে একেবারে একমত নন। এর পর কেনেডির সঙ্গে আমার কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়েছিল।

বৃটিশদের মধ্যে কেউ কেউ আসছিলেন যাঁরা বেশ চতুর লোক। এঁরা বাংলাদেশের ছেলেদের একত্র করে তাঁদের সামনে রেখে একটা ভলান্টিয়ার কোর গঠন করবেন ভাবছিলেন। আরও নানাবিধ পরামর্শ দিচ্ছিলেন যার সবটা আমি টের পাইনি। ওদিকে শুনলাম ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরীর বাড়িতে একটা পার্টিতে এই সব পাদ্রীরা আসছেন। শেষ মুহূর্তে সেখানে আমারও নিমন্ত্রণ হল। ঐদিন যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁরা বলছিলেন তাঁরা যে টাকা তুলেছেন বা তুলবেন সেগুলি ভারত সরকারের হাতে না দিয়ে কিভাবে বাংলাদেশকে দেওয়া যায়। ওরা চেষ্টা করছিল বাংলাদেশের নাম করে ইউরোপে টাকা তোলবার। শুনতে পাই প্রচুর টাকা তুলেছিল। বাংলাদেশ থেকে লণ্ডনে যারা গিয়েছিল তার মধ্যে জ্যাকারিয়া খুব টাকা তোলার চেষ্টা করেছিল। আবু সয়ীদ চৌধুরী শুনেছি সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই সব ইংরেজরা আলাদা করে টাকা তুলছিলেন কিনা জানি না। পরে শুনেছি এদের খুব দুর্নাম হয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত নাম জন স্টোনহাউস। তিনি তো অনেক কুকীর্তি করেছেন এবং জেলের ভাত তো নয় রুটিও কিছু খেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যখন এখানে দেখি তখন বুঝতে পারিনি কি মতলবে তাঁর বাংলাদেশের প্রতি এত প্রীতি জন্মেছে। সুবীর পরে আমায় বলেছে যে ওরা যে এত বদ তা জানলে আমি তো একেবারেই আশ্রয় দিতাম না।

আমিরুল একদিন আমায় বললে আমরা একটি ভলান্টিয়ার কোর করছি। আপনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হোন। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ভলান্টিয়ার অর্গানাইজ করতে হবে। অনেক কাজ হবে। কিন্তু কেন যেন আমার এদের

সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছা হল না। ঐ সাহেবগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে মন চাইল না। প্রধানতঃ জন স্টোনহাউসের জন্যে। ওরা ভিতরে কে কি তা তো জানি না। একদিন স্টোনহাউস মোকাম্বোতে আমাদের ডিনার দিয়েছিল। সেদিন তার কথাবার্তা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। সে গল্প করছিল মোটেই বাংলাদেশ বিষয়ে নয়। নিজের মেয়েদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে। কোনো বাপ যে এমনভাবে নিজের কন্যাদের চরিত্রহনন করতে পারে তা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আমার এত বিশ্রী লেগেছিল যে তখনই ঠিক করেছিলাম এই লোকগুলোর সঙ্গে কোনো কাজ করব না। সেই পার্টিতে আমরা সপরিবারে ছিলাম। এবং সপরিবারেই আলোচনা করতে করতে এলাম যে বাংলাদেশের জন্য এই লোকগুলোর মাথাব্যথা কিছুই নেই, অন্য কোনো মতলব ঢুকে পড়েছে। মতলবটা যে কী তা তো পরে বোঝাই গেল। স্টোনহাউসের এই ভলান্টিয়ার কোরের ব্যাপারটা নিয়ে আমিরুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কয়েকদিনের জন্য একটু চিড় খেয়েছিল এবং আমাদের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ওদের ভলান্টিয়ারদের মাঝে মাঝে একটু মনকষাকষি চলত। তবে ভলান্টিয়ার কোর গঠন করার সূত্র ধরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা কোনোদিন ভুলব না।

একদিন আমিরুল আমায় বললেন— নদীয়াতে কতগুলো ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে কোথায় কি অবস্থা দেখতে চলুন। এই সব ক্যাম্পের বাচ্চাদেরও দেখবেন। আমিরুল যাবে মুক্তিফৌজে যোগ দেবার মত ছেলে আছে কিনা দেখতে। আমাদের কথা ছিল খুব ভোরে বেরুব। তা একটু দেরি হয়ে গেল। আমার যতোদূর মনে পড়ে সেদিন কল্যাণী পর্যন্ত জিয়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কল্যাণী পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। কতো যে ছোট ছোট গ্রাম—প্রতি দশ-পনের মাইল অন্তর ক্যাম্প হয়েছে। শান্তিপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর পার হয়ে গেলাম। কৃষ্ণনগরে আমিরুলদের চেনা এক ভদ্রলোক সংসার পেতে বসেছেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রত্যেক ক্যাম্পে সমর্থ যুবকদের তালিকা নেওয়া ছিল আমিরুলদের কাজ। আমি চেষ্টা করছিলাম হিন্দু ছেলেদের বলতে যে—তোমরা মুক্তিফৌজে যোগ দাও। বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে মাথা উঁচু করে দেশে ফেরো। দেশটা এখন হিন্দু-মুসলমান সকলেরই। বলতে দুঃখ হয় কিছু কিছু ছেলে যোগ দিলেও বেশীর ভাগ হিন্দু যুবকই যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী ছিল না। যদি বা তারা রাজী হত পরিবারে ঘোর আপত্তি উঠতো। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম—আওয়ামী

লীগকে ভোট দিছিলাম সত্যই, কিন্তু তাই বইলা যুদ্ধ করবো তো কই নাই।

কল্যাণী ক্যাম্পেও বারবার এই অবস্থা দেখেছিলাম। ট্রাক ভর্তি করে যুবকরা উঠেছে। হঠাৎ কি হল একজন ঝুপ করে নামলো, তো অন্যরাও ঝুপঝাপ করে নেমে দৌড়লো। আমিরুল বলছিল ক্যাম্পে ক্যাম্পে রিক্রুট-মেন্টের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। আমি দেখছিলাম বাচ্চাদের। চেষ্টা করছিলাম যাতে অসুস্থ ও আশ্রয়চ্যুত শিশুদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে ক্যাম্প দেখতে দেখতে আমরা পার হয়ে চলেছি একটার পর একটা গ্রাম। দুপুরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এক টুকরো পাঁউরুটি ও ডিম খেয়ে নিয়েছি। এই নদীয়ার পথে এমন স্থান পাওয়া গেল যেখানে দাঁড়িয়ে একটু খাওয়া যায়। কিন্তু বনগাঁর পথে তা একেবারেই হয় না আজকাল। এক হাত জমি নেই যেখানে লোকের ভীড় নেই। যতোই ক্ষুধার্ত হই না কেন একপাল ছেলেমেয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে খাওয়া কি যায়? কাজেই বনগাঁর দিকে যখন যেতাম তখন সারাদিন অনাহারে থাকতে হত। যেমন মাছি, তেমন মানুষ, তেমন দুর্গন্ধ। আমি জানি ইচ্ছে করলে আর একটু পরিচ্ছন্ন হতে পারা যায়। কিন্তু এই নোংরামিটা আমাদের মজ্জাগত। গ্রামের লোকদের থুথু কাশি মল মূত্র যত্রতত্র পরিহার করতে এতটুকু সংকোচ দেখিনি। শুধু গ্রাম বা বলি কেন এই কলকাতা শহরের এই হাল কি হত যদি পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা এদেশের মানুষ বুঝতো? যখন কল্যাণীর খেলাঘর ক্যাম্পে ছেলেমেয়েরা আসতো, তাদের মধ্যে কিশোর-কিশোরীও থাকতো। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ঘরের গা ঘেঁষে ময়লা করে। একটু দূরের পায়খানায় যাবে না। কল্যাণী ক্যাম্পে প্রতিদিন ভোরে উঠে প্রধান কাজ ছিল কোদাল দিয়ে সমস্ত ক্যাম্প থেকে ময়লা তুলে ফেলা। ছেলেমেয়েদেরই করতে হত। আমি কোনো জমাদার রাখিনি। তবু কোনো চৈতন্য হত না। ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবীদেরও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলতাম। সেসব অধিকাংশই ভস্মে ঘি ঢালা। সবাই কাজ করছে কিন্তু পরিচ্ছন্নভাবে থাকা যে সবচেয়ে বড়ো কাজ একথা এই উপমহাদেশে আজ পর্যন্ত কারুর বিশ্বাস হল না। এবং গান্ধীজী ছাড়া আর কোনো পলিটিশিয়ানই এদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করেননি।

কৃষ্ণনগর পার হয়ে চলেছি করিমপুরের দিকে। চলেছি তো চলেইছি। বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছি, এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো—সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেদের তো থাকবেই না। আমি যে ঘর-সংসার ফেলে

এসেছি আমারও নেই। অবশেষে রাত নটার সময় করিমপুর বর্ডারে পেঁছানো গেল। সেখানে একটা ছোট দোকান। ঐখানে খাদ্য, অস্ত্র সবই জমা থাকে। মুক্তিফৌজের একটি ঘাঁটি বললেই হয়। আমরা বসে থাকতে থাকতেই ওপার থেকে অনেক লোক এলো, অনেক খবরাখবর দিল। আমিরুল ও অন্যান্য যারা ছিল তারা তো জমিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। এদিকে আমি তখন ঘড়ি দেখছি। রাত আটটা বেজে গেছে। কি সর্বনাশ, বারো ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এখানে এসে পেঁ াচেছি, আবার কতক্ষণে এত পথ ফিরব? অবশ্য এবার আর পথে দাঁড়ানো নেই। আমি তাড়া দিচ্ছি, কিন্তু ওরা তো এতদূর এসেছে, ওরা ওদের কাজ করবে। আমার আর এখানে কোনো কাজ নেই। এখানে শিশু নেই, শরণার্থী নেই খালি মুক্তিফৌজের ছেলেরা। করিমপুর ক্যাম্প থেকে আর একটা ক্যাম্পে যেতে হল। কি করব—একেবারে সত্যসত্যই পড়েছি 'যবনের হাতে'। প্রায় নটার সময় গৃহাভিমুখে ফিরতে লাগলাম। যখন শান্তিপুরে পেঁ ছিলাম তখন বারোটা বেজে গেছে। তখন দারুণ অশান্তিতে ভুগছি। কারণ বুঝতে পারছি বাড়িতে কি দুশ্চিন্তা চলেছে। আমি তো বলে আসিনি কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরব। নিজেই তো জানতাম না এত দেরি হবে। শান্তিপুরে পেঁ ছে বুঝতে পারলাম মানসিক অশান্তির চেয়েও ক্ষুধার দাবী প্রবল হয়েছে। দশ ঘণ্টা আগে খাওয়া একটা ডিম ও এক স্লাইস পাঁউরুটির ক্ষমতা আর কতক্ষণ থাকবে। আমিরুল বললে পথের ধারে পেট্রোল পাম্পে পাঞ্জাবীদের ধাবায় খেতেই হবে। না খেয়ে আর চলা যাচ্ছে না। গাড়ি ঢোকানো হল। ঐ সময়ে সব ট্রাকগুলো এসে ঢোকে আর রান্নাবান্নার সরগরম চলে। দেখলাম একটা টেলিফোন আছে। ভাবলাম বাড়িতে একটা ফোন করে দেওয়া চলবে। গদীটি মারোয়াড়ীর। জানি না কি কারণে কিছুতেই টেলিফোন ব্যবহার করতে দিলে না। বহু মিনতি, তিনগুণ খরচ দিতে রাজী হয়েও অনুমতি পেলাম না। কারণ নিয়ম নাই। এ অসম্ভব নিয়মানুবর্তিতা সেদিন বড়োই কষ্টের কারণ হয়েছিল। সামনে টেলিফোন, তুলতে পারছি না। ওদিকে বাড়িতে আমার স্বামী যে কি দুশ্চিন্তায় আছেন তা বুঝতে পারছি। এদিকে জঠরানলকেও অস্বীকার করা যায় না। টিউবওয়েলে মুখ ধুয়ে একটা ছারপোকা-আকীর্ণ খাটিয়ায় বসে গরম গরম রুটির সঙ্গে তীব্র ঝাল ও তপ্ত তরকারী ও মুরগীর ঝোল কষে খেয়ে নেওয়া হল। ঐ প্রচণ্ড ঝাল তরকারী ক্ষুধার চোটে খেয়ে নিয়ে হুস হাস করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে জীপ চালানো গেল।

রাত্রি গভীর হয়েছে। জনকোলাহল স্তব্ধ। ঘনকৃষ্ণ গাছগুলির মধ্যে জোনাকী দপ্ দপ্ করছে। মানুষহীন একলা প্রকৃতি তার আশ্চর্য রূপ প্রকাশ করছে। যখন বাড়ি এসে পেঁ ছিলাম তখন দুটো বাজে। বাড়ির মানুষটির অসহায় অবস্থা কল্পনা করা শক্ত নয়। তিনি অত রাত্রে প্রোফেসর চ্যাটার্জীকে আনিয়েছেন:

কোথায় গেল মৈত্রেয়ী?

উত্তর—তা তো জানি না, কিছুই জানি না।

আরে আপনারা কেউ কিছুই জানেন না?

গৌরীকে টেলিফোন করেছেন। গৌরী মানসচোখে দেখছে একটা জীপ উল্টে আছে, তার নিচ থেকে আমাদের হাত-পা সব বেরিয়ে আছে।

এই সময় থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে যাওয়া শুরু করেছিলাম নানা জিনিসপত্র নিয়ে। একবার পুরোনো বন্ধু সুভদ্রা যোশী এলেন। এঁর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজে অনেকদিন যুক্ত ছিলাম আমরা। সুভদ্রা বললেন—তুমি রোজ কোথায় যাও?

কল্যাণীর খেলাঘরে ও শরণার্থীদের শিবিরে।

সুভদ্রা বললেন—আমি তোমার খেলাঘর দেখব কিন্তু কোনো শরণার্থী-শিবির নয়। ও আমার অনেক দেখা আছে। আমি মুক্তিফৌজের শিবির দেখব।

আবু সয়ীদ আয়ুবদের আত্মীয়স্বজন যাঁরা ঢাকা থেকে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন জামান একটা সেক্টরে কাজ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে—অর্থাৎ তাঁর পরিবারের কাছ থেকে এসব শিবিরের খবর পেতাম। কারণ তিনি অবশ্য বৃথা বাক্য ব্যয় করবার মানুষ ছিলেন না। যতোটুকু করতেন সেটা ভারত সরকারের নিন্দা ছাড়া কিছু নয়। সেদিকটায় আমি কানে তুলো দিয়ে থাকতাম। তাঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন জিয়া প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। এর আগে ছেলেদের হাতে আমি তাঁর জন্য একটি সার্ট পাঠিয়েছিলাম। তখন জিয়ার কোনো নামখ্যাতি শুনিনি। খ্যাতি বা অখ্যাতি কিছুই যে তিনি অর্জন করতে পারবেন সেকথা তখন ভাবতেই পারিনি। যদিও তখনই শুনেছিলাম যে কোনো এক নদীতে নৌকার উপরে তিনিই স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করেছিলেন। এ গল্পও আমার উপরে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কালো, রোগা, মুখচোরা অতি সাধারণ বাঙালীর

ছেলে ঘটনাচক্রে কি কীর্তিই না করে বসলেন আর তার কি অমোঘ পরিণতি না ঘটল।

পরে একদিন সুলতানা ও তাঁর মেয়েদের সঙ্গে জিয়া আমাদের জীপে কল্যাণী গিয়েছিলেন। পথে তাঁদের বিতর্ক শুনে বুঝতে পারছিলাম তিনি ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগের উপরে ক্ষুব্ধ। প্রায়ই একটা দ্বিধায় পড়ে যেতাম আমি। মনে হত কি জানি—এরা আমাদের শত্রু ভাবে কি মিত্র ভাবে। কারু কারু ভাব আগে এদের সাহায্যে পাঞ্জাবীদের তো তাড়াই তারপর দেখা যাবে। মনে আছে মিঃ কামরুল হাসান একদিন মিঃ মোমিনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের দেশে যদি ভারতের সৈন্য ঢোকে তাহলে কি জনসাধারণ খুশি হবে?

মোমিন বললেন—না।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম এদিকে অনেকেই বলছে ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠাচ্ছেন না কেন? এরা কি চায়? এরা তো দেখি একমত নয়। আমি লক্ষ্য করছিলাম অধিকাংশ অল্পবয়সী ছেলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। অথচ কার্যোদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগকে একসঙ্গে সকলে ভোট দিয়েছে। কিন্তু এরা হচ্ছে বামপন্থী। এরা তাই অন্তরে আওয়ামী লীগকে মানে না। আমার সামনে সবাই সব কথা বলত। আমি বাংলাদেশের লোক নয় তাও বোধ হয় এরা ভুলে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের 'হলিডে' পত্রিকার সম্পাদক এনায়েতুল্লার দাদা সামাদ শুনেছিলাম খুব কড়া লেফ্‌টিস্ট এবং খুব বড়োলোক। এরা অনেক ভাই। সবাই ব্যবসায়ী এবং ধনী। সামাদ কিন্তু কোনোদিন আমার সামনে আওয়ামী লীগ তথা ভারতের কোনো নিন্দা করেননি। এই দেশের নুন খেতে খেতে এই দেশের গুণ অপহরণ অনেকেই যদিও করেছে। পরে বাংলাদেশে সামাদের বাড়ি দেখেছি। ঢাউস ঢাউস প্ল্যাস্টিক মোড়া সোফা ও ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট দেখে বুঝতে পেরেছি এদের টাকা আছে। এই একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম টাকার সঙ্গে কমিউনিজমের বেশ আঁতাত হয়েছে। এরা যদি কমিউনিস্টই হবে তবে ব্যক্তিগত ভোগ ছাড়তে পারে না কেন? অবশ্য কজন কমিউনিস্ট নিজেকে ডিক্লাস করেছে? মদের বোতল সামনে নিয়ে সাম্যবাদের বক্তৃতা দু দেশেই বেশ শুনেছি।

সেদিন গাড়িতে আর একজন ছেলে ছিল। তার নাম কমল।

সেও যুব বামপন্থী এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী। কিন্তু তার কথাবার্তার

মধ্যে একটা সততা আমাকে আকৃষ্ট করত। অনেকের চেয়ে তার প্রতি আমার স্নেহ প্রবল হয়েছিল। হঠাৎ একদিন সে একটা হ্যাভারস্যাক পিঠে বেঁধে দেখা করতে এল।

দিদি চললাম।

কোথায় চললে?

মুক্তিফৌজে যাই, যদি কিছু কাজে লাগি। কলকাতায় সুখে বসে অফিসের কাজ আর ভালো লাগছে না।

এই কমলের কথা আরও কিছু লিখতে হবে।

আমাদের বসবার ঘরে সন্ধ্যাবেলা যাদের নিয়ে সভা জমত তাদের মধ্যে একজনের কথা উল্লেখ করছি তার স্বভাবের জন্য। সে হচ্ছে শ্রদ্ধেয় লেখক আবুল ফজল মহাশয়ের পুত্র, মন্‌জুর। সে যে কোনো বিশেষ কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য তা নয়। কিন্তু স্বভাবের মাধুর্য, আতিথ্যের জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব—এইগুলি তার বিশেষত্ব। এই সান্ধ্য সভায় প্রায়ই একটা আলোচনা হত যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে জিতে যখন দেশে ফিরবে তখন বিহারীগুলো কি করবে। আমরা জানি বিহারী অর্থ বিহারবাসী। কিন্তু বাংলাদেশীদের কাছে তার অর্থ অবাঙালী, উর্দু ভাষী মুসলমান। প্রায়ই উত্তেজিত আলোচনা শুনতাম—দেশে গিয়ে তারা কি ভাবে বিহারী মুসলমানদের কচুকাটা করবে। নানা ভাবে অত্যাচারের বর্ণনা করে তারা আমায় শঙ্কিত করে তুলতো। আমি তাদের বারবার বলতাম তাহলে এই যে এত কাণ্ড, এত কষ্ট আমরা সবাই মিলে করছি তা কি আর এক দফা মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য?

"ওরা যে করছে?"

এটা কি কোনো যুক্তি? ওরা দানব হয়েছে অতএব আমিও দানব হব —এই কি তোমাদের মত? এ কথার উত্তর এতই সোজা যে তা নিয়ে কি তর্ক-বিতর্ক চলে? কিন্তু কেউ তা মানতে চায় না। প্রচণ্ড তর্ক হত সন্ধ্যাবেলায়—আর সারারাত আমার ঘুম হত না।

যে কাজ শুরু করেছি এর মধ্যে কবিত্ব নেই কিন্তু অন্তরে তো আমি কবি। আমার কাছে তাই এসব কথা যন্ত্রণাদায়ক হত। আমার থেকে থেকে সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ত—যে বলেছিল—কালুটার প্রাণ আর যায়ই না। একবার নৃশংসতার অভ্যাস হলে কি পরিণতি দাঁড়ায় তা এই উপমহাদেশে দেখা যাচ্ছে। কে জানতো অহিংসার মন্ত্রমুখর এই ভারতবর্ষে এত বীভৎসতা

ঘটতে পারে। বিবেকবান নকশাল ছেলেরা একভাবে শুরু করল 'মানুষের ভালো'র জন্য মানুষ মারা। তার প্রত্যুত্তরে পুলিস অকথ্য অত্যাচার চালালো আইন রক্ষার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে। আর আজ তো গ্রাম-গঞ্জ জুড়ে মৃত্যুর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সেদিন বাংলাদেশের ছেলেদের এত ভালবেসেছিলাম বলেই কেবল মনে হত এরাও আবার সেই ক্রূর কর্মে নিযুক্ত হবে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমার আশংকা অমূলক ছিল না। বিহারীদের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশের বেশ কিছুটা মাথা হেঁট হয়েছিল এবং বিদেশে তাদের নিষ্ঠুরতার কথা ভালোমতো প্রচার হয়েছিল।

দেশকে স্বাধীন করার অর্থ যে মানুষকে স্বাধীন করা তা বোধ হয় কোনো দেশেই যুদ্ধকালে মানুষ বোঝেনি। তবে মানতে হবে প্রতিহিংসা মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বড়ো ধর্ম ক্ষমা। এ বিষয়ে পরে কিছুটা আলোচনা করতে হবে। এখানে সূত্রপাত করলাম।

আমি লিখেছি দেওয়ারা ক্যাম্পে যাবার জন্য রওনা হয়েও আহত ব্যক্তিদের নিয়ে বনগাঁ ফিরে এসেছিলাম। অনেকদিন অরুণের কোনো খবর পাইনি। হঠাৎ কে একজন বললে দেওয়ারা ক্যাম্প বন্যায় ভেসে গেছে। অরুণ একবার আপনাকে যেতে বলেছে। কি করে কোন্ পথে দেওয়ারা গিয়ে পৌঁছলাম মনে পড়ছে না। দূর বেশী নয় তবে রাস্তা জলে কাদায় দুর্গম। জীপও কষ্টে চলেছে। আমার সঙ্গে দু-তিনটি ছেলে। আমি একটা জীপে যা কিছু ধরে জামা-কাপড় নিয়ে যাচ্ছি। ট্রেলার চালানো অসম্ভব। বহু পথ চলে নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নিচে গাড়ি থামলো। আর গাড়ি নয়, এবারে নৌকোয় ওপারে যেতে হবে। ওপারে দেওয়ারা ক্যাম্প। গাছের নিচে কাদার হাত এড়িয়ে মোটা মোটা শিকড়ের উপরে দাঁড়িয়ে ভাবছি এখানে বোধহয় বাংলাদেশের লোকেরা তাদের মনোমত স্থান পেয়েছে। যেন ঠিক আমাদের গৈলা গ্রামের খাল যেখানে এসে নৌকো ভিড়ত। আমার বরাবর মনে ছিল নদীর ধারে একটা ক্যাম্প করব। কিন্তু এ ক্যাম্পের কাজ শুরু হতে আমি কল্যাণীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, আসতে পারিনি। তখনও বুঝতে পারিনি যে ক-দিন আগে বন্যার কি তাণ্ডব হয়ে গেছে এখানে। সত্তর হাজার ক্যাম্পবাসীকে ওপারে উচু জায়গায় নিয়ে যেতে হয়েছে। এরা দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা হয়েছে। নৌকা চড়ে ওপারে চললাম। এখানে ওখানে দ্রুত ধাবমান জলে ভেসে যাচ্ছে মরা গরু মোষ। সেই কুদৃশ্যগুলি পেরিয়ে গেলেই জলের সৌন্দর্যে

চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে দেখলাম তুর্গন্ধ কম, পায়খানাগুলোর ব্যবস্থা ভালো। ঐ একটা কথাই তো কাউকে বোঝাতে পারছিলাম না যে জলে মূত্র-পূরীষ ত্যাগ কোরো না।

ওপারে অরুণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। হেঁচড়ে হেঁচড়ে উঁচু পাড় বেয়ে উঠলাম। আমার পক্ষে সেটা কম কষ্টকর ছিল না। বারেবারেই দেখেছি মনের উৎসাহ হাতে পায়ে জোর এনে দেয়। ওপারে দেখলাম বেশ কিছু গাছপালা লাগানো হয়েছে। অনেক কলাগাছ। ক্যাম্পের মতো নয় বেশ গ্রাম-গ্রাম চেহারা। অরুণ বললে—আপনার প্ল্যান অনুসারে এখানকার ক্যাম্প হয়েছে। এখানেও ছোলমেয়েদের জন্য স্কুল এবং মেয়েদের জন্য সেলাই-সমিতি করেছি। পায়খানাও ঠিকভাবে করিয়েছি। সেইজন্য আপনাকে বারবার ডাকছি, আপনার প্ল্যান কিরকম হল দেখুন।

আমার খুবই ভালো লাগলো যে একজন কারু মনে ধরেছে আমার পরিকল্পনা এবং সে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এর পরে যুদ্ধ থেমে গেলেও অরুণ আমার সঙ্গে নানা কাজে যুক্ত থেকেছে।

দেওয়ারা ক্যাম্প থেকে ফেরবার পথটা যে ঠিক কোনদিকে ছিল মনে করতে পারছি না। চোখের সামনে আসছে অনেকটা রুক্ষ জনহীন প্রান্তরের মধ্যে মাইলের পর মাইল চলেছি, ভাবছি এই নির্জন রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে সাহায্য পাওয়া মুশকিল হবে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে তিন চারজন মিলে নিয়ে চলেছে। তার মাথা ও গাল থেকে রক্ত পড়ছে। আমি গাড়ি থামালাম।

—ওকে মেরেছ কেন? এমন করে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

—ব্যাটা শত্রুর চর।

—কি করে জানলে?

—টিউব-ওয়েলের কাছে ঘুরঘুর করছিল। বোধ হয় বিষ মেশাচ্ছিল।

—ওর কাছে বিষ পাওয়া গেছে?

—না না, বিষ পাওয়া যাবে কেন? টিউব-ওয়েলের পাশে ঘোরাফেরা করছিল কেন তাহলে?

এই রকম সন্দেহের ঢেউ তখন সর্বত্র। টিউব-ওয়েলে কোনো আগন্তুক জলও খেতে যেতে সাহস করত না। টিউব-ওয়েলের মাথা খুলে বিষ ঢেলে দিচ্ছে এই রকম সব কথা শুনতে পেতাম খুব।

আগে লিখেছি সুভদ্রা যোশী বলেছিলেন—মুক্তিফৌজের ক্যাম্প দেখব। তিনি তো এম· পি· আমার চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী। কিন্তু সেভাবে তো হবে না। সরকারীভাবে কিছুই হবে না। আমাদের সরকার তো জানেই না যে এখানে মুক্তিফৌজের ড্রিল চলেছে। কোথায় মুক্তিফৌজ কে জানে। বাংলাদেশে যে কেন লড়াই হচ্ছে তাও ঠিকমতো জানা নেই। শুধু আমাদের সরকার জানে যে দশ মিলিয়ন শরণার্থীকে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত খাওয়াতে হবে, মাথার উপরে আশ্রয় দিতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে এবং প্রচুর সমালোচনা শুনতে হবে।

আমাদের চেনা একটি ছেলে, তার নাম মহবুব। তার কাঁধে গুলি লেগেছিল। কল্যাণীতে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে অনেকবার আমাকে তাদের ক্যাম্পে যেতে বলেছিল। সেইজন্য সুভদ্রা যোশীকে নিয়ে তারই ক্যাম্পের দিকে রওনা হওয়া গেল। এপারে গাড়ি রেখে ইছামতী নদী নৌকোয় পার হলাম। ইছামতী তখন বর্ষার জলে থৈ থৈ করছে। আমি রোদ্দুরের জন্য মুখ ঢেকেছি। আর সুভদ্রা মুখ ঢেকেছে তার পরিচয় গোপনের জন্য। সুভদ্রা এত সুন্দরী যে তাকে একবার দেখলে লোকের চিরকাল মনে থাকবে। তাই চিনতে পারা অসম্ভব নয়। নৌকো চড়ে ওপারে পৌঁছে খানিকটা হাঁটতে হল। একটা প্রশস্ত আমবাগানের মধ্যে ক্যাম্প—বেশ বড়ো ক্যাম্প। অনেক ছেলে থাকে, আমার যতদূর মনে পড়ে বাদশাও সেখানে ছিল। অনেক ছেলে 'অ্যাকশনে' চলে গেছে। আমি তো এদের শুভার্থী। কিন্তু অ্যাকশনটা যে কি তা মনের সামনে আনি না। একটা নরম মানুষের দেহে বেয়নেট ঢুকে গেল—একথা মনের সামনে আনলে আমার মতো মানুষ কি কোনো কর্তব্যে স্থির থাকতে পারে? গীতা-টীতা আমার কোনো কাজে লাগবে না। বারবারই ভাবি এ সব কথা মনে আনব না। যুদ্ধ তো করতেই হবে।

আগে থাকতেই জানা ছিল যে আমরা আসব, তাই কিছু ছেলে বাংলাদেশে গেছে আমাদের জন্য মাছ আনতে। যে লোকটি এদের রাঁধে সে খুব ভালো রাঁধুনি। মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে এসে ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের উৎসাহ দেখে সারাজীবন খদ্দরধারিণী গান্ধীশিষ্যা সুভদ্রারও উৎসাহ বেশ বেড়ে উঠেছে। সে বললে—আজ একটু বাংলাদেশে ঢোকা যায় না? তোমরা তো মাছ ধরতে যাচ্ছ, কোথায় মাছ ধরো?

ছেলেরা বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব যাওয়া যায়। খাওয়াদাওয়া করে ঘুরে আসি মুক্ত এলাকায়।

খাওয়ার ব্যবস্থা সেদিন খুব ভালো হয়েছিল। চমৎকার পরোটা ও চিংড়ি মাছ—বাংলাদেশে সদ্য ধরা রসনাতৃপ্তিকর। খাবার টেবিলে যখন সব সাজিয়ে আনা হয়েছে—দু তিন রকম মাছ ও পরোটা, সুভদ্রা মুচকি হেসে বললে সে মাছ খায় না। অথচ মাছ ছাড়া কিছুই নেই। তখন রান্নার লোকটি তাড়াতাড়ি করে আলু ভেজে দিল। ঝুরুঝুরু একথালা আলুভাজা, দেখলে মাছ ফেলে আলু খেতে ইচ্ছে করে।

খাবার পর ঠিক হল ছেলেরা আমাদের নিয়ে ছবি তুলবে। চারদিকে অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত হয়ে ছবি তোলা হল। অত অস্ত্র জীবনে দেখিনি। ছবিটা হারিয়ে না গেলে অভিনব হত। আমরা দুই ঘোর শান্তিবাদী মানুষ এত অস্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ছবি তোলা হলে আমরা ভাবলুম যাই একবার বাংলাদেশের মাটি ছুঁয়ে আসি। আমার সোনার বাংলা গান করতে করতে আমবাগানের ঠাণ্ডা ছায়া থেকে বেরিয়ে অনেকটা মাঠ পেরিয়ে এগোচ্ছি— দূরে দেখি একখানি বাড়ি। আমাদের সঙ্গীরা বললে—একটু দাঁড়ান। ঐ বাড়িটায় ঘুরে আসি।

আমরা মাঠের মধ্যে মাথায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রচণ্ড মেঘভাঙা রোদ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। বুঝতে পারছি না ওরা আমাদের দাঁড় করিয়ে গেল কোথায়। কিছু পরে দুটি ছেলে ফিরে এল। হতাশ ভাবে তারা বললে ঐ বাড়িটা হচ্ছে বি· এস· এফ. (Border Security Force)-এর ক্যাম্প। তারা পাহারা দিচ্ছে। ইণ্ডিয়ান আর্মির অনুমতি ছাড়া আমরা কেউ পরের দেশে ঢুকতে পারব না। সুভদ্রা বললে—যাও বলো, সুভদ্রা যোশী ঢুকতে চায়। নাম শুনে তারা আরও চমকে উঠেছে। বললে—একজন এম· পি·? তাঁকে ঢুকতে দেওয়া তো অসম্ভব। যদি কিছু হয় দেশ-বিদেশে হৈ চৈ পড়ে যাবে। ভারতের এম· পি· কি কারণে পাকিস্তানে ঢুকেছে? নিশ্চয় কোন মতলব আছে। সে মতলবটা কি? তা নিয়েও নানা গাবষণা হবে যদিও কেই বা বিশ্বাস করবে যে মতলবটা কিছুই নয়,—এই যে একটা অভিনব ঘটনা ঘটছে তার সাক্ষী হওয়া মাত্র। সুভদ্রা ক্ষুণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও। সেবার স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা দেওয়া আর হল না।

মুক্তিফৌজের জলীয় যুদ্ধের কথা তখন বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনতাম। চট্টগ্রামের সমুদ্র-মোহানায় যুদ্ধ চলেছে। ফ্রগ-ম্যান কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। জলের তলায় ডুবে ডুবে যুদ্ধের জাহাজ ফুটো করে যারা তারাই ব্যাং। গেরিলা যুদ্ধের এই ব্যাপার। সমস্ত সাংঘাতিক বৃহৎ মারণাস্ত্রকে নস্যাৎ

করে দেয়। মাছি যেমন বিরাট ষণ্ডকে উৎপাত করে পাগল করে তুলতে পারে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই জিনিসটি দেখেছি অর্থাৎ শুনেছি। আর সমস্ত রূপকথার গল্পই তো এই সব কাহিনীতে ভরা। দৈত্যেরা কি রকম করে ছোট্ট ছেলের হাতে ঘায়েল হয়ে যায়। সমস্ত রূপকথার মতো গেরিলা যুদ্ধেরও বোধ হয় এই মর‍্যাল যে শরীরের শক্তি নয়, জয় করে মনের শক্তি। তা ছাড়াও একটা কথা আছে। "যতো ধর্মোস্ততো জয়"। আমাদেরও এই বিশ্বাস ধর্মেরই জয় হবে, অধর্মের নয়। বাংলাদেশের ছেলেরা ধর্মযুদ্ধ করছিল অর্থাৎ যে কারণে তারা লড়ছিল সেটা আদর্শগত। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার এবং **Secularism** ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। অপর পক্ষে পাকিস্তান লড়ছে তাদের অধিকার এবং ধর্মান্ধতা ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য। এ দুয়ের মধ্যে তফাত আছে। কিন্তু সেই বাংলাদেশের ছেলেরাই আবার সুযোগ পেয়ে যখন অন্য মূর্তি ধরল তখন এই আদর্শের কথাটা ফিকে লেগেছিল।

দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের ছবিটা সেদিন কিন্তু অত্যন্ত সত্য বলে মনে হয়েছিল। তাই অনেক সময় এমন বেপরোয়াভাবে ওদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি যা আজ মনে হয় বাড়াবাড়ি।

যে সব মুক্তিফৌজের ছেলে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে আহত বা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত খুব বেশী দেখিনি। ক্যাম্পে ক্যাম্পে সুস্থ মানুষদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে বেশী।

এমন সময় হঠাৎ মেজর ডালিমের খ্যাতি শুনলাম। বাংলাদেশের মেয়েরা তার অনেক প্রশংসা করলেন। সে পাকিস্তান আর্মি থেকে পালিয়ে রাজপুতানার মরুভূমি পার হয়ে ছদ্মবেশে ভারতীয় ঘাঁটিতে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। তার হাতের তালু ফুটো হয়েছে পলাতক অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে। একেবারে রোমাঞ্চ উপন্যাসের ঘটনা। আমাদের মতো গৃহস্থ মানুষদের অভিজ্ঞতায় এমন গল্প অভিনব। সেই যোদ্ধবীরের বীরত্ব কাহিনী সবিস্তারে শুনে শুনে আমরা তার প্রতি খুবই আকৃষ্ট বোধ করছিলাম। শুনলাম সে আহত হয়ে এসে কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারীর বাড়িতে আছে। ঐ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল এবং বিবাহের কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু এখন কন্যার পিতামাতা পিছিয়ে গেছেন। তাঁদের এখন মনে হচ্ছে পাকিস্তান আর্মির উচ্চপদ ও বাউণ্ডুলে মুক্তিফৌজের সৈনিকের মূল্য এক নয়। এদিকে বাংলাদেশের অল্পবয়সী মেয়েরা ডালিমের

ভবিষ্যৎ শ্বশুর-শাশুড়ির এহেন ক্ষুদ্রতায় মর্মাহত। যে বীরের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে নারী কৃতার্থ হবে, যার চিরকালের প্রার্থনা কবির ভাষায়—

"চাহে নারী তব রথ সঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।"

তাকেই কিনা প্রত্যাখ্যান? মেয়েটির সখীরা এতই উত্তেজিত যে তারা আমাদেরও উত্তেজিত করে তুলেছে। আমরা তো এই প্রণয়ীযুগলের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। শুনছি কন্যার মাতাপিতা বলছেন যুদ্ধটা মিটে যাক—যুদ্ধের মধ্যে আবার বিয়েটিয়ে কেন? আর এ বাঁচবে কিনা তারই বা ঠিক কি? আসন্ন মৃত্যুর মুখে যে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রশংসা করা চলে কিন্তু তাকে কন্যাদান করতে কেই বা উৎসাহী হবে? এই নিয়ে দিন পনের খুব আলোচনা চলছে। এর প্রধান নেত্রী শ্রীমতী সুলতানা খুব হাঁটাহাঁটি করছেন। তাঁর মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত। তারা আমাকে বললে যে পাত্রী বলছে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে বলেই তো এখনি বিয়ে করতে চাইছি। কথাটা আমার মনে খুব লেগেছিল। এ যে সাবিত্রীর মতো কথা বলছে। সাবিত্রী যখন শুনলো যে তার মনোনীত পতি সত্যবানের মাত্র এক বছর আয়ু তখন কি সে বলতে পারতো না তাহলে একে বিদায় দিয়ে বেশ একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ খোঁজা যাক। কিন্তু তাহলে তো সে আর সাবিত্রী হত না। বহু যুগ ধরে এই কাহিনী হিন্দু সমাজে প্রেম ও সতীত্বের একটি আদর্শ হয়ে আছে। কিন্তু কাজের বেলায়? মাতাপিতার অমতে এমন খেয়ালীপনা করতে গেলে ডাণ্ডা পিঠে পড়ে। তাই আমার এই মুসলমান সাবিত্রীর প্রতি বেশ খানিকটা সহানুভূতি জন্মালো। তারপর একদিন সকালবেলা আমাকে পূর্বে কিছু না জানিয়েই মেজর ডালিম ও তার প্রণয়িনী নিম্মি, আরতি সেন, শ্রীমতী সুলতানা ও তাঁর মেয়েরা আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। এসেছিলেন আরও অনেকে। যা শুনলাম এরা চাতুরী কম করেনি। একদল গিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করেছে, অন্যদল পিছন দরজা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে পিঠটান। সোজা আমার বাড়ি। ওদের মনে হয়েছে আমার বাড়িটাই সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে নিম্মির মা-বাবা সন্দেহ করে আসবেন না।

দুপুরের মধ্যেই করিৎকর্মা মেয়েরা সব বন্দোবস্ত করে ফেললো। নূতন জামাকাপড় এলো, শাড়ি এলো এবং সর্বোপরি যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ কাজী-সাহেব এলেন। সে প্রবাদবাক্য সফল করে তাঁর কর্তব্য নিষ্পন্ন করলেন।

মিয়া বিবি রাজী তো কি করবে কাজী? যদিও আমার বাড়িতেই বিবাহ

নিষ্পন্ন হল, তবু আমার ভূমিকা ছিল দর্শকের ভূমিকা মাত্র। ওরা কয়েকদিন লুকিয়ে কোথাও থেকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে তারপর আত্মপ্রকাশ করল। ওরা যে কোথায় ছিল তা আমি জানতাম না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ সেই একটি দিন মাত্র। অবশ্য সেটা তাদের জীবনের একটা বিশেষ দিন, অবিস্মরণীয় দিন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঐ দিনটা আমার পক্ষেও বেশ অবিস্মরণীয় হয়ে দাঁড়ালো। ডালিম পরে যে ভয়ানক কুকীর্তিটি করল আমি যেন তার অংশীদার হয়ে পড়লাম। মুজিবর রহমান—যিনি সে সময় বিশ্ববন্দিত মানুষ, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম, খ্যাতি ও প্রশংসা, সুদূর স্পেন দেশে তাঁর নামে গান বাঁধা হয়েছে—ভিভা মুজিবর—সেই মুজিবর কেমন মানুষ, কি তাঁর শক্তি ক্ষমতা পৃথিবীতে কেই বা তা জানে। সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে বরণ করে নিয়েছে পিতা বলে, জাতির পিতা বলে।

তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা করা সে সময়ে সহজ ছিল না। এরা যে তাঁর বিরোধী তাও জানতাম না। তবে যতদূর মনে হয় ডালিম সে সময় মুজিব-বিরোধী ছিল না। তার কোনো স্পষ্ট পলিটিক্যাল মতামত ছিল বলেও সে সময় মনে হয়নি। সে ছিল সৈনিক। কিন্তু অন্যান্য অনেকের মতামত যেমন জিয়া, জামান, কমল, সামাদ ইত্যাদি অনেকেই স্পষ্টতই মুজিব-বিরোধী ছিল তা বুঝতে পারতাম। এরা তথাকথিত লেফ্‌ট। অনেক লেফ্‌টই তখন দেখলাম। ধনী, ব্যবসায়ী, মদ্যপায়ী, ফ্যাশনদুরস্ত,—বাড়িতে টেবিল-চেয়ার, চৌকি কৌচের বাহার, কেউ এতটুকু অসুবিধা সহ্য করতে পারে না কিন্তু দরিদ্রের দুঃখে অভিভূত।

একটা পার্টিতে বিখ্যাত লেফ্‌ট এবং ভারত-বিরোধী কাগজ 'হলিডে'র সম্পাদককে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে দেখেছিলাম। উপরে যা লিখেছি তাঁকে আমার তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মনে হয়েছিল। তিনি মুজিবের প্রচণ্ড নিন্দা করছিলেন প্রচুর মদ্য সহযোগে। তা মদ্য পান করলে কি লেফ্‌ট হওয়া যায় না? লেনিন কি মদ খেতো না? শুধু প্রশ্ন এই যে, অর্থটা অকারণ বিলাসিতায় খরচ হচ্ছে বা সময়টা নিরর্থক কাজে নষ্ট হচ্ছে সে কথাটা মনে পড়ে না কেন? প্রবাদবাক্য তো এই—আপনি আচরি ধর্ম অন্যেরে শিখায়। তা অলস জমিদার যা করে কম্যুনিস্টও যদি তাই করে তাহলে কে বা কাকে ধর্ম শেখাবে? সত্যি বলতে কি এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই অনেক দেশপ্রেমের চর্চা হয়েছে এবং দরিদ্রনারায়ণের কথা ধনীরা অনেক বলেছেন।

কিন্তু তাদেরই ভারাক্রান্ত পিঠের উপর পা রেখে অনেকে রাজনীতির উচ্চ মঞ্চে উঠেছেন। একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কেউ বেশভূষায় নিজেকে 'ডিক্লাস' করেননি। শুধু তিনি এবং তাঁর কতিপয় অনুগামী নিজের নিজের জীবনচর্যার মধ্যে পরিবর্তনের কথা ভেবেছেন।

যা হোক সে সময় আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার কথা কেউ ভাবছিলেন কিনা জানি না। অন্তত আমাদের সামনে প্রকাশ্যে কেউ আলোচনা করেন-নি। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো আমার প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। দলে দলে সবাই তো নিয়ে গেল। কোনো সমালোচনা শুনিনি। মুজিবর রহমান সম্বন্ধে উৎসাহেরও বিশেষ অভাব দেখিনি। এই একই রকম ভাবে মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের জোর কিছু বাড়লেও এভাবে যে বাংলা-দেশকে স্বাধীন করা যাবে তা কারুর মনে হয়নি। তবে একটা কাজ খুব ভালো ভাবে করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের যোদ্ধা এবং অযোদ্ধা মানুষরা। সেটা হচ্ছে প্রচার। বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার চালাতে বিশেষভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা। পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম দেশের জনসাধারণ বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে হাহাকার করে উঠেছে। জোয়ান বোজের গান "বাংলাদেশ বাংলাদেশ" আমেরিকার মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরেছে। বহু প্রতিষ্ঠান এই ভারতে এসেছে বাংলাদেশের জন্য কাজ করবার আগ্রহে।

এর মধ্যে 'অপারেশন ওমেগা' বলে একটি দলের কথা খুব মনে পড়ে। তাদের বক্তব্য ছিল তারা ওষুধপত্র নিয়ে আর্তের সেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকবে। পাসপোর্টের পরোয়া করবে না। তাদের সম্বল দুটি ভ্যান, কিছু সাহসী ছেলেমেয়ে এবং ওষুধপত্র। পাকিস্তান সরকার তাদের চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি। ভারত সরকারও বলে দিয়েছে এভাবে পাকিস্তানে ঢুকলে তারা কোনো দায়িত্ব নেবে না। তারা অবশ্য কারুর উপরে দায়িত্ব চাপাবার জন্য ব্যস্ত নয়। এদের মধ্যে ক্রিস্টিন বলে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মানুষের মধ্যে দুর্গম স্থানে যাবার, অসীম সাহসের কাজ করার যে প্রবণতা আছে সব সময় তার পথ থাকে না। কেউ তো আর উন্মাদ নয় যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু বাংলাদেশ যেন মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবার একটা পথ করে দিয়েছিল। এরা যে কতোবার বেনাপোল দিয়ে যশোরে ঢুকেছে, সেখানে জেল খেটেছে এবং তাদের জোর করে ফেরত দেওয়া হয়েছে তার ঠিক নেই। এই সব কাহিনী দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছে। দেশে দেশে লোকে বক্তৃতা করে ফিরেছে। ফলে সারা ইউরোপ বাংলাদেশের দেশ-

ত্যাগী মানুষকে ঘরে আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। এই সুযোগ নিয়েছে অনেক বাংলাদেশী যুবক ও প্রৌঢ়। মুখে দেশপ্রেমের বুলি ও নির্যাতনের কাহিনী নিয়ে ইউরোপের আরামের ঘরে সানন্দে নিখরচায় দিন কাটিয়েছে ও কাটাচ্ছে তারা। উনিশশো বিরাশি সালেও সুইডেনে বেশ কিছু এ রকম ছেলে দেখলাম। সুইডেনে এক পাদ্রীর বাড়িতে একটি অল্পবয়সী ছেলে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সে নাকি দেশে গেলেই মারা পড়বে। আনাচে কানাচে শত্রুরা ঘুরছে। পাদ্রী দম্পতি তাকে ছেলের মতো যত্নে রেখেছেন। যারা নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনকে স্থান দেয় না তারা বাংলাদেশের ছেলে হলে দু হাত বাড়িয়ে ঘরে টেনে নিয়েছে। এটা যে প্রচারের নিপুণতাবশতঃই ঘটতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশে আরামে নির্ভয়ে কাজ করা এক কথা আর দেশে বা সীমান্তে গোলাগুলির সামনে জলে কাদায় প্রায় অনাহারে যুদ্ধ করা অন্য কথা। সেইজন্য বেশ কিছু মানুষ প্রথম পথটি বেছে নিলেও দেশপ্রেমিক বলে কম কৃতিত্ব পায়নি।

কঠিন ও দুর্গম পথে যাত্রা করে যারা বীরত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত হয়েছেন এ রকম অনেকে আছেন। তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন গিয়াসের কথা খুব মনে পড়ে। সীমান্ত রেখা বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। কর্নেল জামান মালদা সেক্টরে কাজ করছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন ও খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুলতানা জানান মালদায় তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে সেখান থেকে বাংলাদেশের ভিতরে একটি ছোট ক্যাম্প হাসপাতাল খুলেছিলেন। তাঁর একখানি চিঠির অংশ এখানে তুলে দিলাম। এর থেকে তখনকার অবস্থাটা বেশ বোঝা যাবে কি ধরনের কাজ চলছিল। এই চিঠি লেখা হয়েছে ৩০।১১।৭১ তারিখে। এর খুব সামান্য কয়েকদিন পরে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

রেহানী ব্রাদার্স
টুরিস্ট লজ
মালদহ

শ্রদ্ধেয়া মৈত্রেয়ীদি,

...হাসপাতাল আরম্ভ করার কতোখানি বাধার সম্মুখীন আমরা হয়েছি তা এতদিনে গৌরীমাসীর কাছে জানতে পেরেছেন হয়তো। যাক আমরা শেষ পর্যন্ত হাসপাতালটি বাংলাদেশের ভিতরেই খুলেছি। নাদিম যে ক্যাম্পে

রয়েছে সেটি বাংলাদেশের। জায়গার নাম মেহেদীপুর। ভারি সুন্দর জায়গা। চারিদিকে গ্রাম, ধানক্ষেত ও পুকুর। ওরা রোজ মাছ ধরে খায়।...আপনি এলে আমরা সবাই খুব খুশী হতাম আর আপনারও ভালো লাগতো। এখানে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার রয়েছেন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। ভীষণ dedicated আর সাহসী। আমাদের সামনেই ওরা দু'তিনবার বড়ো Operation-এ গেল। ঈদের দিন প্রায় ছজন মারা গেল আর প্রায় আট দশজন আহত হল। ওরা আমাদের সামনেই রওনা হয়েছিল। এসব দেখে অবশ্য খুব বেশী মন খারাপ হয়ে যায়। তিনচার দিন আগে এক Operation-এ নাদিমের Sprinter লেগেছে হাতে।...

জামান এখানে মাঝে মাঝে আসে। জামান বলছেন কর্নেল লুথরাকে জানাতে যে কর্নেল লুথরার পাঠানো একটা ambulance ওরা পেয়েছে। তাছাড়া ওরা কিছুই পায়নি। যে কম্বলগুলি ঐ ট্রাকে পাঠানো হল ওগুলোও পায়নি। আর আমাদের সামনে মিঃ সরকার (এখানকার C.R.O.) কলকাতায় ডঃ বনোয়ারীলালের সামনে বলেছিলেন 37 Packages of Medicine রায়গঞ্জে এসেছে। তখন ডঃ বনোয়ারীলাল বলেন ওগুলো কর্নেল জামানের সেক্টরে দিয়ে দিন। আমরা রোজই লোক পাঠাচ্ছি রায়গঞ্জে মিঃ সরকারের কাছে। উনি কিছুতেই দেবেন না। বলছেন distribution list আমরা পাইনি। আপনি কর্নেল লুথরাকে জানালে ভালো হয়।

...ওকে বারবার বিরক্ত করতে লজ্জা করে। অবশ্য ওষুধের খুব বেশী প্রয়োজন। কটন উল ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি খুব দরকার। আপনি CASA কিম্বা Save the Children Fund থেকে কিছু ওষুধপত্র যোগাড় করতে পারবেন কি?

...আমাদের খেলাঘর কেমন চলছে? সত্যি "খেলাঘরটা"কে আমাদের বড়ো নিজের মনে হয়। প্রত্যেকটি বাচ্চার চেহারা মনে পড়ে।...সব সময় খেলাঘর আর আপনার স্নেহ-ভালোবাসার কথা মনে করি। আপনার সাথে কাজ করতে গিয়ে আপনি আমাদের সবাইকে এমন আপন করে ফেলেছেন যে আজ ভারতবর্ষে আত্মীয় বলতে আপনাদের কথাই মনে পড়ে।

রেডিওতে সব সময় শুনি যশোহরে যুদ্ধ হচ্ছে—বয়রাতে যুদ্ধ হচ্ছে—আমাদের ছেলেদের কোনো খবর পেয়েছেন কি? বাদশা অথবা Major Manzoor-এর কাছ থেকে খবর পেতে পারেন।...

...একবার আপনাকে মালদহ আসতেই হবে।

ইতি স্নেহের সুলতানা।

৩০।১১।৭১

সুলতানার এত অনুরোধ সত্ত্বেও মালদা আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাজসাহী বর্ডারে লালগোলায় ক্যাপ্টেন গিয়াসের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানেও কম্বল ও ওষুধপত্রের অভাবে অসুবিধা হচ্ছিল। কর্নেল লুথরার কাছ থেকে একটা বড় ম্যাটাডর ভর্তি করে কম্বল জামা-কাপড় ও ওষুধপত্র নিয়ে অতি প্রত্যুষে আমি ও গৌরী লালগোলার দিকে রওনা হলাম। গৌরীর আশা ছিল সেই দিনই ফিরে আসবে। কিন্তু আমি জানতাম তা হবে না। পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। পথে ঈপ্সিতা গুপ্তার বাড়িতে খাওয়া হল। ঈপ্সিতা বহরমপুর থেকে 'জনমত' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে জিনিসপত্র পাঠানো এবং নানা-ভাবে মুক্তিফৌজদের সাহায্য করতেন। কতো মানুষ যে প্রাণপণে সময় ও ক্লেশ দিয়ে এই যুদ্ধের সঙ্গী হয়েছিলেন তার খবর আজ কে রাখে। বাংলার সব মানুষ যেন এক বাঙালীত্বের অনুভবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যেন এতদিন পরে বাংলার ঘরে যতো ভাইবোন এক হয়েছে। নূতন বন্ধু ঈপ্সিতা পরে আমাকে আরও কিছু সাহায্য করেছিলেন।

লালগোলা মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। একটা ছোট্ট দুখানা ঘরের বাংলো বাড়ি। সামনে একফালি বারান্দা। সঙ্গে আউট-হাউস ও বাবুর্চিখানা যথারীতি একটু দূরে।

বারান্দায় আমাদের কম্বলের স্তূপ নামানো হল। গাড়ির মাথা থেকে, ট্রেলার থেকে বাক্স বাক্স ওষুধও জড়ো হল। গিয়াস খুবই খুশী। ওরা ভেবে-ছিল আমরা দুপুরে আসব। তাই বাংলাদেশ থেকে এনে দু-তিন রকম মাছও রান্না করেছিল। সেই মাছই রাত্রে খাওয়া গেল।

লালগোলা ও রাজশাহীর মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া গঙ্গা বয়ে চলেছে। তা পার হয়ে ওপারে রাজশাহীতে এরা মুক্তাঞ্চল করেছে। এবং সেখানে এদের প্রত্যহ যাতায়াত সেখানেই এরা মাছ আনতে যায়। বাংলাদেশের মাছের যেমন খ্যাতি তেমনি খ্যাতি মাছ রান্নার। গিয়াসের বাবুর্চিও তেমনি রেঁধে-ছিল। আমরা ভালোভাবেই আপ্যায়িত হলাম। ঠিক হল পরদিন সকালে স্পীডবোটে করে আমরা ওপারে রাজশাহী যাব। সেখানে দুদিন আগে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার কবর হয়েছে। সেই কবরে আমরা ফুল দেব। সন্ধ্যে-বেলা আমরা বারান্দায় বসে আছি। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। আমার আশ্চর্য লাগছে এ কোন কাজে কোন জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

ক্যাপ্টেন গিয়াস ছেলেটি চমৎকার। যেমন সুশ্রী তেমনই মিষ্টভাষী ও

ভদ্র। তিনি বলছিলেন কয়েকদিন আগে তিন-চারটি মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ এখানে আনা হয়েছিল। সেইদিন অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কয়েকজনকে নিয়ে একটি ট্যাক্সি করে কলকাতা থেকে এসেছিলেন। তাঁরা ঐ সব মৃতদেহ দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। রাজশাহী এখন মুক্ত অঞ্চল। আমি বসে বসে গল্প শুনছি আর মনে হচ্ছে কাছেই কোথা থেকে একটা কাতরানি, গোঙানির শব্দ আসছে। আমার এক কান গিয়াসের কথা শুনছে, অন্য কান আর একটা শব্দের দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

গিয়াস, কে কাতরাচ্ছে? গিয়াস চুপ।

তার চৌকস চাপরাশি বলছে—ঐ ছয়টা রাজাকারকে পিটাইয়া হাড়গোড় ভাইংগা ফ্যালাইয়া রাখছে। এখনও মরে নাই।

আমরা স্তম্ভিত। এই এতক্ষণ রাজাকার ও পাকিস্তানীদের অত্যাচারের বর্ণনা শুনছিলাম। সেদিন যাদের মৃতদেহ দেখে দিলীপ চক্রবর্তী কাতর হয়েছিলেন তারা বাঙালী গোরিলা যোদ্ধা বলে কি আমাদের বেশী আপনার? এরকম চললে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের তফাত কোথায়? মনুষ্যত্বের যদি উদ্বোধন না হয় তবে কিসের জন্য এই যুদ্ধ? এটাও যদি অধর্মযুদ্ধ হয় তবে আমরা তার সামিল হয়েছি কেন? আমি খুব বিচলিত হয়েছিলাম। বলতে লাগলাম—গিয়াস, যুদ্ধের নিয়ম নয় যে বন্দী সৈন্যদের উপর অত্যাচার করবে। এটা ভীষণ বর্বরতা।

গিয়াস বললে—আমরা মারিনি। বন্দী করে আনবার সময় দুদিকের জনতা মেরেছে। আনতে আর দেয় না।

এটা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ ছিল না। এই উপমহাদেশে মারমুখী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য জনতার হিংস্র পশুবৎ আচরণ দেখার দুর্ভাগ্য আমার পূর্বে অনেকবার হয়েছে। এবং এখন এসব ঘটনা বেড়েই চলেছে। তখন আমি গিয়াসকে অনুরোধ করলাম ডাক্তার ডাকতে। গিয়াস বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকা হবে।

তার ভৃত্য বললে—ডাক্তার? ডাক্তার ডাকুম? এক ফোটা জল পর্যন্ত দিমু না!

আমরা বুঝতে পারলাম ওর কথাই ঠিক হবে। লোকগুলি যন্ত্রণায় কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে তৃষ্ণাকাতর হয়ে অনাহারে অচিকিৎসায় মরে যাবে।

সেদিন রাত্রিটা আমার বড়ো অস্বস্তিতে কেটেছিল। আমি যেন এক

অন্ধকার দুর্ভেদ্য দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পথের নিশানা দেবে কে? এখন আমি নিঃসন্দেহে বুঝেছি কোনো যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না, নিষ্কলঙ্ক হতে পারে না। বাংলাভাষার জন্যই হোক, বাঙালী জাতীয়তার জন্যই হোক, গণতন্ত্র অথবা Secularism প্রতিষ্ঠার জন্যই হোক—যে কোনো মহৎ কারণেই যুদ্ধ হোক মানুষের মনে তা অকারণ নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা জাগিয়ে তোলে। ফলে মনুষ্যত্ব নিহত হয়, শত্রু নয়। এই পুরোনো সত্যটা নূতন করে শিখলাম। সমস্ত চিরন্তন সত্যই মানুষকে বারবার নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। আমার মনের কষ্টিপাথরের দাগগুলি আমায় বলছিল, তোমার সব পরিশ্রম বৃথা। এ শুধু একটা উচ্ছ্বাসের ঝোঁক। হয়তো ইংরেজীতে যাকে Euphoria বলে তাই।

পরদিন সকালে উঠে জীপে করে আমরা গ্রামের মধ্য দিয়ে নদীর তীরে পোঁছলাম। নদী একেবারে তীর ছুঁয়ে চলেছে। খরস্রোতা সুন্দরী গঙ্গা ছোট ছোট বীচিভঙ্গে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশের অভিমুখে গতিশীলা। তীরে একটা স্পীড-বোট বাঁধা আছে। এরকম তরীতে কখনও চড়িনি। গৌরী, আমি ও আর একটি ছেলে স্পীড-বোটে টালমাটাল করতে করতে উঠলাম। হঠাৎ দেখি গিয়াস দৌড়ে কোথায় চলে গেল। ওর জন্য নৌকোয় বসে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি এ আবার দেরি করে কেন? এমন সময় গিয়াস ফিরে এসে লাফিয়ে নৌকোয় উঠে বললে—চলো। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে একটা টিলা দেখিয়ে বললে—ঐখানে ঝোপের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আর্মির একজন কর্তা বসে আছে। সে আমাকে ওয়াকি-টকি দিয়ে ডেকেছিল। আমি যেতে দেখি যে বায়নাকুলার দিয়ে আপনাদের দেখছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—ঐ মহিলারা কারা? ওরা তো ভারতীয়? স্পীড-বোটে করে যাচ্ছেন কোথায়? আমি বললুম—বাঃ, ওঁরা তো আমার মাসী, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন। এই বলে আমি পালিয়ে এসেছি। ছাড় ছাড় নৌকো ছাড়।

নৌকোর মোটর ফট ফট করে জীবন্ত হয়ে উঠলো। তরতর করে এগিয়ে চলল ওপারের তটরেখার দিকে। একটু পরেই আমরা রাজশাহীর খাড়া পাড় বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়লুম। গিয়াস আমাদের নিয়ে গেল কবরগুলির দিকে। সেখানে মাটি তখনও ভেজা। আমরা কিছু নয়নতারা ফুল যোগাড় করে তার উপর পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে নদীর তীরে এসে বসলাম। বিশাল জলরাশির নিরন্তর ধাবমানতা চিরদিনই আমার মনকে এক অদ্ভুত আবেগে ভরে দেয়। সেদিন দুই তীরের যন্ত্রণাকাতর মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে আমার পল

রোবসনের সেই গানটা মনে পড়ল—যেটা ভূপেন হাজরিকার গানে অনূদিত হয়েছে—

"বিস্তীর্ণ দুপাশের অসংখ্য মানুষের
হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?"

সেদিন সকালে এই হাহাকারের শব্দ বাংলাদেশের বিদীর্ণ হৃদয়ের রন্ধ্র ভেদ করে কেমন করে নির্গত হচ্ছে তা যেন ভালো করে শুনতে পেলাম।

ফিরে এসেই কলকাতার দিকে রওনা হবার পালা। ক্যাপ্টেন গিয়াস অ্যাকশনে গেল। ওর জন্য প্রার্থনা করতে করতে আমরা ফিরতে লাগলাম। সেদিন সকালে আর আউটহাউস থেকে কোনো শব্দ পাইনি। হয়তো সে হতভাগ্যগুলো শেষ হয়ে গেছে। তাদের জীবনের জন্য আর প্রার্থনা করলাম না। ভাবতে লাগলাম যেন ওদের মৃত্যুযন্ত্রণা দ্রুত মৃত্যুতে শেষ হয়ে যায়।

আমরা যে লালগোলা থেকে রাজশাহী গিয়েছিলাম সে তারিখটা ছিল ২৪শে নভেম্বর। তখন এদিকে ওদিকে মুক্তিফৌজেরা মুক্তাঞ্চল করতে পেরেছিল বটে কিন্তু যুদ্ধের কোনো কিনারা হয়নি। ওদিকে বিশ্বের দরবারে ভুট্টো চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের ছোট্ট দেশের উপরে বৃহদাকার ভারতবর্ষ তাণ্ডব শুরু করেছে। দাঁতাল একটা শূকর যেন একটা ছোট্ট টুনটুনিকে মাটিতে গেঁথে ফেলেছে। ভুট্টো সাহেব তার চোস্ত ইংরেজীতে বলে ফিটফাট পোশাকের পকেট থেকে রুমাল বের করে প্রায় ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে ইউ. এন. ও-র বেশীর ভাগ সাহেবকূলের সমব্যথা অর্জন করে হাতের কাগজটি নাটকীয়ভাবে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে আমাদের সমর সেন নিতান্ত অগোছালোভাবে যা কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন তাও থেমে গেল। আবার ওদিকে চাগলা খুব শালীনতার সঙ্গে, জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, "Name the Aggressor, Name the Aggressor."

এদিকে শরণার্থীরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কবে তারা দেশে ফিরবে। আমার কয়েকজন প্রফেসরের কথা মনে পড়ে। তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর মতলব কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁদের কাছে সবটাই বদমতলব বলে মনে হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি বাঙালীকে সাহায্য করবেন না? ইন্দিরা কিন্তু এদিকে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের অবস্থা, আমাদের অবস্থা, শরণার্থীদের চাপ—সমস্তটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু যারা জেগে ঘুমোচ্ছে তাদের জাগাবে কে? চীন গর্জন চালাচ্ছে—ভারত পরের ঘরে নাক ঢোকাচ্ছে

এটা বিশ্বরাজনীতির বিরোধিতা। শুধু রাশিয়া ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু আমরা এদেশে বসে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কবে তাজা তাজা ছেলেগুলোর রক্তপাত বন্ধ হবে, কবে শরণার্থীরা দেশে ফিরতে পারবে, শ্রীমতী গান্ধী কি করবেন—এসব বেশীর ভাগ লোকেরই জানা নেই। এইরকম একটা অসহ সময়ে আমরা কয়েকজন কল্যাণী থেকে জীপে কলকাতায় ফিরছি। যতোদূর মনে হয় সেটা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, হয়তো ৩রা ডিসেম্বর। ইন্দিরা গান্ধী ময়দানে বক্তৃতা করবেন। আমাদের আশা আজই হয়তো তিনি বলবেন কবে ভারতীয় সৈন্য মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। আমরা জীপ দ্রুত চালিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ছুটে এসে আগ্রহভরে ময়দানের এক পাশে গাড়িতে বসেই বক্তৃতা শুনছি। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি এইবার হয়তো কিছু বলবেন। ইন্দিরা খুব উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছেন নানা বিদেশী শক্তির কথা, তাদের বাদপ্রতিবাদ। তাঁর একটি কথা এখনও আমার কানে বাজছে। অতি উচ্চগ্রামে গলা তুলে তিনি বলছেন, "হাম তুনিয়াকো দেখায়েংগে···।" আমার সঙ্গী এক বাংলাদেশী প্রফেসর অধৈর্যভাবে বললেন, "আর দেখিয়েছ", তারপরে একটা আনপার্লামেণ্টারী কটূক্তি করে বললেন—"এ বেটি কিসৃসু করবে না। হায়, আমরা চিরকাল এইভাবে ইঁতুরের কলে পড়ে মরব।" প্রফেসর সারোয়ার মুর্শিদের এই কথাটা পরে বার বার মনে পড়েছে যখন বাংলাদেশের তথাকথিত লেফ্‌টিস্টরা সমস্ত যুদ্ধকালটা বিদেশে গা ঢাকা দিয়ে থেকে পরে বলেছে—ভারতের সৈন্য পাঠানো উচিত হয়নি।

আর একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশের মানুষ যিনি সমস্ত যুদ্ধকালটা লণ্ডনের ঠাণ্ডা বাতাসে ভালোই ছিলেন, তিনি একদা আমায় বলেছিলেন ভারত সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়ে বড়োই অন্যায় করেছে। আমাদের যুদ্ধ আমরা নিজেরা লড়লে আমরা ভিয়েৎনাম হয়ে যেতাম। এখানে আমরা কথাটা গৌরবে বহুবচন। এই গৌরবের তিনি কিন্তু এক কণাও পেতে পারেন না। এই সব গায়ে-জ্বালা-ধরা স্পর্ধিত বাক্য যতোবার শুনেছি ততোবার সেই প্রফেসারের সেদিনের হাহাকার আমার মনে পড়েছে।

যাই হোক, হাজার হাজার মানুষ ময়দানে বসে আগ্রহভরে শ্রীমতী গান্ধীর কথা শুনছে। এমন সময় হঠাৎ যেন কি হল। মনে হল কেউ যেন কোনো খবর নিয়ে এসেছে। শ্রীমতী গান্ধী বক্তৃতা থামিয়ে সহসা উধাও হয়ে

গেলেন। বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাবার কথা কিছুই বললেন না দেখে আমরা খুব নিরুপায় বোধ করতে লাগলাম। পরের দিনই জানতে পারলাম যে কি খবরটা এসেছিল। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। তারা তো যুদ্ধের আর একটা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুললো এবং ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকবার একটা সুযোগ করে দিল। পরে শুনেছি এটা না হলে বাংলাদেশস্থিত তাদের নব্বই হাজার সৈন্য War-prisoner-এর মর্যাদা পেত না।

৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আমরা কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইন পড়লাম—Indian Army marches into East Pakistan. এদেশেও কয়েকজন লেফ্‌ট-ব্যক্তি কুম্ভীরাশ্রু ফেললেন—হায়, শেষকালে ভারতও aggressor হল? এদিকে যে হাজার হাজার লোকের নাভিশ্বাস উঠছে সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য কোথায়?

এই সময়কার একটা ঘটনা লিখছি। আগেই বলেছি তখন সর্বত্র একটা কিরকম সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। গরীব লোক হলে Spy (কার?) আর শিক্ষিত হলে C. I. A. agent। কে যে কাকে চর ভেবে বসে আছে আর কে যে সত্যিই চর তা বোঝা কঠিন। আমার অবশ্য কখনও মনে হয়নি যে রিফিউজী ক্যাম্পে চরদের বিশেষ কিছু করবার আছে। তবে প্রায়ই কাউকে না কাউকে পাঠানো হত। আমরা পাঁচটি ক্যাম্পে স্কুল খুলেছিলাম। এক জায়গায় কয়েক হাজার ছেলেকে একত্র করে একটা চালার নিচে ধরে রেখে অসংখ্য ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকা, ছড়া লেখা শেখাচ্ছিলাম। এই সব ছিল সেই স্কুলের কারিকুলাম। আর গান অবশ্য ছিল আবশ্যিক। এই সব ক্যাম্পে দশ-বারোটি করে ভলান্টিয়ারও থাকতো।

যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাদের একজন ভলান্টিয়ার হেলেঞ্চা ক্যাম্প থেকে মাসের টাকা নিতে এসেছে। এমন সময় কথায় কথায় ছেলেটি বললে—আজ আমাদের ওখানে একটা স্পাই ধরা পড়েছে। শুনেই আমার মাথায় ব্লাড-প্রেসার দপ দপ করে উঠেছে।

তুমি কি করে জানলে যে ও স্পাই?

সকলেই তো কইত্যাছে।

তোমাদের উপরে ভার ছিল এরকম অজুহাতে মারপিট করলে তোমরা বাধা দেবে।

হেয়া কেমন কইরা হইব। হাজার হাজার লোক লাফালাফি করত্যাছে লাঠি সড়কি লইয়া। আমরা আট দশজন করমু কি?

হাজার হাজার লোক একটা লোককে পিটিয়ে মারবে নাকি ?

না, না, কোমর পর্যন্ত পুঁইতা রাখছে।

কি সাংঘাতিক! ওরা যদি এইরকম কাণ্ড শুরু করে তাহলে দেশে ফিরে পাকিস্তানীরা যা যা করেছে বলে এত নিন্দা, এত প্রচার, এত হাহাকার আমরা করলাম এরা তো ঠিক তাই করবে।

আমি ভাবছি এখন আমি কি করে কি করি। লোকটাকে কি করে বাঁচাই। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে যা ঘটছে তা আমি কি করে বন্ধ করব ? মানুষের উপর মানুষের এই বীভৎস অত্যাচার কতো দিনে শেষ হবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বয়রা সেক্টরে কে সেক্টর কমাণ্ডার ? সে বললে—ক্যাপ্টেন কামাল।

আমাদের কমল! কমল আমাদের স্কুলবাড়ির ক্যাম্পে ছিল। ওরকম সুন্দর স্বভাব sensitive ছেলে কমই দেখেছি। তার দিদির ডাক আমার কানে লেগেছিল। আমি ভলান্টিয়ার ছেলেটিকে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে বললাম—এই চিঠিটি নিয়ে কামালকে দাও। কামালকে ঠিক কি লিখেছিলাম তা মনে নেই। তবে তা বোধ হয় এইরকম ছিল—

ভাই কমল,

তোমার সেক্টরে একটি লোককে অর্ধপ্রোথিত করে রাখা হয়েছে। এরকম কাজ অত্যন্ত বর্বরতা। তোমরা এখন দেশে ফিরবে। এরকম নৃশংস কাজে যদি লিপ্ত হও—আমার তো বাধা দেবার কোনো ক্ষমতা নেই, কিছু করবারও উপায় নেই। শুধু এইটুকুই প্রার্থনা করব তাহলে তোমার সঙ্গে যেন আমার আর কখনও দেখা না হয়।

ষোল তারিখ তো যুদ্ধ শেষ হল। নিয়াজী আত্মসমর্পণ করল। কে জানে কি কারণে তাদের মনোবল এত ভেঙে গিয়েছিল যে নব্বই হাজার সৈন্য আত্ম-সমর্পণ করল। এরকম ঘটনা কমই ঘটেছে। যুদ্ধ সামান্যই ঘটেছিল। তার অল্পদিনের মধ্যেই শিবির গোটাবার পালা। এই সব গণ্ডগোলের মধ্যে আর সে ব্যাপারের খবর করতে পারিনি। শুধু শুনেছিলাম যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই কমলের একটা চোখে গুলি লেগেছিল। তারা দু-চারজন একটা গাছের উপর বসে গুলি করছিল। অদূরে স্থিত শত্রুদের উপর। হঠাৎ কমল ভুল করে একটা সিগারেট ধরালো সেই আগুনের নিশানা শত্রুর লক্ষ্যকে অব্যর্থ করে দিল। গুলিটি এসে একটা চোখে লাগলো। যারা সৈন্য নয় তারা যুদ্ধ করতে

গেলে এই রকমই বিপদ হতে পারে। একেই বলে 'অব্যাপারেষু ব্যাপারম্'। সামান্য একটু অসাবধানতার জন্য একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল।

এ ঘটনার মাসখানেক পরে শুনলাম কমলকে কলকাতার মিলিটারি হাসপাতালে আনা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। আরও অনেক সৈন্য এসেছে। আমরা, অর্থাৎ আমি ও আমার পুত্রবধু রূপা কমলকে দেখতে গেলাম। দরজার কাছ থেকে দেখি কমল খাটের উপর বসে আছে। তার একটা চোখে সবুজ ঠুলি পরানো। আত্মীয়স্বজন পরিবৃত। আমাকে দেখে তার সেই পরিচিত আনন্দভরা গলায় 'দিদি' 'দিদি' বলে জড়িয়ে ধরল। আমরা দুজনেই তখন আবেগে ভরপুর—কাঁদছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার চিঠি পেয়েছিল কিনা। কমল বলল, পেয়েছিলাম—তখন আমরা বাংলাদেশে অ্যাকশনে ঢুকবো বলে প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় আপনার ছোট্ট চিঠিটা কে যেন আমায় দিল। আমি কোনোমতে চিঠিটা পড়ে মাথায় ঠেকিয়ে বুকপকেটে নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে গেলাম। আপনার স্নেহ আপনার আশীর্বাদ আমার মন ভরে ছিল। ঢুকেই যে গ্রামে পৌঁছলাম দেখি ষোলজন রাজাকারকে দড়ি বেঁধে লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, গুলি করা হবে। আপনার চিঠিটা আমাকে পথ দেখালো। আমি বললাম—এদের গুলি করা হবে না, বিচার করা হবে। বহু লোক সমস্বরে বলল—কিসের বিচার? এদের রাখা হবে কোথায়? খাওয়াবেই বা কে? এত খরচ করবার দরকারই বা কি?

এদের ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে তুলে দেব। সমবেত জনতা উচ্চহাস্য করে উঠেছিল। ইণ্ডিয়ান আর্মি! তারা তো এদের জামাই আদরে রাখবে। কিন্তু কমল তার পদের শক্তিকে আরোপ করে এ হত্যালিপ্সুদের আটকাতে পেরেছিল ও তাদের ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। কমল বলেছিল—দিদি, ওদের পরমায়ু ছিল বলেই আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছালো। নইলে হয়তো আমার এ কথা মনেই হত না।

আমি চোখের জল রাখতে পারছিলাম না। আমার দীর্ঘ জীবনে নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে, নানারকম কাজ আমি করেছি। কিছুর জন্য আমি লজ্জিত, কিছুর জন্য আমি অনুতপ্ত, আবার কিছুর জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু এরকম আর কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই যা আমাকে এতখানি সার্থকতার আস্বাদ দিয়েছে। সবই ঘটনাচক্র। সেদিন ঐ মানুষটাকে পুঁতে না রাখলে এবং ঐ ভলান্টিয়ার ছেলেটি টাকার প্রয়োজনে আমার কাছে না এলে এসব

ঘটত না। ভবিতব্য এই যে ঐ লোকগুলি প্রাণে বাঁচবে। কিন্তু আমি যে তার নিমিত্ত হলাম তাতেই আমার জীবন কৃতার্থ হয়ে গেছে।

কমলের সঙ্গে ঢাকায় আর একবার দেখা হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম সে দেশের ব্যাপারে হতাশ্বাস হয়ে বিদেশে চলে গেছে।

ষোলই ডিসেম্বর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সেই সময় বাংলাদেশে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা একটি বাংলাদেশের মেয়ে যিনি সমস্ত যুদ্ধ-কালটা ঢাকাতেই ছিলেন তাঁর ভাষাতেই তুলে দেব। তার আগে আমাদের বাংলাদেশে প্রবেশের বর্ণনা করছি। আমাদের এবং আমারও প্রথম দিনটি—অবশ্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সবই মেশামেশি হয়ে গেছে স্মৃতিতে। কোন দিন কে সঙ্গে ছিল বলা শক্ত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই যে সমস্ত হিন্দু বাঙালীরা অনেক আগে এসেছে বাংলাদেশে ফেরার জন্য তারাও ব্যস্ত। এমন কি দণ্ডকারণ্য থেকে বাড়িঘর বিক্রি করে অনেকে বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। এবারকার শরণার্থীদের মধ্যে শিক্ষিত যারা তারা যখন প্রায় সকলেই চলে গেছে একদিন খুব ভোরে দুজন লোক এসে উপস্থিত। একটি অল্পবয়সী ছেলে একজন বছর তিরিশ-বত্রিশের ছেলেকে ধরে এনেছে। তার দুটি হাতের পাতাই কাটা। কব্জি থেকে নেই। কি ভয়ানক নিরুপায় তার অবস্থা। সে বললে—তার নাম হরেন্দ্র কর্মকার। তার বাড়ি ফরিদপুর। তার একটি প্রেস ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটি ব্রীজ উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় নিজের হাত দুখানি উড়িয়ে দিয়েছিল। এই ভয়ানক অবস্থায় কি করে যে সে ভারতে পৌঁছেছিল তার সবই সে আমাকে বলেছিল কিন্তু এখন মনে করতে পারছি না। সুস্থ হলে কলকাতায় এসে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অফিসে আশ্রয় নেয়। সেখানেই এতদিন ছিল—দেখাশোনাও হত। কিন্তু এখন সব বাংলাদেশে চলে গেছে, তবে তাকে নিয়ে যাবার কথা কারুর মনে নেই। সে একলা পড়ে আছে। এই দয়ালু ছেলেটিকে নিয়ে দুবার পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জমানের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, দেখা হয়নি। আমার নাম সে শুনেছে—তাই এসেছে আমি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।

এইরকম নিদারুণ কাহিনী আরও অনেক আছে কিন্তু সেদিন আমি মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এত ত্যাগ কি এমনি অবহেলার বস্তু? তারপর তাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা অবশ্য করে দিতে পেরেছিলাম।

জানি না এখন সে কোথায় কেমন অবস্থায় আছে।

ক্যাম্পের শরণার্থীদের ভারত সরকার দেশে পাঠালেন। যারা শুধু পায়ে কর্দমাক্ত শরীরে ছিন্ন বসনে আলুথালু চুলে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছিল তারা ট্রাকে চড়ে নূতন কাপড় পরে তেল মেখে চুল বেঁধে সংসার বাঁধার মত বাসন-পত্র, তাঁবু, তারপলিন ও পনের দিনের র‍্যাশন নিয়ে হাসতে হাসতে দেশে ফিরে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যাবর্তন দেখে গর্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

আমাদেরও বাংলাদেশ দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পাসপোর্টের কথা হচ্ছে। আমি ভাবছি পাসপোর্টের কড়াকড়ি হবার আগেই ঘুরে আসা ভালো।

প্রথম বাংলাদেশ দেখলাম বাহাত্তরের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। ইতি-মধ্যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে সুবীর একবার কুষ্টিয়া ঘুরে এসেছে। সে বাংলা-দেশের ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিল। তখন কুষ্টিয়া ধ্বংসস্তুপ। ওরা একটা শূন্য বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

আমি আমার পুত্র প্রিয়দর্শী, ডঃ বিলায়েত হোসেন, রবি সরকার ও প্রফেসর চ্যাটার্জি অনেক জিনিসপত্র নিয়ে বনগাঁর ব্রীজটার কাছে যখন দাঁড়িয়েছি, থানা থেকে একজন বি. এস. এফ.-এর ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন—**"Maitraye Devi, you have chosen a wrong day to enter Bangladesh".** আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? তিনি বললেন—আজ বাংলাদেশ থেকে কিছু বন্দী সৈন্য, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি আসবে।

শুনে তো আমাদের যে আনন্দ হল, তাকে **thrill** বলা যায়। কে কবে ভেবেছিল যে সিনেমা ছাড়া আমরা **Prisoners of War** দেখব? সীমান্তে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার সূত্রপাত। বিরাট বিরাট দৈত্যের মতো মাটি কাটার যন্ত্রগুলো হেলতে দুলতে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। ছোট রাস্তা, ছোট ব্রীজ পার হতে সময় লাগে। কোনোরকমে এক একটা স্থূলকায় যন্ত্রদানব শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ঢুকছে। ঐরকম একটি দানব দৃশ্যমান হলেই আমরা জীপ রাস্তা থেকে নামিয়ে নিতাম। এমনি করে শনৈঃ শনৈঃ এগুতে লাগলাম। তিন ঘণ্টার পথ যেতে ছ ঘণ্টা লাগলো। ঝিকরগাছার কাছে নদীর উপর ব্রীজ ভেঙে পড়ে আছে। এই প্রকাণ্ড ব্রীজটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পাশে আর একটি নূতন তৈরি কাঁচা ব্রীজ দিয়ে আমরা নদী পার হলাম। বিরাট ব্রীজটার ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর বিশেষ

কিছু ক্ষয়ক্ষতি নজরে এলো না।

ঝিকরগাছা একটা ছোট্ট জায়গা। তারপর আরও অনেকগুলো গ্রাম পার হওয়া গেল—যেগুলো "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে"র বর্ণনার সঙ্গে যদিও মেলে, ভিতরে যে শান্তি নেই তা তো আমরা জানি। ঝিকরগাছায় পৌঁছে আমরা একটি চার্চ দেখতে গেলাম। শুনেছিলাম পাকিস্তানী সৈন্য ঢুকে এক বৃদ্ধ পাদরীকে হত্যা করেছিল।

যশোরে সৈন্য প্রবেশ করলে প্রাণভয়ে অনেক হিন্দু-মুসলমান ঐ চার্চে আশ্রয় নিয়েছিল। সাধারণতঃ ধর্মসংস্থানকে সম্মান করা হয়ে থাকে এবং যুদ্ধরত মানুষরাও তার পবিত্রতা রক্ষা করে। কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পাক সৈন্য ঢুকেই বৃদ্ধ পাদ্রীকে পেয়ে গেল। এই মিশনটির নাম সিমুলিয়া মিশন। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের বহু পুরাতন মঠ। গোলমাল শুনে বৃদ্ধ পাদ্রী, ফাদার টেডেস্কো সেবাস্টিয়ানো ছোট টালিছাওয়া ঘরটি থেকে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটা মূর্খ সৈন্য তখনই তাঁকে গুলি করে দিল। বহু লোকের হিতকামী একটি বৃদ্ধ মানুষ অকারণ এই নৃশংসতার শিকার হলেন। আমরা দেখলুম যেখানে সে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ পড়ে ছিল সেখানে একটি ক্রুশচিহ্ন আঁকা আছে।

মঠটি ঘুরে ঘুরে দেখে আমরা যশোরের দিকে রওনা হলাম। বাংলাদেশে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেছি। পথ মসৃণ, পরিচ্ছন্ন,—আমাদের কলকাতার রাস্তার থেকে অনেক ভালো। শুনেছি আয়ুব এ সম্বন্ধে কড়া খেয়াল রাখতেন। **Military regime**এর এ একটা গুণ।

রবি সরকার মশাই আমাদের সব চেনাতে চেনাতে চলেছেন। একটা কালীমন্দির দেখা গেল। চার পাশে ডাবের স্তূপ। শুনলাম এখানে ডাব বলি হয়। কিন্তু ডাবপায়ী কালীটি সেখানে নেই। সম্ভবতঃ যুদ্ধে তিনিও শহীদ হয়েছেন। আর একটা লেভেল-ক্রসিংএর কাছে রবিবাবু বললেন, "এখানে মহাত্মা শিশিরকুমারের বাড়ি ছিল।"

দীর্ঘ নির্জন পথ পার হয়ে আমরা যশোরে পৌঁছলাম। পরিচ্ছন্ন শহর, রাস্তা মসৃণ ও পরিষ্কার—বিশেষ করে কোর্টের বাড়িটি খুবই সুন্দর। যশোরে পৌঁছে রবি সরকারের মামার সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি ওখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে পাঁজিয়া গ্রামে আমাদের নিয়ে যেতে আগ্রহী। কিন্তু আমরা প্রথমে ওয়ালি-উল-ইসলামের বাড়িতে গেলাম। ওয়ালির কথা আগেও লিখেছি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ছিল। রিফিউজী হয়ে আসার পর

আমার স্কুলবাড়ির ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। সেও অতি চমৎকার ছেলে। সে তখন যশোরে ডেপুটি কমিশনার। তার প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম বাড়ি বৃটিশ আমলের। কিন্তু বাড়িতে কিছুই নেই। অর্থাৎ টেবিল, চেয়ার, পর্দা, বাসন-পত্র কিছুই ছিল না। ওয়ালি কয়েকটি যোগাড় করে এনেছে কোনোরকমে বাস করবার মতো আসবাব। বিরাট ঘরের এক প্রান্তে কম্বল ও সাবানগুলো ঢালা হয়েছে। ঢালা হয়েছে ওষুধপত্র, শিশি বোতল। ওয়ালি বললেন—এগুলো কি করে ব্যবহার হবে। আমি তো এসব বিতরণ করতে পারব না।

কেন ?

ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার ঠিক করেছেন ভারত সরকার রিলিফের কাজে যাদের অনুমতি দেবেন তারাই করতে পারবেন। কারণ সি· আই· এর ভূত হয়তো ফট্ করে ঢুকে পড়তে পারে। কার মধ্যে সি· আই.এ.র গোপন মন্ত্রণা কাজ করছে তা কেই বা জানে ?

সেই সময় বাংলাদেশকে সি· আই· এর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্য নানারকম পন্থা ভাবা হচ্ছিল। ফলে যে সমস্ত রিলিফ সোসাইটি শরণার্থীদের মধ্যে প্রচুর কাজ করছিল তারাও এপারে কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছিল না। সুবীরেরও ভয় ছিল। যে দেশের জন্য এত পরিশ্রম করেছে সে দেশে হয়তো ঢুকতেই পাবে না। সেইজন্যই লুকিয়ে লুকিয়ে আমিনুলদের সঙ্গে কুষ্ঠিয়া ঘুরে এসেছিল। আমি পরে দেখেছিলাম কুষ্ঠিয়াতে অগ্নিকাণ্ড বেশী হয়েছিল। সেই সব পোড়া বাড়ি থেকে কাঠ এনে ক্রুশ বানিয়ে সারা পৃথিবীর চার্চে চার্চে ও সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে সুবীর পাঠিয়েছিলেন মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ। এতে টাকাও খুব উঠেছিল। সেই কাজে আমরাও কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম। সে কথা পরে বলা যাবে।

ওয়ালি আমাকে বললেন—কম্বলগুলো রেখে যান। পরে দেখা যাবে।

বাড়িতে জিনিসপত্রের বালাই নেই আগেই বলেছি। তবে খাবার ঘরে দুটো বড়ো বড়ো টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার আছে। ওয়ালি আমাদের মুরগীর মাংস ও ভাত খাওয়ালো। টেবিলের একটা চাদরও যোগাড় করেছিল। ওয়ালি বলতে লাগলো লুটের প্রবণতার কথা। এ বাড়ির জিনিসপত্র পাঞ্জাবী ও পাকিস্তানীরা লুট করেনি। পাড়া-প্রতিবেশী বাঙালীরাই করেছে। ওয়ালি বললে তার টেবিল-ঘড়িটা সে তার এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছে। দেখে নিজেই মুখ তুলতে পারেনি লজ্জায়। আমার মনে হচ্ছিল দেশ ভাগ হবার পর

থেকেই গৃহত্যাগী হিন্দুদের বাড়ি লুট করতে করতে এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই লুট করতে কেউ বাধা অনুভব করে না। অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হলেও বন্ধুবান্ধবরা হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে তাদের বাড়ি জমি জিনিসপত্র লুট করে নেবার জন্য। এ তথ্য আমি দণ্ডকারণ্যবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম। অভ্যাস বড়ো বিশ্রী জিনিস। একবার হলে আর ছাড়তে চায় না। তাই এখন আর হিন্দু-মুসলমান বিচার নেই। খালি বাড়ি পেলেই দরজা জানলাগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। এরকম এখন হয়তো সর্বত্রই হবে। তবে আগে এত ব্যাপক-ভাবে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা করত না।

যা হোক সে রাতটা আমাদের সার্কিট হাউসে থাকার ব্যবস্থা হল। আমি, খোকন আর প্রফেসর চ্যাটার্জি। খাট নেই, চাদর নেই, বালিশ নেই, তোয়ালে নেই, বাসন নেই—সবই পাকিস্তানীরা 'লইয়া' গ্যাছে। বাংলোটি সুন্দর। খাওয়ার ব্যবস্থা ভালো নয়। তবে সকালবেলা আমরা প্রসিদ্ধ মিঠাইয়ের দোকান থেকে পাঁচ টাকায় এক সের মাখা সন্দেশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমরা যখন যশোরে এলাম তখন সেখানে বারো আনা সের চাল, আড়াই টাকা সের পাকা রুই আর পাঁচ টাকা সের গলদা চিংড়ি। কোনো কোনো জায়গায় আড়াই টাকাতেও পাওয়া যায়। আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি। পাকিস্তানীরা তবে কিরকম শোষণ করছিল ? আমাদের তো তখন পাঁচ-ছ টাকা কেজি চাল। বারো-চোদ্দ টাকার কমে মাছ নেই। সন্দেশও চোদ্দ-পনের টাকার কম কেজি নয়। ওদের স্বৈরতন্ত্র, আমাদের গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের ফলে খাওয়াদাওয়ার বিশেষ উন্নতি ছিল না। বাংলাদেশের ঐ বাজারে দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠলো এবং ধুয়ো উঠলো সব ইণ্ডিয়াতে পাচার হচ্ছে।

যশোর শহরটি খুবই সুন্দর। আমাদের এদিককার মফঃস্বল শহরের মতো নয়। রাস্তার পরিচ্ছন্নতা ও মসৃণতা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। শুনলাম আয়ুব খাঁ ভালো ভালো রাস্তা করে গ্রামগঞ্জে যাতায়াত খুবই সহজ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সৈন্যদের ছাউনিও দেখলাম খুব সুন্দর জায়গায়। সেখানে অনেক বন্দী সৈন্য আছে।

এর পরে আমাকে প্রায়ই যশোর যেতে হয়েছিল। প্রচণ্ড শীত। অধিকাংশ পোড়া বাড়িতে গা ঢাকবার মতো কিছু নেই গ্রামবাসীদের। সুবীর আমাকে বললেন—বিদেশ থেকে বহু কম্বল এসে পড়ে রয়েছে। আরও দফায় দফায় কতো আসছে। কিছু কিছু দিয়ে আসুন না।

আমি বললাম—ওরা যে নিতে চায় না। ডি· সি· ভয় পায়। বলে যদি সি· আই· এ· ঢুকে পড়ে।

সুবীর বললে—ডি· সি· সরকারী চাকুরে। ভয় পেতে পারে। আপনার ভয় কিসের। মানুষ গাছতলায় শীতে কাঁপছে। তার সেই কষ্টটা তুমি দূর করতে পারো? কিন্তু কে কি বলবে সেইজন্য করবে না? যা খুশি বলে যাক, তোমার উদ্দেশ্য যদি নির্মল হয় তবে যিনি দেখবার তিনি দেখবেন।

এইরকম সে বলে চলেছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—সুবীর, তোমার মতো মনোবল, তোমার মতো পরদুঃখকাতরতা কি আমার আছে? আছে কি আমার অত সহ্যশক্তি? আমায় তো একটু কিছু বললে গায়ে ফোস্কা পড়ে।

সুবীর বললে—মা, আপনি নিজে তো জানেন আপনি কাকে দিচ্ছেন, কেন দিচ্ছেন। একটা মুমূর্ষু লোক যদি দেখেন আপনি কি ওষুধ দিতে ইতস্ততঃ করবেন—পাছে ওষুধে সি. আই· এর বীজ লেগে থাকে?

আমার মনে হল এ যে বুদ্ধের মতো কথা বলছে। সেই সারিপুত্ত আর মৌদ্‌গল্যায়নের গল্প। বুদ্ধের সেই প্রিয় শিষ্য দুজন একদিন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনার সঙ্গে এই বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি হল আমাদের? আমরা তো এখনও কিছুই জানতে পারলাম না। আত্মা আছে কিনা, ঈশ্বর আছেন কিনা, পূর্বজন্ম আছে কিনা, মুক্তিই বা কি—এই সব বিরাট বিরাট প্রশ্নের কোনো উত্তরই আমরা পাইনি। বুদ্ধ বলেছিলেন—বৎস, তোমরা রাজার পুত্র ছিলে। তোমাদের তো আমি ডেকে আনিনি। তোমরা সংসারের দাবদাহে অস্থির হয়ে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলে। আমি তোমাদের অষ্টমার্গ ও পঞ্চশীলের পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এই পথ যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে সত্য তোমাদের হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হবে। যা কিছু জ্ঞেয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে। তোমরা এখন যেভাবে প্রশ্ন করে চলেছ এবং উত্তর চাইছ তাতে মনে হয় তোমাদের অবস্থা সেই বাণবিদ্ধ বোকা লোকটির মতো যার বাণ তুলতে এলে সে বলেছিল—দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখি বাণটা কোন্ দিক থেকে এসেছে, বাণটা কি দিয়ে তৈরী, বাঁশ বা লোহা বা তামা, যে ছুঁড়েছে সে কি জাত,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় না শূদ্র আগে তো সব জানি, তারপর তো তোমাকে বাণ তুলতে দেব।

কম্বল যেই দিয়ে থাকুক, যার টাকাতেই ওগুলো কেনা হয়ে থাকুক, ওষুধও যেই এনে থাকুক, একটা আর্ত লোককে তার কষ্ট থেকে উদ্ধার করা বেশী প্রয়োজন না কম্বলের উৎস সন্ধানে যাওয়া বেশী প্রয়োজন?

সুবীরের কাছ থেকে বোঝা বোঝা কম্বল, জামা ও ওষুধপত্র ইত্যাদি নিয়ে যশোরে আবার এলাম। আমি, আমার স্বামী ও আরও দু-একজন বন্ধুবান্ধব। এবার যশোরে রবি সরকার ও তার বৃদ্ধ মামা পশুপতিবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। পশুপতিবাবুর বয়স আশী পার। এই সময়টা তিনি যশোরের পাঁজিয়া গ্রামে বাস করেছেন, গ্রাম ছেড়ে যাননি। অনেক পথ ধূলো উড়িয়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে ট্রেলার ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে পাঁজিয়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। পথে যেতে যেতে পশুপতিবাবু দেখতে লাগলেন কোথায় কোথায় গৃহদাহ লুঠপাট, নরহত্যা ইত্যাদি হয়েছিল। একটি কুখ্যাত গুণ্ডার বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা শুনে মানুষের মনে নিষ্ঠুরতার ক্রূর কর্ম করবার কতোদূর সম্ভাবনা আছে তা ভেবে শিউরে উঠেছিলাম। এই ঘটনাগুলি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরে তাঁর "ক্ষমা নাই" নামে একটি প্রবন্ধে লিখে আনন্দবাজারে প্রকাশ করেছেন। তখন আমার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু মতবিরোধ হয়েছিল। সে বিষয়ে পরে কিছু লেখা যাবে।

পাঁজিয়া গ্রামে যখন পেঁছিলাম তখন বিকেল হয়ে এসেছে। পশুপতিবাবুর দোতলা বাড়ি। ঢুকতেই গোয়াল, খড় গাদা, তার পর উঠোন, উঠোনের উপরে লাউমাচার চন্দ্রাতপ। তা থেকে শতাধিক ছোট বড়ো লাউ ঝুলছে। সেই ফলন্ত লাউমাচার নিচে কয়েকখানা চেয়ার ও বেঞ্চি পাতা আছে। সেখানে সভা হবে এবং কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা যাবে। বাড়িখানা ইঁট বের করা। তার পাশে একটা ডোবা—আর একটা ছোট রান্নাঘর। সেখান থেকে শ্যামলা রং মিষ্টিমুখ একটি বৌ উঁকি মারছে। শুনলাম পশুপতিবাবুর ছোট পুত্রবধূ। শ্বশুরকে ফেলে ভারতে পালাতে রাজী হয়নি। সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে কচি মেয়েটি এখানে পড়ে আছে। শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে এরকম সোরগোল শুনলেই পচা পানা পুকুরে কচুরিপানার নিচে ডুবে থেকেছে নাকটি একটু বের করে। কতো সাধারণ সামান্য মানুষ কি অসাধারণ আত্মত্যাগ করতে পারে যার কাছে বড়ো বড়ো বীরেরা হার মানবে। এদের নাম কেউ জানবে না বটে কিন্তু এরাই সেই ভিত্তিভূমি যার উপরে মানবতার সৌধ আজও দাঁড়িয়ে আছে। এখন লিখতে গিয়ে সেই ছোট্ট মুখটি মনে করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—সেলাম তোমাকে, সেলাম।

সেদিনের সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মুখে একটু স্মিত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে বুঝতে পারলাম তিনি পার্কিনসন্স্ রোগে জড় হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক আমায় যেন কি বলতে চাইছেন। তিনি

পা ঘষে ঘষে এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বহু কষ্টে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে আমায় দিলেন। দেখলুম সেটা একখানা লেটারহেড। উপরে লেখা যশোর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। ইনি এক সময়ে অভঙ্গ বঙ্গদেশে যশোর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তারই চিহ্ন বুকে ধরে আশা নিয়ে বসে আছেন একদিন বাঙালীর ঘরে যতো ভাই বোন এক হবে। আজ ওঁর মনে হচ্ছে সেই শুভদিন এসেছে। তাই আমার হাতে কাগজখানা সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। ভদ্রলোক শীতে কাঁপছিলেন। তাঁর গায়ে একখানি কোট পরিয়ে দিয়ে আমি ধন্য হলাম।

সেদিন রাত্রে পাঁজিয়া গ্রামে মামাবাবুর বাড়িতে থাকলাম। তার পরদিন রবি সরকার মশাইয়ের বাড়ি দেখতে গেলাম। বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে। দরজা জানলা জিনিসপত্র কিছুই নেই। শুধু দেয়ালের এক পাশে কয়লা দিয়ে কোনো দয়াবান মানুষ লিখে রেখেছে—যদিও হিন্দুর বাড়ি তবু এরকম ধ্বংস করা উচিত হয়নি। এই অভিনব আপ্তবাক্য পড়ে রবি সরকারও হাসতে লাগলেন।

এইভাবে যশোরে আসা-যাওয়া চলছিল রিলিফের কাজে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি আমরা ঢাকা রওনা হলাম। জীপে করে আমি, আমার স্বামী ও পুত্রবধূ রূপা। তারও খুব সখ, বাপের বাড়ি দেখবে। ঢাকার লোকেরা অবিরত ঢাকার গল্প করে করে সেই দেশ সম্পর্কে আমাদের খুব উৎসাহী করে রেখেছিল। যশোর থেকে পথ দেখাবার জন্য ওয়ালি একজন ছেলেকে সঙ্গে দিয়েছিল। আমরা দুপুরের দিকে রওনা হলাম। ফরিদপুরের কাছে একটা প্রকাণ্ড ব্রীজ হেঁটে পার হওয়া গেল। যে দেশের উপর দিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, এত খুন, ধর্ষণ, লুঠ ও নানারকম বীভৎসতা, সেই দেশে আমরা দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একজন তরুণীকে নিয়ে চলেছি এতে ভয় করতে পারতো কিন্তু করেনি।

স্টীমারে পদ্মা পার হতে হবে। ওখানকার মাছের ঝোল ও ভাতের গল্প খুব শুনেছি। অমন ইলিশ মাছের ঝোল নাকি জগতে নেই। আমরা যখন ছোটবেলায় কলকাতা থেকে চাটগাঁ যাওয়া-আসা করতাম তখন গোয়ালন্দে ঐ রকম মাছের ঝোল খেয়েছি। তবে সে সুখস্বাদ এখন আর মনে নেই।

গোয়ালন্দের দিকে অনেক গাড়ি চলেছে। অন্যদের মনে কি ভাবনা তা জানি না—আমার মনে ইলিশ মাছ আর ভাত। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। শুনলাম গোয়ালন্দ যাওয়া হবে না। কারণ সেখান থেকে

স্টীমার ছাড়বে না। যতোদূর মনে হয় সেখানকার ঘাট নষ্ট হয়ে গেছে বা বালির চড়া পড়ে গেছে। আর একটা জায়গায় যাওয়া হল। সেখানে স্টীমার আসবে এবং সেখান থেকে আমাদের ওপারে আরিচাঘাটে নিয়ে যাবে। আমরা জীপ থেকে নেমে পড়লাম। বালির তীরভূমি পার হয়ে জল ছোঁবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। বহুকাল পরে দেখলাম—এই সেই পদ্মা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আশ্রয়, মানসসুন্দরীর জন্মভূমি, প্রত্যেক বাঙালীর প্রিয়তমা পদ্মাকে কিন্তু একটু শুকনো বলে মনে হল। ফরাক্কা হয়তো তার লাবণ্য কিছুটা কেড়ে নিয়েছে।

এখান থেকে স্টীমার ছাড়বে। এখানে লোকারণ্য। এক একটা জায়গায় কাপড়ের ছাউনি টাঙিয়ে রান্নাবান্না হচ্ছে। স্টীমার ছাড়তে দেরী আছে। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে তিনজন মিলিটারী অফিসারের দেখা হয়ে গেল। তারা আমাদের তাদের ক্যাম্পে কফি খেতে ডাকলো। ওরা পাঞ্জাবী। ওরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে টগবগ করে ফুটছে। ওদের মধ্যে ছোট ছেলেটা খুব সুন্দর দেখতে। সে আমাদের কি করে খাওয়াবে, কি করে যত্ন করে বসাবে এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আবার কেবল ঠাট্টা-মস্করা করছিল—কলকাতার বাঙালীরা কি ভয়ানক! তাদের ভাষা কিরকম, ভঙ্গী কিরকম, তারা কুড়ে কিরকম, এইসব বলছিল। যদিও বলার ভঙ্গীতেই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের পেয়ে কতো খুশী হয়েছে। ওরা যে দেশের লোক পেয়েছে এখানে। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এখানে আমাদের পূর্বপুরুষ জন্মেছেন কিন্তু অর্ধেক বাংলা এখন অন্য দেশ। যদিও আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, অনুভূতি এক—আমরা একই গান গেয়ে খুশি হই, আমাদের শিল্প-সাহিত্য সবই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, তথাপি আমাদের এই পাঞ্জাবী ভ্রাতারাও আমাদের থেকে তো দূরে নয়।

ভারতীয় সৈন্যরা তখন যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরে যাচ্ছে। তাঁরা অনেক গল্প বলেছিল। এ একটা আশ্চর্য যুদ্ধ—যেখানে সকলেই খুশি। আমরা খুশি, বাংলাদেশের লোকেরা খুশি, —এমন কি বোধ হয় পাকিস্তানের সৈন্যরাও খুশি। তা না হলে নব্বই হাজার সৈন্য এভাবে অস্ত্র রেখে দেয়? **Capitulate** করে? আমার কথার উত্তরে তারা বললে—বিশ্বাস করো, একটি প্রাণ বিনা কারণে নষ্ট কবিনি। অনিবার্য না হলে একটি গুলি চালাইনি। গলাতেও হয়নি। অনেক জিনিস কিনেছি, কিন্তু পয়সা দিয়েই কিনেছি, লুঠ করিনি। আমাদের উপর কঠিন নির্দেশ ছিল—প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার

করবে। এমন কি বন্দী পাকিস্তানীদের সঙ্গেও। বিশ্বাস করো আমাদের কাছে এই নির্দেশ আসতো যে যদি সিগারেট কম থাকে, নিজেরা খেও না, বন্দীদের দাও। যদি মাংস কম থাকে, নিজেরা খেও না, বন্দীদের দাও। আর এখন পূর্বপাকিস্তান জয় করে 'বাংলাদেশ' বাঙালীদের হাতে তুলে দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। অনেকে ভেবেছিল আমরা এখানেই থেকে যাব। সেরকম বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

আমি বললাম—সুস্থ মানবতা সব সময়ই আনন্দের বিষয়। অনিবার্য হলে যুদ্ধ করতেই হবে কিন্তু মানুষ খুনই তার উদ্দেশ্য হবে না। আমাদের দেবীর হাতে কি আছে বলো তো ক্যাপ্টেন?

তুমি আমায় ক্যাপ্টেন বলছ কেন, আমি তো কর্নেল।

আচ্ছা আচ্ছা, শোনো তাহলে কর্নেল, দেবীর এক হাতে আছে খড়্গ আর এক হাতে আছে পদ্ম। **Sword and the Lotus.** রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—'এক হাতে তার কৃপাণ আছে, অন্য হাতে হার। সে যে ভেঙেছে মোর দ্বার।' তোমরা তাই করেছ।

এমন সময় অল্পবয়সী ছেলেটি আমাদের জন্য নানারকম খাবার নিয়ে এলো। আমি বসে বসে ভাবছি—এই যে দেশটাতে এসেছি এটা তো বাংলা দেশ। আমরাও তো বাঙালী। আমাদের নামটা ওরা বুদ্ধি করে নিয়ে নিয়েছে। তাহলেও আমাদেরও তো বাংলাদেশ-ই। এই দুই বাঙালীত্বকে এক করার জন্য, বাঙালী জাতীয়তার জন্যই তো এই যুদ্ধ। যে কারণে আমরা এত ব্যাকুল। আর বাংলাদেশীরা যুদ্ধ করছে কার সঙ্গে? পাঞ্জাবীদের সঙ্গে। পাঞ্জাবীদের কথা উঠলেই তারা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে—পাঞ্জাবীগুলা···

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, আজ এই পদ্মার তীরে বসে তিনজন পাঞ্জাব-তনয়কে দেখে আমার মনে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হচ্ছে। অনেক সময় এক মুহূর্তের মধ্যে যে সত্যটা অনুভূতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যা অনেক যুক্তিতর্ক দিয়েও করা যায় না। সেদিন ভাবছিলাম আমাদের বাঙালীত্ব আছে, কিন্তু ভারতীয়ত্ব কি কম? সেখানে কোনো পাঞ্জাবী কি কখনও আমার পর হতে পারে? বাংলাদেশীরা একটা ছোট্ট দেশের মানুষ। তারা ছোট্টভাবে থাকতেই ভালোবাসে। এমন কি আজকাল তো দেখি এই পশ্চিমবাংলার বাঙালীকেও তারা পর মনে করে। আমাদের কাছে এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে বিস্তীর্ণ ভূমি তার মধ্যে বহু জাতি, বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম ও বর্ণের সমস্ত মানুষই

আমরা এক জাতীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ। কোনো প্রলোভনেই সে বন্ধন ছিঁড়লে আমরা বড়ো থেকে ছোট হয়ে যাব। সিংহ মূষিকে পরিণত হবে।

মনে পড়ে একদিন কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি অরবিন্দ আশ্রম আছে। কুমিল্লা শহরটি খুব সুন্দর। তবে সেখানেও যথেষ্ট খুনোখুনি হয়ে গেছে. অরবিন্দ আশ্রমে আমরা একটি বাঙালী পরিবারকে পেলাম। তারা নতুন এসেছে। এর আগে যিনি ছিলেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। এই মন্দিরে একটি মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি দারুণ অরবিন্দ-ভক্ত। তিনি আশা করে আছেন যে একদিন এই উপমহাদেশ এক হয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ফলে আর মায়ের আশীর্বাদে। তাঁর সে কথার আমি কোনো উত্তর দিচ্ছি না দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনি কি চান না যে তুটো দেশ এক হয়? আমি বললাম —চাইলেও বলব না। এ কথা আমাদের মুখে উচ্চারণ করা চলবে না। কারণ তাহলে সকলে বলবে যে সেই মতলবেই আমরা বাংলাদেশকে সাহায্য করেছি। এ হচ্ছে অধিকার বিস্তারের কারসাজি। তিনি বললেন—বাংলাদেশ দিয়া হইবটা কি। বাংলাদেশের অস্তিত্ব বা সত্তার মূল্যই বা কি। টু-নেশান থিয়োরী ফুটিফাটা হইয়া গ্যাছে। অর্থাৎ ধর্ম দিয়ে জাতিভেদ যখন আমরা মানছি না, ভাষা দিয়ে, ইতিহাস দিয়ে দীর্ঘদিনের একত্রে বসবাস করার ভালোবাসা দিয়ে এক মাটির অন্ন, এক নদীর জল গ্রহণ করে আমরা যখন হিন্দু মুসলমান এক জাতি, তখন আবার পশ্চিবাংলাই বা কি আর বাংলা-দেশই বা কি। সবটাই তো 'নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'।

আমি বললুম—সে না হয় হল, তবে দেশটা পৃথক না হলে কত লোকের অসুবিধা। কতগুলো এম. এল. এ. হবে, মন্ত্রী হবে, আলাদা গভর্ণর হবে—এই সব সুখ-সুবিধা থেকে বেশ কিছু লোক বঞ্চিত হয়ে যাবে। তাদের স্বার্থে টান পড়বে। তারা দেশকে একত্র করতে চাইবে কেন? হিন্দুরাও কিছুতেই রাজী হবে না। তারা ভাববে মুসলিম মেজরিটি হয়ে গেল।

এ আলোচনা অনেকের সঙ্গেই হয়েছে। অনেকে ভেবেছিল যুদ্ধ শেষ হলে তু দেশ এক হয়ে যাবে। এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে কিছু থাকবে না। এ ছাড়া আর একটা দিকও দেখেছি। পাঞ্জাবী ও হিন্দীভাষীদের ওপর ওদের রাগ। কিন্তু আমাদের কাছে তো তা নয়। পাঞ্জাবী বলতে ওদের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানী যাদের সঙ্গে ওদের লড়াই। কিন্তু আমাদের কাছে ঐ অর্থ একেবারেই অনুপস্থিত। ওরা সেটা বুঝতে পারেনি বলেই

অনেকে বহুবার বলেছে—এইবার চেষ্টা করতে হবে। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি **Eastern Zone** তৈরি করতে হবে যা ভারত থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এটা আমাদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশাল ভারত ছেড়ে কে কূপমণ্ডুক হতে যাবে? আজ যখন দেখি, ছোট ছোট গণ্ডিতে দেশকে ভাগ করবার চেষ্টা চলেছে, ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে, কোন্দলের পর কোন্দলে সমস্ত বৃহৎ প্রয়াস নষ্ট হবার উপক্রম, তখন ভাবি কি চায় এরা? আরও কতগুলি এম· এল· এর পদ? আরও কতগুলি মন্ত্রীর পদ? আরও কিছু অ্যামব্যাসাডার?

যাক আরিচাঘাটে তিন সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করে বড়োই ভাল লাগলো। তারা যে বলেছিল দাম দিয়ে ছাড়া কোনো জিনিস কেনেনি এটা বিশ্বাস হয়েছিল। সাধারণতঃ সৈনিকদের লুঠ করারই রেওয়াজ আছে। শুধু চীনারা তা করেনি আসামে যখন তারা ঢুকেছিল। পরিত্যক্ত ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—মালিক ছাড়া কেউ ঢুকবে না।

একবার বাংলাদেশ থেকে ফিরছি। সেদিন **Prisoners of War** বড়ো বড়ো ট্রাকে ভারতীয় সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ভারতে চলেছে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। তারা মাথা হেঁট করে বসে আছে। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। তারা পরাজিত, লজ্জিত। কোনো কোনো জায়গায় সরু সরু ব্রীজের কাছে বড়ো বড়ো ট্যাংক ও ট্রাকের গতি স্তিমিত হয়েছে আর পথের দু’ পাশের জনতা চিৎকার করছে, হিংস্র চিৎকার। ‘একটাকে ছেড়ে দিক। জবাই করে দি।’

সেইদিনই আমাদের জীপের পাশাপাশি আর একটা জীপে কতকগুলি ভারতীয় হাবিলদার জাতীয় মানুষ চলেছে। আমাদের জীপ দুটি এত কাছাকাছি যে ওদের কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই জীপ তো থেমে যাচ্ছে। একজন অল্পবয়সী সৈন্য অন্যজনকে বলছে—যাঃ, এ আবার একটা যুদ্ধ? একটা জিনিস নিতে পারলাম না। একটা আংটিও না। আর মেয়েগুলো তো অসভ্য। ভোরবেলা তো উঠেছি, ক্যান্টিনে তখনও চা হয়নি। বেড়াতে বেড়াতে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দরজাতে ধাক্কা দিয়েছি, যদি ওরা এক পেয়ালা চা দেয় সেই আশায়। ও মা, দরজা খুলে একটা মেয়ে আমাকে দেখে ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে দিল। আরে বাবা, আমি কি বাঘ না সাপ, তোকে কি আমি খাব? তোদের দেশটা জয় করে দিলাম, আর তার বদলে এই ব্যবহার? সে হিন্দীতে এই সব কথা গজগজ করে

বলছিল।

পদ্মার ঘাটে বসে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গোয়ালন্দে যারা মাছের ঝোল রাঁধতো, তারা কোথায় গেল? সবাই দেখিয়ে দিল কাপড় বাঁধা কয়েকটা ঝুপড়ি। সেখানে মাছ ভাত রান্না হচ্ছে। আমাদের খিদেও পেয়েছিল। আমরা সোৎসাহে বললাম—ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল দাও। ভাত থালায় স্তূপীকৃত করে দিল বটে কিন্তু তার পাশে ছোট্ট ছোট্ট দুটি মাছের টুকরো ও একটু ঝোল। সে মাছে এমন আঁশটে গন্ধ যে আমার লম্বা নাক অত্যন্ত পীড়িত হতে লাগলো। আমি শত চেষ্টা করেও এক গ্রাস মাছ মুখে তুলতে পারলাম না। সেই সুবিখ্যাত গোয়ালন্দের মাছের ঝোলের স্বাদটা স্বপ্ন হয়ে গেল। যেমন স্বপ্ন হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের বাঙালীর সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা।

স্টীমারের নিচের তলায় জীপ উঠলো, উপরের তলায় আমরা। আমাদের দোতলা কেবিন। স্টীমারে ফিসফ্রাই খাওয়া গেল,—তৈলাক্ত, অখাদ্য। আমার মনে হয় বাংলাদেশের রান্না সম্বন্ধে এত বেশী সুখ্যাতি শুনেছিলাম বলেই হতাশাটা এত বেশী হয়েছিল। বহুদিন পরে পদ্মা দেখলাম। বহুবিশ্রুত সুন্দরী পদ্মা। কিন্তু এর মাঝে মাঝে এত পলি জমেছে যে স্টীমার আটকে আটকে যাচ্ছে। এ পদ্মার স্রোত যদি আটকে যায় তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। পদ্মা একদা কীর্তিনাশা নাম পেয়েছিল। অনেক কীর্তি ধ্বংস, অনেকের সর্বনাশ সে করেছে। তবু তার কোনো ক্ষতি আমরা চাই না। সেই উল্লাসিনী, প্রাণময়ী, চিরচঞ্চলা পদ্মা, যেন মাটির স্তূপে আক্রান্ত না হয়—তার জন্য ভারতের যদি কিছু করার থাকে তবে অবশ্যই তা করা উচিত। ভারতীয় সৈন্যের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনার চেয়ে সেটা আমার কাছে কম প্রয়োজনীয় নয়।

পদ্মা পার হয়ে আরিচাঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বারবার অনেক ছোট ছোট নদী, খাল পার হয়ে ঢাকা শহরের এলাকার মধ্যে যখন পৌঁছেছি তখন রাত্রি নটা। কোথায় যাব তাও জানি না। কাউকে খবর দেওয়াও হয়নি। তাই সকলকে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। প্রথমেই একটা জায়গার নাম শুনলাম—সাভার। অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার দই মিষ্টির খুব নাম। ঢাকায় ঢুকে হোটেলের খোঁজ করতে লাগলাম। শুনলাম ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও পূর্বাণী—এ দুটোই ভালো হোটেল। কিন্তু ইন্টার-কন্টিনেন্টাল সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি যে তার দাম যে আমাদের ধরাছোঁয়ার

বাইরে হবে তা জানতাম। তাই পূর্বাণীতেই চলে গেলাম। সে রাত্রে টেলিফোন করে কাউকে পাওয়া গেল না। কিন্তু কলকাতার বাঙালী বলে হোটেলের কর্মীরা খুবই আদর-অভ্যর্থনা জানালো। রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে। আমরা একটা ভালো ঘর পেলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে তাজউদ্দিনের **Chief Aide** আমিরুল ইসলামকে ফোন করব ভাবলাম। কিন্তু অত ভোরে তাঁকে পাব এটা আশা করাই তো দুরাশা। তাই তাঁর মনিব তাজউদ্দিনকে টেলিফোন করলাম। একবারেই পেয়ে গেলাম।

হ্যালো, তাজউদ্দিন আছেন নাকি ?

হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন ?

বলুন তো কে ?

তাই তো, মুশকিলে ফ্যাল্‌লেন। কইলকাতা থেকে আসছেন নিশ্চয়।

এখন আর চিনতে পারবেন কেন ! নিজের দেশে এসে গিয়েছেন।

ওহো, আপনি মৈত্রেয়ী দেবী ? কবে এলেন দিদি, কোথায় উঠেছেন ?

তারপর চলল আলোচনা—কেন আগে জানালাম না—-ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি বললেন—আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমি এখনই আমিরুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পূর্বাণী হোটেলে একটা পুরো স্যুইট আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা পনের দিন পরমানন্দে **State guest** হয়ে রইলাম। পরদিন থেকে কলকাতায় যাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে রয়েছিল কিম্বা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা দলে দলে আসতে লাগলেন। সে যে কি আনন্দ ! বন্ধু সমাগমে সেই উৎসবে মনে হচ্ছিল যেন যতো সব ভেদবুদ্ধি, হিন্দু-মুসলমান, দুই দেশের বিচ্ছেদ—সব অলীক। আমরা আত্মীয়স্বজন মিলিত হয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে বিধৃত বহু পুরাতন ঢাকা শহরে। সেবারে ঢাকায় মৌচুদ আমাদের গাড়িতে নিয়ে খুব বেড়িয়েছিল। দেখলাম ছেলেরা সব টয়োটা চড়ে। তাছাড়া সব বড়ো বড়ো বিদেশী গাড়ি। আমাদের জন্য সর্বদা বন্ধুদের গাড়ি তৈরী থাকতো। সেবারে ঢাকায় উল্লেখযোগ্য অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে কিন্তু সকলের কথা মনে করতে পারি না। দু-একজনের কথা বলছি।

আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন শহীদুল হাসানের স্ত্রী বৈজু। বৈজু কথাটা কি নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তা বলতে পারব না। সেদিন সেখানে ভারতীয় দূতাবাসের অনেক লোক ছিলেন। দেখলাম এই মহিলা তাঁদের সঙ্গে খুব

পরিচিত। আসলে ইনি কলকাতার মানুষ এবং অভঙ্গ বঙ্গদেশ ওঁর মনের মধ্যে বাস করে। আমি প্রথম বুঝতে পারছিলাম না আমার সঙ্গে ইনি এত পরিচিতের মতো কথা বলছেন কেন, কোথায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরে বুঝতে পেরেছি এঁর স্বামী শহীতুল হাসান আমাদের কলকাতার বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং দেশ-ভাগটা তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি। এই যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন। সে কাহিনীটি শুনলাম। বড়ো করুণ।

এঁরা সিলেটের লোক। এঁর বন্ধু নির্মল চৌধুরী খুব ধনী। চা-বাগানের মালিক। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম ছিল। সেজন্য সে ছিল নির্ভয়। সকলেই জানে সিলেটে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। তবে ওরা খুব সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ সিলেটি সাম্প্রদায়িক। সিলেটিরা সিলেটিদের খুব ভালোবাসে। শহীতুল হাসান কোনোদিন ভাবতেও পারেননি যে নির্মল চৌধুরীকে হিন্দু বলে কেউ মারবে। এই গোলমালের মধ্যে তিনি হঠাৎ সিলেট থেকে এসে শহীতুল হাসানের বাড়িতে উঠলেন। সকলে বলল, "নির্মল তুমি এই গোলমালের মধ্যে কেন এলে?" নির্মল বললেন, "ঢাকাৎ কিতা হয় ছ্যাখ্‌তাম আইলাম।" সবাই বলল, "শইতুল হাসান, অখন তুমি হিন্দুরে বাসাৎ যইও না। বুঝাইয়া-উঝাইয়া পাঠাই ছ্যাও।"

কিন্তু শহীতুল হাসানেরও হিন্দু-মুসলমান বোধ নেই। তিনি বললেন—"নির্মল চৌধুরী আবার হিন্দু কিতা? তার লগে পাকিস্তান সরকারের অত দহরম মহরম, তারে মারত কে?"

নির্মল চৌধুরী রয়েই গেলেন। সিলেটি বন্ধুরা বললেন—"নির্মল, অত পথ বার হইও না। একটু হুসিয়ারে থাকিও।" নির্মল মনে করেন তাঁর কোনো বিপদের সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু একদিন কেল্লা থেকে টেলিফোন এলো—নির্মলবাবু একবার দেখা করুন, কেল্লায় আসুন। নির্মলবাবু সেজেগুজে চলে গেলেন যেন বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল ওদের কিছু জানবার আছে, জিজ্ঞাসাবাদ হলেই চলে আসবেন। কিন্তু একদিন যায়, দুদিন যায়---উনি আর ফেরেন না। তখন শহীতুল হাসান বললেন—"যাই, কেল্লাত্‌ গিয়া খবর লইয়া আই।" সবাই বললে—"তোমার কিতা ডর্‌-উর্‌ নাই? ইলাখান কামও করিও না।" শহীতুল বললেন—"বন্ধুর বিপদ বন্ধু যদি কিনার না দাঁড়ায় তে হে মানুষ কিতা?"

অতএব যা ঘটবার তাই ঘটল। তিনি কেল্লায় খবর নিতে গেলেন, আর

ফিরলেন না।

পূর্বাণী হোটেলে একদিন আমার একটি পূর্বপরিচিত ছেলে এসে বললে—যে তার একজন আত্মীয়া পুরানো ঢাকার পল্টন বাজারের বাসিন্দা। তিনি আমার প্রকাশিত 'নবজাতক' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি 'নবজাতক' পূর্ববঙ্গে বিশেষ পরিচিত হলেও কলকাতার সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত হয়নি। বরং অনেকেই উন্নাসিকভাবে কৃপাদৃষ্টিপাত করেছিলেন। অবশ্য কয়েকজন—তার মধ্যে প্রধান অন্নদাশঙ্কর—এই পত্রিকার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে এ পত্রিকা গোপনে হাতে হাতে ঘুরতো। সরকারীভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে পত্রিকাটির গোপন প্রচার করেছে। হয়তো নিষিদ্ধ হবার জন্যেই এর মূল্য বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া পশ্চিমবাঙলার অন্য কোনো সাহিত্য পত্রিকাতেই সে সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এত আলোচনা হয়নি।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা সবাই মিলে রাত্রির আহারের নিমন্ত্রণ পেয়ে সদলবলে পল্টন বাজারে উপস্থিত হলাম। বাড়িটা দেখে মনে হতে লাগলো—এটা হিন্দুর বাড়ি। এমন কি তুলসীমঞ্চটাও অটুট আছে। গৃহিণী আমাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তাঁর সেই অকৃত্রিম আনন্দ দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। তিনি বললেন যখন প্রায় প্রতিদিনই সৈন্যরা এসে বাড়ি সার্চ করবে এই ভয় হত (সে ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল) তখন তিনি সমস্ত বিপজ্জনক কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি নবজাতকগুলি কিছুতেই পোড়াতে পারিনি। একটা মাটির হাঁড়িতে করে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিলাম। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগলো এতদিনে পরিশ্রম যেন সফল হয়েছে। আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলা অন্ততঃ ত্রিশ রকমের ব্যঞ্জন রেঁধেছিলেন। অবশ্য সেদিন আমার শরীর খারাপ ছিল বলে তার সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না। কিন্তু তাঁর দুঃখ, দুশ্চিন্তা, আনন্দ, সম্প্রীতি, উচ্ছ্বাস এত প্রবলভাবে আমাদের মনের উপরে এসে পড়ছিল এক বে অফ বেঙ্গলের ঢেউ ছাড়া আর কোনো বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারি না। তিনি আমাকে সেদিন যেসব কথা বলেছিলেন সেগুলি আমি তাঁর ভাষাতেই শোনাতে চাই বলে তাঁকে বলেছিলাম আমার নবজাতকের জন্য এই কথাগুলি একটা প্রবন্ধ আকারে লিখে দিন। তিনি দিয়েছিলেন। সেটা আমি কিছু পরে এখানে উদ্ধৃত করছি। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাস মুখে যেমন প্রকাশ হয় হাসিতে, অশ্রুতে, ব্যঞ্জনায়, দৃষ্টিতে

—সমস্ত মিলিয়ে তেমন কালি-কলমের মুখে কজন প্রকাশ করতে পারে! দৈবাৎ হয়তো কেউ পারে, সবাই নয়।

শ্রীমতী মোকাদ্দেসা কাসেম যে রচনাটি পাঠিয়েছিলেন তার নাম "ভাইএর মুখ"। এই লেখাটিতে যে মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে সেই সুন্দর চিন্তাগুলি লেখবার আগে আমি আর একটি ছোট কাহিনী লিখে নিচ্ছি। কাহিনীটায় একটু তালভঙ্গ হবে। তবু আমি লিখছি এই কারণে যে আমাদের মনে রাখতে হয় যে প্রবচনগুলি মিথ্যা নয়, তা অনেক অভিজ্ঞতার ফল। যেমন 'কুসুমে কীট', 'চাঁদে কলঙ্ক', 'আলোর পিছনে ছায়া'। এমনি করে ভালোমন্দে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়ানো আছে। আমরা যখন একটা মন্দ কাজ দেখি তখনই তার চূড়ান্ত বিচার করে ফেলি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিন জীবনের পথে চলতে চলতে আমি এত গভীরভাবে লাভ করেছি যে আমি চাই এ বিষয়ে অন্যেরও বিশ্বাস উৎপাদন করতে। বহু বিদ্বেষ, বহু অশান্তি দূর করবার এটা একটা মহৌষধ। জীবনের প্রথম দিকে বোঝা যায় না বটে কিন্তু এটাই একটা first lesson যেটা না হলে জীবনকে, মানুষকে, সমাজকে বুঝতে ভুল হয়।

মোকাদ্দেসা কাসেম তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, আমাদের প্রতি সম্প্রীতি আর তাঁর ব্যক্তিগত শোকের সঙ্গে মিলিয়ে যখন উচ্ছ্বাসভরে কথা বলছিলেন আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এ বাড়িতে তাঁরা কতোদিন এসেছেন। এটা তো পল্টন বাজার, খুব নাম করা হিন্দুদের জায়গা। গল্পে অনেক পড়েছি। উনি বললেন—হ্যাঁ, আমার পিতা (কিম্বা পিতামহ) এই বাড়ি একজন হিন্দুর কাছ থেকে কিনেছেন। আসল কথা সেই হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, ভীষণ দাঙ্গার সময় তিনি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে বাড়িটার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়ে চলে যান। সেই ভদ্রলোক আমাদের এত বন্ধু ছিলেন যে আমার পিতামহের বিষয়সম্পত্তির বিবরণ ও উইল তাঁর কাছেই ছিল। আমি বাড়ীটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। একজনরা ভয় পেয়ে রাতারাতি এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এরকম ঘটনা এতবার শুনেছি তবু এর উত্তাপটা কেমন যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মোকাদ্দেসা বললেন—চিঠি লেখা-লেখি করে তাঁরা বাড়িটা বিক্রী করে দিতে চাইলেন এবং আমাদের এঁরাও কিনতে চাইলেন। বাড়ির দাম ঠিক হয়েছিল আশী হাজার টাকা। তারপর একটি বন্ধু নিয়ে তিনি বাড়ি বিক্রী করতে এলেন। পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-

বঙ্গে টাকা নিয়ে যাওয়া কিভাবে হবে? উনি ক্যাশ নিতে চাইলেন। লেখা-পড়া হয়ে যাবার পর ব্যাঙ্ক থেকে আশী হাজার টাকা তুলে ওঁকে দেওয়া হল। উনি সেইদিনই ফিরে যাবেন স্থির হয়েছে। টাকাটি ব্যাগে নিয়ে ওঁরা দুজন রওনা হলেন। এ বাড়ির লোকেরা ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফিরে এলো। অর্ধপথও যাওয়া হয়নি এমন সময় কোনো দুর্বৃত্ত তাঁর পিঠে ছোরা বসিয়ে ব্যাগটি ছিনিয়ে পালিয়ে গেল। ভদ্রলোক বাড়ি বিক্রী করলেন অথচ টাকা দেশে নিয়ে যেতে পারলেন না। কথাটা শোনামাত্র আমার মনের উপর একটা তীব্র সন্দেহ দপ্ করে উঠলো। এতক্ষণ ধরে যে ফুল ফুটেছিল তার উপরে কে আগুন ঢেলে দিল। আমি, রূপা ও মনোমোহন সেন পরস্পরের দিকে তাকালাম। মোকাদ্দেসা তাকালেন না। তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। বরঞ্চ তিনি বললেন—জানেন, অনেকে সন্দেহ করে আমরাই মেরেছি, লোকে জানলো কি করে যে ওঁর কাছে টাকা আছে? আর কেনই বা আমাদের আত্মীয়স্বজন ট্রেনে তুলে দিল না। এসব কথা অনেকদিন পর্যন্ত অনেকে বলেছে। যাক এই বলে তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা আবার শুরু করলেন। তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধে সে বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু এর পরে আর সুর বাজলো না। মনে হল একটা কাঁটা খচখচ করতেই লাগলো। কিন্তু কাঁটা পুষে রেখে লাভ নেই। কি মন্ত্রে তাকে গলিয়ে দিতে হয় তা একটু আগেই লিখেছি।

নবজাতকের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ Brother's Face বলে আর একটি পত্রিকা দু'চারখানা বের করেছিল। মোকাদ্দেসা কাসেম সম্ভবতঃ সেই নামটি দিয়েই তাঁর প্রবন্ধের নামকরণ করেছিলেন—"ভাইএর মুখ"।

ভাইএর মুখ

আমার ছোট্ট ভাইটি মায়াভরা মুখটি
লেখাপড়া শিখে সে যে অনেক বড়ো হবে
ধন্য ছেলে তখন তোমায় বলে যেন সবে॥

কোথায় যেন শুনেছিলাম গানের এ কটি কথা। বোনের মনের চিরন্তন আকুতি। সেই যে ছোট্ট ভাই যাকে ঘিরে, যাদের ঘিরে বোনেরা আশার জাল বোনে—সেই ভাইটি আমার, একমাত্র ভাইটি ১৯৭১-এর ১১ই আগস্ট

বেরিয়ে পড়ল নিরাপদ গৃহকোণ ছেড়ে, আশা—যদি হানাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনোরকমে আগরতলা পৌঁছতে পারে। তার বিশিষ্ট বন্ধু লেফটেনাণ্ট কর্নেল খালেদ মোশারফ তখন সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।···ঢাকায় তখন হানাদারবাহিনী অত্যন্ত সক্রিয়। তাদের সহযোগিতা করছে কিছু স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলা রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনী। তার উপরে আছে অবাঙালী এবং কিছুসংখ্যক বাঙালী প্রাইভেট্ গোয়েন্দা-তৎপরতা। মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে কিছুমাত্র সংযোগ যাদের ছিল তাদের পক্ষে ঢাকায় থাকা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। দিনে রাতে ব্যাপক ধরপাকড় চলছিল। যাদের ধরা হচ্ছিল অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। কাজেই ভাইএর না গিয়ে উপায় ছিল না।···১১ই আগষ্ট ভোরবেলা। আমি খুব ভোরে উঠে ওর নাশ্‌তার বন্দোবস্ত করতে লেগেছি। ভোরে নাশ্‌তার সঙ্গেও এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ খায়। অত ভোরে দুধ আসে না। গুঁড়ো দুধ দিয়ে এক গ্লাস দুধ তৈরী করে ফ্রীজে রেখে দিলাম। বাঙালীর সংস্কারবশে যাত্রার সময় ডিম দেব না। পরোটার সঙ্গে মুরগীর গোশ্‌তভাজা ও পছন্দ করে। তাই দেওয়া হবে। আমার সঙ্গে কাজ করছিল আমাদের বাড়ির অনেক পুরোনো লোক জামসেদ। ভাইএর কাপড়-চোপড় বিছানাপত্রের খবরদারী করবার ভার ছিল তার উপর। বয়স্ক লোকটি স্নেহ দিয়ে ভাইকে সব সময় ঘিরে রাখতো। আমরা দুজনে নিঃশব্দে কাজ করছিলাম। কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সামান্যই কাজ, এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। জামসেদই ট্রেতে খাবার নিয়ে উপরে গেল। কারণ অল্প কিছুদিন আগে একটা বড়ো অপারেশন হওয়ায় উপরে ওঠা আমার নিষেধ ছিল। আমি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে, ফিরে এলে আমি প্রায় ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম ও কি করছে। জামশেদের গলাও ভারাক্রান্ত··· সাহেব কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়েছেন। এবার খেতে বসবেন। খানিক-ক্ষণ এদিক ওদিক করলাম। বাসার সবাই ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে। বড়ো ছেলে তার আগের দিনই একটা ছোট এয়ার-ব্যাগে তার মামার অল্প দু'চার-খানা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিয়েছে। সেগুলি সে আবার দেখে নিল। ছোট ছেলে তার কয়েকদিন আগে কেনা শেভিং ব্রাশটা নিয়ে উপরে ছুটে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করায় বলল—মামার ব্রাশটা একেবারে পুরোনো হয়ে গেছে। পাঁচ বছরের মেয়েটি জেগে উঠে খাটের উপর চুপ করে বসে আছে। আমি কাছে আসতে বলল—আম্মা, মামার জন্যে আমার কান্না পাচ্ছে। পঁচিশে

মার্চের পর থেকে ওর শিশুমনের উপর দিয়ে যেসব চাপ যাচ্ছে এবং ওর চোখের সামনে যা ঘটছে তাতে বয়সের আন্দাজে ও অনেক বুঝতে শিখেছে। স্বামীর কাছে গেলাম। ড্রইং রুমের এক কোণে উনি বসে আছেন—যে কোণটিতে বসে উনি চুপিচুপি স্বাধীন বাংলার রেডিও শোনেন। হয়তো এর আগে কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি ওর জন্য প্রার্থনা করেছেন। আমি কেমন যেন স্থির থাকতে পারছিলাম না। ধীর পায়ে উপরে উঠে এলাম। আমাকে দেখে ভাই চমকে উঠলো। বলল—তুমি কেন এলে? আবার বলল—অত ভয় পেয়েছ কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুধু বলছিলাম, খোকন—খোকন।

সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। নেমে এলাম। যাত্রার সময় যতো এগিয়ে আসছে আমরা সবাই মিলে যেন ততোই চঞ্চল হয়ে উঠেছি। ছেলেরা অকারণে উপর-নিচ করা শুরু করেছে। আমাদের ঘিরে কতকগুলি চঞ্চল মুহূর্ত যেন একটা আবর্ত সৃষ্টি করেছে আর আমরা যেন তারই ভিতরে পাক খাচ্ছি।

বেবী ট্যাক্সির আওয়াজ শোনা গেল। ঐ রকমই কথা ছিল। কারণ বাসার গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। বেবী ট্যাক্সি নিয়ে এলো মুক্তিবাহিনীর ঢাকা অ্যাকশন কমিটির এক বিশিষ্ট কর্মী মনিরুল আলম। আমি নিঃশব্দে প্রাণপণে কোরাণের আয়াৎ পড়তে লাগলাম। সব কিছু কেমন যেন দ্রুত ঘটে গেল। খোকন খুব তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলো। ছেলেরা দুপাশে। মনিরুল আলমের হাতে ব্যাগ। খোকন তার দুলা ভাইকে সালাম করে এসে আমাকেও সালাম জানালো। তারপর দ্রুত উঠে গেল বেবী ট্যাক্সিতে।

আমরা কেউ কাঁদিনি। কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করিনি। আমার ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। আমি কি কোনো আশীর্বাণী উচ্চারণ করছিলাম? আমার মনে পড়ে না।

ঘরের দিকে চোখ ফেরালাম। ছেলেরা কাছে নেই। ঘরের ঠিক মাঝখানে স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। বিষণ্ণ গম্ভীর। দৃষ্টি তাঁর সুদূরে নিবদ্ধ। আমি জানতাম এই মুহূর্তে তিনি কি ভাবছিলেন। আমাদের পরিবারের আর একটি বিচ্ছেদের কথা। তার পরম সুহৃদ, সহকর্মী, বন্ধু ও আত্মীয় ফয়জুল্লাহ্‌ চৌধুরীর নিরুদ্দিষ্ট হবার কথা। ফয়জুল্লাহ্‌ ছিলেন তাঁর ছোট চাচার ছেলে, সমবয়সী, বাল্যবন্ধু। পরে ফয়জুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর ছোট বোনের বিয়ে হয়। আঠারো বৎসর ধরে ফয়জুল্লাহ্‌ ছিলেন আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এমন একজনের

নিরুদ্দিষ্ট হওয়াটা আমাদের পরিবারের এক দুঃখময় অধ্যায়।

১৯৭১-এর ২৭শে মার্চ তেজগাঁ ফয়জুল্লাহ্‌র বাসার কাছে একটি লোক এসে খবর দিল যে ফয়জুল্লাহ্‌কে গত রাত্রে কয়েকজন মিলিটারির লোক এসে নিয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠিয়ে শুধুমাত্র গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা অবস্থায়। কথাটা আমাদের মনে ততোটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেনি। কারণ পুরো জিনিসটা সম্বন্ধে আমাদের তখনও কোনো ধারণা ছিল না। পঁচিশে মার্চের ঘটনাটা ছিল এতই আকস্মিক এতই অতর্কিত যে ওর ভিতরে অন্তর্নিহিত ষড়যন্ত্রের কথা আমরা সাধারণ লোকেরা ধারণায় আনতে পারিনি। আমরা বুঝেছিলাম একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। কিন্তু তা যে এত বীভৎস, এত নারকীয় সেটা আমাদের কাছে বোধগম্য ছিল না। কাজেই ফয়জুল্লাহ্‌কে ধরে নিয়ে যাওয়ায় আমরা খুব একটা আতঙ্ক-গ্রস্ত হইনি। ভেবেছিলাম ধরে নিয়ে গেছে, তার আপনজন কেউ গেলেই ছেড়ে দেবে। দেশে আইন-আদালত আছে, উকিল মোক্তার আছে, চিন্তা কি। সেদিন আর কিছু করবার ছিল না। কারণ খানিকক্ষণের মধ্যেই আবার কারফিউ জারী হয়ে গেল। পরদিন থেকে স্বামী-শ্বশুর শুরু করলেন তাঁদের একান্ত বন্ধু ও আত্মীয় ফয়জুল্লাহ্‌র অনুসন্ধান। দিনের পর দিন ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়ে খোঁজ করছেন। উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসার, অবাঙালী বন্ধু-বান্ধব সবার কাছেই ঘুরেছেন। প্রত্যেকটি কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসীদের নামের তালিকা যোগাড় করে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া যায়নি। ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিসে তাঁর চেয়ারখানি খালি রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে চেয়ারে তিনি আর কোনোদিন এসে বসলেন না। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও একটি শিশুপুত্রের কাছ থেকে তিনি নিঃসীম শূন্যতায় মিলিয়ে গেলেন। কোনোদিন ইচ্ছা করলেও তারা তাঁর সমাধির পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। সমাধিমূলে নিবেদন করতে পারবে না দু ফোঁটা অশ্রু বা এক গোছা ফুল।

এমনি ইতিহাস রচনা হয়ে আছে ঘরে ঘরে (ধীরেন দত্ত মহাশয় কুমিল্লায় বাস করছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে ঠিক এইভাবে মধ্যরাত্রে মিলিটারী এসে তুলে নিয়ে যায়।) আমাদের ঘরে কিশোর ও যুবক ছিল। তাদের উপরই ধাক্কা গেল প্রথম। প্রত্যেক ছেলেকে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার বলে মনে করা হত। মেয়েদের উপরে অত্যাচার শুরু হয়েছিল আরও পরে। ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগলো। যাদের সুযোগ-সুবিধা

ছিল তারা অনেকে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিল। যাঁরা ওপার চলে যেতে পারলেন তাঁরা তো আমার কাছে পরম সৌভাগ্যবান। অনেক অতিবুদ্ধিমান লোক ব্ল্যাকমার্কেটে প্লেনের টিকিট কিনে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি দিল। সকাল-বিকাল শুধু বৈঠক, ছেলেদের নিয়ে কি করা যায়। গ্রামে পাঠাবার সুযোগ আমাদের ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার প্রস্তাবটায় ঘৃণা হত।

ঢাকার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগলো। যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের বাড়ি তো লুট হতই আর যাঁরা বাড়িঘরে বাস করছিলেন তাঁদের বাড়িও লুঠ হওয়া শুরু হল। ছেলেদের বুকে করে রাখলাম। দুটি ছেলে আই. এ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বড়োটির একটু লেখার অভ্যাস আছে। ডিবেট করে, হৈ-হুল্লোড় করতে ভালোবাসে। ছোটটা অন্য ধরণের। চুপচাপ, কৃশ, হয়তো একটু দুর্বলও। ম্যাট্রিকে স্টার পেয়েছে। ছেলেদের মুখের দিকে তাকানো যেত না। তারা যেন অপরাধী এমনি একটা ভাব এসে গিয়েছিল। তারা যেন বড়ো হয়ে বাবা-মার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্চের পঁচিশ তারিখের পর থেকে প্রায় এপ্রিল মাসের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত তাদের রাত্রে ঘরে শুতে দেওয়া হত না। জিনিসপত্র রাখার গুদামে তাদের শোবার জায়গা করা হয়েছিল। শোবার সময় প্যান্ট, সার্ট পরে পায়ে কেড্‌স্ পরে তাদের ঘুমোতে হত। কথা ছিল মিলিটারী এলে আমি আর তাদের বাবা যতক্ষণ পারি সামনের দরজায় তাদের ঠেকিয়ে রাখব। তারা পিছন দিয়ে পালাবে। পরবর্তী সময়ে বাঙালীদের এ পরি-কল্পনা তারা বোধ হয় ধরে ফেলেছিল। তখন কোনো বাড়ি raid করতে হলে আগে তারা পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলতো।

ঢাকার অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। লুঠতরাজ, ধরপাকড়, আর হত্যাকাণ্ড চলেইছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। গ্রামাঞ্চল থেকে পছন্দমতো মেয়ে বাছাই করে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আনা হচ্ছে। কন্‌সেনট্রেশন্ ক্যাম্পগুলোতে নরকের মহড়া চলেছে। এই সময় এক নূতন ধরণের অত্যাচার শুরু হল। লোককে ধরে এনে শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে নেওয়া হত যতক্ষণ না মৃত্যু হয়। এই সময়কার একটি ঘটনা আমার মনে বড়ো দাগ কেটে আছে। সকালের দিকে আমি রান্না করছিলাম এমন সময় একজন দেখা করতে চাইল। বসার ঘরে গিয়ে যাকে দেখলাম তাকে ঠিক এই সময় ঢাকায় আশা করিনি। ছেলেটি একটি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের কর্মী।

আমাকে বইপত্র দিতে আস তো। যতোদূর জানতাম ছেলেটি হিন্দু। তবে আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না। সন্দেহটুকু দূর করবার জন্য কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার নামটা যেন কি মনে পড়ছে না। ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে নাম না বলে বলল—আমি তো হিন্দু। আমি বললাম—কেন এখন ঢাকায় ঘুরছেন? অন্য কোথাও চলে যান। যদিও আমাদের অবস্থা ওদের চেয়ে কিছুমাত্র ভালো ছিল না। ছেলেটি বর্তমান অবস্থায় কি করা যায় সে সম্বন্ধে আমার উপদেশ চাইল। আমি তাকে বারবারই সাবধান করে দিলাম ঢাকা থেকে চলে যেতে। এই সময় আমি রান্না দেখার জন্য একটু ভিতরে এলাম। যাওয়াটা বোধ হয় একটু দ্রুতই হয়েছিল। ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই ছেলেটি তীরবেগে চেয়ার থেকে উঠে এক লাফে তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল। চোখে তার ভীতত্রস্ত দৃষ্টি। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেটি কি মনে করেছিল আমি ভিতরে কাউকে খবর দিতে ঢুকেছিলাম? না ছেলেটি আমাকেই সন্দেহ করেছিল? আমার মধ্যে কি সে খুনীর চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিল? আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার ভিতরটা শুকিয়ে আসছিল। আমি পানি খাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম।

এর পাশাপাশি আমার আর একটি দিনের কথা মনে পড়ল। সেটি ছিল আমার আব্বার মৃত্যুদিন। সেটি ছিল ১৯৪৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। বেলা তখন প্রায় দশটা। আব্বাকে শেষ শয়ানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ধোয়ানো সাজানো সব শেষ। একটু পরেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর শেষ বিশ্রামের স্থানটির অভিমুখে। বাড়ি লোকে লোকারণ্য। এমন সময় ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলেন আমাদের ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যজ্ঞেশ্বর-বাবু। হাতে তাঁর একখানা বড়ো খাম। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—সাহেব (আব্বাকে ঐভাবেই দেশের লোক সম্বোধন করতেন) অনেকদিন আগে সেই খামখানি আমার কাছে রেখে আসেন। তাঁর নির্দেশ ছিল যেন মৃত্যুর পর খামখানা তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। খামটা খোলা হল। আম্মা এবং আমার ছোট ভাইএর নামে সেভিংস সার্টিফিকেটের কাগজ, ব্যাঙ্কের কিছু কাগজপত্র, আব্বার সম্পত্তির একটি পূর্ণ বিবরণ, কতকগুলি প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদি। এ সবের বিবরণ অন্য কেউ জানতো না। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ব্যবসায়ী জীবনের প্রথমদিকে আব্বার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। সেজন্য আব্বার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগত ছিলেন। সবাই

জানতো যজ্ঞেশ্বরবাবু আব্বার বিশেষ স্নেহের পাত্র। কিন্তু তিনি যে এতটা বিশ্বাসের পাত্র তা কেউ জানতো না। কাজেই আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল এই পরিবেশের মানুষ আমি, আর ছেলেটি কিনা আমার উপরে এই অবিশ্বাস পোষণ করল ?···(পূর্বে বাড়ি বিক্রী করতে এসে নিহত হওয়ার ঘটনার কথা আছে—সেটি এই ভদ্রলোক বা তাঁর বংশধরের কাহিনী।)

এর ভেতরেই মুক্তিবাহিনী ও মিলিটারী—এ দুয়েরই তৎপরতা ভীষণ বেড়ে গেল। পাওয়ার ষ্টেশনগুলোতে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো। মোতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, বায়তুল মোকারম, বিপণিকেন্দ্র ও স্কুল-কলেজ, পীস-কমিটির সদস্যদের বাতিঘর—সর্বত্র বোমা-বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো। আমাদের সাহসী মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা গ্রামে-শহরে প্রতিটি ঘরে, মেয়েরা, বোনেরা প্রতিটি ঘরে তাদের গোপনে নানাভাবে সাহায্য করত। মুক্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে মিলিটারীরা যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠল। বাঙালীদের ধ্বংস করার যতগুলো উপায় আছে সবগুলো তারা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল। আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন। কি করে কি ভাবে সন্তানদের রক্ষা করা হবে সেই চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। আর ছেলেদের মুখের দিকে ভয়ে এখন আমরা তাকাই না। মার্চ মাসে তাকাতে পারতাম না তাদের ভীতত্রস্ত অসহায় চাহনি সহ্য করতে পারতাম না বলে। এখন তাকাই না তাদের আগুনঝরা দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারি না বলে।

তাদের কাছে আমাদের অপরাধ অনেক। দেশের এই দুঃসময়ে সংগ্রাম যখন শুরু হয়ে গেছে তখনও তাদের আমরা বেরুতে দিচ্ছি না, কাজ করতে দিচ্ছি না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যেন দুই আগ্নেয়গিরি সামনে করে আমরা বসে রইলাম। বাইরেও দুর্যোগ, ঘরের মধ্যেও এই মনোভাব। কেমন করে আমরা অত যন্ত্রণা সহ্য করলাম ভাবতেও এখন আশ্চর্য লাগে। এই সময় ভাইএর একটা চিঠি এল। দুই নম্বর সেক্টর মোলাগড় থেকে। সে তখন সেখানে **Chief of Staff, Youth Camp**। চারিদিক থেকে চাপ আসতে লাগল চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলার। কিন্তু প্রাণে ধরে পোড়াতে পারলাম না। জোরে বল ছেড়ে দিয়ে পানিতে ধরে রাখলাম। ভিজে ভিজে সেটা আর এক সময় চিঠি রইল না। ফেলে দিয়ে এসে সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম।

আমার এক ভাইপো ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে, বাবুল চলে গিয়েছিল মুক্তিফৌজে যোগ দিয়ে। তেজী জোয়ান ছেলে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। গান

গাইত, ছবি আঁকত, সাঁতার কাটত, গাড়ি চালাত। সবতাতেই ছিল তার অদম্য উৎসাহ। আগেই খবর পেয়েছিলাম যে মাসখানেক হয় ওরা অপারেশনের জন্য আগরতলার দিক থেকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখন বাবুল বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কয়েক দিনের জন্য ঢাকা এসেছে। গোপনে খবর পেয়ে দেখতে গেলাম। আমাদের বাসার কাছেই বোধহয় তাদের বাসা। গিয়ে দেখলাম আগের বাবুল আর নেই, শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে, চোখগুলো গর্তে বসেছে। কিন্তু কি এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় সে চোখ সমুজ্জ্বল ··।

···এর মধ্যে যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ঢাকায় এসে গিয়েছে, এত কড়া পাহারার ভিতর দিয়েও। বাড়ি বাড়ি সার্চ করা হত। দিনে রাতে যখন তখন বাড়ি ঘেরাও হত। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ নির্বিচারে ধরে নিয়ে যেত। এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল না। ১৭ই নভেম্বর, বাড়ি-বাড়ি রেড করার জন্য কারফিউ ঘোষণা করা হল। ঢাকা শহরকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে এক-একজন ব্রিগেডিয়ারের অধীনে দিয়ে দেওয়া হল। রেডিওতে মুহুর্মুহু তাদের এই ঘোষণা বাজতে লাগল।

অস্ত্র যে তারা উদ্ধার করতে পারবে না, সেটা তারাও জানত। তাদের লক্ষ্য ছিল ১৬ বছর বয়স থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত ছেলেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। এই সময় ঢাকায় আমরা অনেকে অসহায় অবস্থায় নির্ভরতা খুঁজতে যেতাম একজন দরবেশের কাছে। তিনি আমাদের সাহস দিতেন। ১৭ তারিখের ঘোষণা শুনে ছুটলাম তাঁর কাছে। তিনি পড়া পানি দিলেন ছিটোবার জন্য। অঙ্গে ধারণ করবার জন্য দিলেন কালো সুতেলা। মুস্কিল হলো ঘরে যে তখনও কিছু ভাইয়ের জিনিস ছিল। এর আগেই পাক বাহিনীর কাছে আপত্তিজনক অনেক বই পুড়িয়ে ফেলেছি। লেনিনের পুরো সংস্করণ মাটির নিচে পুঁতেছি। কিন্তু দু'একখানা বইয়ের উপরের মলাট ছিঁড়ে রেখে দিয়েছিলাম। সবগুলোর নাম মনে নেই। তবে দু'খানা বই বড় যত্ন করে রেখেছিলাম। একখানা হল গান্ধী সংখ্যা নবজাতক। আর একখানা হল এপার বাংলা ওপার বাংলা। হালকা নীল মলাটের উপর গাঢ় নীল রঙের গান্ধীজীর মুখমণ্ডলের একটি রেখাচিত্র সম্বলিত এই নবজাতকখানি যে আমি কতবার পড়েছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে তাঁর নোয়াখালি সফরের অনেক কথা তাতে ছিল। তা নোয়াখালির মেয়ে হিসেবে আমার কাছে ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। একজন ইংরেজ লেখিকার লেখার অনুবাদ এবং আশ্রমের একটি গরুকে নিয়ে কস্তুরবার ব্যাকুলতা। সবই আমি বার বার পড়েছিলাম।

১৭ তারিখে আর বইগুলি রাখতে পারলাম না। পুড়িয়ে ফেলতে হলো।

আমার এক নাতি মাগুরার এস. ডি. ও.। তার কিছু কাগজ পত্র আমার কাছে ছিল। সব পোড়ালাম, কারণ সে তখন ওপারে। ভাইয়ের কিছু কাগজপত্র ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি জঞ্জালের নীচে রেখেছিলাম। আর সাহস পেলাম না, নিজ হাতে সব পোড়ালাম। সেই গান্ধীজীর নীল ছবিখানি*ও ভাইয়ের একখানি ফোটো এমনভাবে উনুনের মধ্যে গিয়ে পড়ল যেন তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বলতে চাইছে,—তোমার কি একটুও সাহস নেই ?

১৭ তারিখ, বেলা তখন প্রায় একটা। আমাদের রোজা চলছিল। ছেলেরা সেদিন রোজা রাখেনি। ওরা টেবিলে বসেছে। এমন সময় একটা মিলিটারি ট্রাক এসে থামল সামনের বস্তিতে। মুহূর্তে ঘিরে ফেলল বস্তি। ছেলেরা প্লেটে ভাত নিচ্ছিল। দৌড়ে গিয়ে ভাত রেখে দিলাম। যার যার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে ফেললাম। কি জানি রোজার দিনে খাবার দেখে যদি প্রথম চোটে গুলি করে। ঘণ্টা দেড়েক তারা বস্তিতে ছিল। তার পরে এল আমাদের পাশের দুই বাসায়। আল্লাহ্‌তালার অপরিসীম অনুগ্রহ যে আমাদের ঘরে তারা আসেনি। কিন্তু ঐ দু ঘণ্টা আমি আর উনি বসে প্রতি সেকেণ্ডে নিজেদের মৃত্যু কামনা করেছি। কারণ ঘরে ঢুকলে যে তারা ছেলেদের রেহাই দেবে না সেটুকু জানতাম। আমাদের উপর দিয়ে স্টিমরোলারের মত দিন গড়াতে লাগল। ক্রমে আকাশে বাতাসে বেজে উঠল যুদ্ধের সুর। আমরা আশা-নিরাশায় দুলতে লাগলাম। আমরা হতাশার মধ্যে এতটা ডুবে গিয়েছিলাম যে আলোর রাজ্যে আর পৌঁছতে পারছিলাম না। ডিসেম্বরের তিন তারিখে প্রতিটি বাঙালী জমায়েত হল রেডিও সেটের সামনে। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিটি কথা আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার প্রতিশ্রুতি সবই যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেই বক্তৃতায়। সেই তিন তারিখের ঘটনা—প্রত্যেক বাড়িতে ছেলেপুলেদের ঠেকিয়ে রাখা দায় হচ্ছিল। ছাদে, বারান্দায়, রাস্তায় সব জায়গায় মানুষ। নটা থেকে আরম্ভ হল আকাশে বিমান যুদ্ধ। আমরা সবাই দেখছি। ঠিক খেলা দেখতে যাওয়ার মত। সবাই ভারতীয় বিমানের পক্ষে হাততালি দিচ্ছে। জয়ধ্বনি করছে। ন মাসের ভয় ভীতি যেন এক মুহূর্তে ঝরে পড়েছে। হঠাৎ দুখানি ভারতীয় বিমানকে আমরা গড়তে দেখলাম।—'হায়, হায়' করে

---

* নীল মলাটে গান্ধীজী—সত্যজিৎ রায়ের আঁকা।

উঠলাম সকলে।

রাত্রে টেলিভিশনে স্কোয়াড্রেন লিডার ভুটানীকে দেখানো হল। বোধহয় এয়ারক্রাশের জায়গার কাছাকাছি ছবি তোলা হয়েছে। ভুটানী ক্রমাগত চোখ মুছছেন। ধোঁয়ায় বোধহয় সমস্ত আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাঁর কষ্ট দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা কি তাঁকে বাতাস করব? ঠাণ্ডা পানিতে তাঁর চোখ ধুইয়ে দেব? আরেকজন পাইলট বোধহয় খুব আহত ছিলেন। তাঁকে দেখানো হয়নি। আমরা শুনেছিলাম, পাইলট মেহেরা কোরানিগঞ্জের কাছে পড়েছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে লুকিয়ে ফেলে। পরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বহু কষ্টে তাঁকে আগরতলা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে দেয়।

চারদিকে তখন তুমুল যুদ্ধ। আগরতলায় শুনলাম বোমা পড়েছে। ভাইয়ের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনের ধৈর্য বহু আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাবলুদের বাড়ি গেলাম। যদি দু' নম্বর সেক্টরের খবর পাই। কিন্তু এ কি? কেউ কথা বলছে না কেন আমার সঙ্গে? যেই সামনে পড়ছে মুখ নীচু করে সরে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। ঘরে ভাবী শুয়েছিলেন, লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন—কি দেখতে এসেছ ভাই! ভাবীর গলা অদ্ভুত ফ্যাসফেসে শোনাল। পরে শুনেছিলাম, ভাবীকে কাঁদতে দেওয়া হয়নি। পাছে জানাজানি হয়। মুখ শক্ত করে চেপে ধরা হত। কান্না চেপে চেপে গলা ঐরকম হয়ে গিয়েছে। ভাবীর গলা আজও ঐরকম ফ্যাসফেসে। বাবলু নেই। চার তারিখে ওরা অপারেশনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে রেকিং করতে গিয়েছিল। পরে ওদের দলের কমাণ্ডার ও বাবলুকে চোখ বাঁধা, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হিজগাঁও রেল লাইনের কাছে পাওয়া যায়। অনেক গোপনীয়তার ভিতর দিয়ে ছ' তারিখে ওদের কবর দেওয়া হয়। কবরে নামাবার পূর্বমুহূর্তে একজন খবর নিয়ে গিয়েছিলেন যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাবী হাহাকার করে উঠেছিল,—আমার ছেলে তো শুনে যেতে পারল না।

এদিকে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রতি সেক্টরে পাকবাহিনী মার খেয়ে চলেছে। ঢাকা থেকে মানুষ পালাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আমাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু তখন অনেক আত্মীয়স্বজন এসে উঠেছেন আমাদের বাসায়। তাই যাবার উপায় ছিল না।

মহম্মদপুরের কাছাকাছি জায়গায় বিহারীরা ঘরে ঢুকে বাঙালীদের হয়রানি করতে আরম্ভ করল। মানুষ এখান থেকে ওখানে করে বেড়াতে লাগল।

আমাদের বাসায় পঁয়তাল্লিশ জন এসে উঠলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। ছয়টি পরিবার সবাই আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ক্রমাগত কারফিউ চলছে। ব্ল্যাক আউট তো আছেই। হাটবাজার সব বন্ধ। …দিন রাতে সমানে বিমান আক্রমণ চলছে। বোমা পড়ার সময় আমরা ভয়ে নীল হয়ে যাই। আবার বোমা না পড়লেও ভাল লাগে না। সে এক বিচিত্র অনুভূতি।

আমাদের মধ্যে এখন সব বয়সের লোকই রয়েছে। কিশোর, কিশোরী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সব। কিন্তু সবার চিন্তাধারণা যেন এসে এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিশে গেছে। প্রতিটি পরিবার আসার সময় কাপড় চোপড় আনতে পারুক আর নাই পারুক একটি জিনিস সকলে বুকে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটি হল রেডিও ট্রানজিস্টার। সত্যি বলতে কি আমাদের সবার প্রাণের ধুক-পুকানি যেন ঐ বেতার কেন্দ্রটির মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। সারাক্ষণ সবাই যন্ত্রটিকে ঘিরে আছে। যেন ও-ই দেবে আমাদের বাঁচা মরার সংকেত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমরা জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলাম।

আমরা জানতাম এবং মুক্তিবাহিনী থেকেও আমাদের জানানো হয়েছিল যে আত্মসমর্পণ না করলে ঢাকাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তখন আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম যখন মানুষ গর্ব ভরে বলতে পারে,—“জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।” সেই কয়েকটা দিন আমরা জীবনের ক্লেদ গ্লানি ছোটখাটো চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলাম। যেন রুদ্ধশ্বাসে কোন এক মহাশক্তির প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমাদের চারিদিকে আকাশ বাতাস যেন প্রসব বেদনায় অধীর। আর আমরা যেন সেই বেদনার তীব্রতাকে আমাদের দেহে, প্রাণে, স্নায়ুকোষে, হৃদয়ের কোষে কোষে অনুভব করছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা সেই মহা পাওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এক ভয়াবহ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে বিহারীদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আমাদের চরম আঘাত হানার জন্য। গোলমালের প্রথম দিকেই একটা ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল ছিল যে যদি পাকবাহিনীর যেতেই হয় তবে বাঙালীদের ঘরে ঢুকে ঢুকে শেষ করে দিয়ে যাবে।

অতি প্রত্যুষে আমরা শুনতাম জেনারেল মানেকশর পয়গম। সে কি উত্তেজনা, সে কি রোমাঞ্চ। বেদনার ভিতরেও আনন্দ। বড় কিছু পেতে হলে ত্যাগও স্বীকার করতে হয়। আমরা যুদ্ধের এই কদিনে যে বেদনা ভোগ

করেছি, তার বদলে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, দুঃখ ও আনন্দের, ভীতি ও রোমাঞ্চের যে শিহরণ অনুভব করেছি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে যদি সম্পদ বলে ধরা যায় তবে আমরা সকলেই সেই সম্পদে সমৃদ্ধ।

ক্রমাগত বিমান আক্রমণ চলছিল। আমরা যেন পৃথিবীর অন্যতম এক সাহসী জাতিতে পরিণতি লাভ করেছি। যে জাতির শিশুটি পর্যন্ত সাইরেন উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরিয়ে আনন্দে লাফাচ্ছে। উদ্দাম উত্তাল হয়ে উঠেছে জনসাধারণ, আর কত দেরী? কবে থেকে শুনছি কমলপুর, চৌগাছা, আরও কেন এগিয়ে আসছে না আমাদের মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেরা, মিত্র-বাহিনীর বন্ধুরা? এই সময়ে একটি সুখবর এল যশোরে আমাদের জয়পতাকা ওড়ানো হয়েছে। আর সেখানে এসেছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে আমার নাতি উয়ালি-উল-ইসলাম। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। এতদিনে ওর মা একটু শান্তি পাবে। এতদিন সে রোজা রেখে এসেছে পুত্রের মঙ্গল কামনায়।

দিন যায়। যুদ্ধের অবস্থা যেন একটু ধীর। একটু মন্দা। আমার অধৈর্য। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে চোদ্দ তারিখে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হল গভর্নমেণ্ট হাউসের উপর। বর্তমানে যেটা বঙ্গভবন। বেলা তখন প্রায় একটা। আমরা সবাই একত্র হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছি। কারণ আমাদের সোয়া মাইলের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটছে। সেদিন ১৯১টি রকেট ফায়ারিং হয়েছিল গভর্নমেণ্ট হাউসে। মূল দালানেও ৩০।৪০টি আঘাত হেনেছিল।

এই বোমা বর্ষণের পরেই গভর্নর মালিক **Civil Administration** ভেঙে দিয়ে **Hotel Inter-Continental**এ আশ্রয় নেন। **I. G. of Police** তো আগেই গিয়েছিল।

আমরা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এক ননদ রয়েছে গভর্নমেণ্ট হাউসের ভিতর। তার স্বামী ছিলেন সেখানকার **Assistant Secretary**। নিশ্চয়ই তারা আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তারা একজনও মারা যায়নি গভর্নমেণ্ট হাউসে। তারা ছেলেপিলে নিয়ে নজন কোনরকমে পালিয়ে এসে আমাদের বাসায় উঠেছিল।

আমরা জনসংখ্যায় আরও বেড়ে গেলাম। যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না। শুধু আত্মসমর্পণের অপেক্ষা। আমরা কিন্তু এবার আতঙ্কগ্রস্ত ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লাম পাকসেনা ও বিহারীদের ঘরে ঘরে আক্রমণের কথা ভেবে।

এই সময় যে আল-বদর বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার এক নৃশংস খেলায় মেতে উঠেছিল আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই আঁচ করতে পারিনি। কারণ তখন অবিচ্ছিন্ন কারফিউ চলছিল এবং আমাদের বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

১৬ই ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত আমরা জেনেছি, এখন শুধু কখন এবং কোথায়? আমাদের অধীর প্রতীক্ষার শেষ। জীবন আবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার অবস্থা কি এই বিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল? বোধ হয় না। আমরা বোধ হয় চরম হতাশার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। নতুবা এই কাণ্ড ঘটত না।

বেলা তখন দুপুর। কারফিউ আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় দু-চারজন বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল প্রচণ্ড গুলির শব্দ। আমাদের আর সন্দেহ রইল না শুরু হয়ে গেছে পাক বাহিনীর শেষ অধ্যায়। নিষ্ফল আক্রোশে অসহায় দৃষ্টিতে আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। দুঃখ—আমাদের পুরো ন মাস বেঁচে থেকে শেষ মুহূর্তে যেতে হচ্ছে। গুলির শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। আর দেরী নয়, এবার আত্মরক্ষার চেষ্টা। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে বাড়িতে লোক আছে। চুপিসাড়ে অর্ধশতাধিক লোক এসে আমরা আশ্রয় নিলাম খাবার ঘরে। সবাই মাটিতে বসে পড়েছি। এবার ঝাঁকে, ঝাঁকে গুলির আওয়াজ। আমরা কেঁদে ফেলেছি। বিধাতা এ কি পরিহাস করলেন? গুলির শব্দ আরও কাছে, আরও ব্যাপক। আমরা সবাই পবিত্র কোরাণের আয়াত পড়ছি। এবার আমাদের বাসাটা ঘিরে মেসিনগানের গুলি চলছে। সবাই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে। আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন। ভয়ে, উত্তেজনায় আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। মুখে আমার কোরাণের আয়াত। বললে কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সেই মুহূর্তে স্বামী, পুত্র, কন্যা এই হিসাব ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল আমাদের এই ঘরে এতগুলি প্রাণ এসে আশ্রয় নিয়েছে, ইয়া আল্লাহ্, তুমি এদের বাঁচাও।

হঠাৎ আমাদের সব আশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাসুরপোর ন মাসের শিশু কন্যাটি তারস্বরে কেঁদে উঠল। আর কোন ভরসা নেই। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা। শিশুকে শান্ত করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। আমরা যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। এই যে সবাই আধা উপুড় হয়ে আছেন, সুদক্ষ পুলিস অফিসার ডি· আই· জি· সালাউদ্দীন,

গভর্নমেণ্ট হাউসের অভিজ্ঞ অফিসার ইয়াচিন ভূঁইয়া, ভূতপূর্ব চেম্বার অফ কমার্সের বর্তমান ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসের চেয়ারম্যান আবুল কাসার, সবারই চোখে মুখে কি অসহায় করুণ দৃষ্টি! আমার আর এক পাশে ভয়ে নীল হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন ইডেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা খালেদা সালাউদ্দীন। বসে আছেন আমার বড় জা, ননদেরা। সংসারের নানা জটিল সমস্যা যাঁরা মোকাবিলা করেছেন, তাদের সবারই পদ-মর্যাদাকে ব্যঙ্গ করে ছোট্ট এই শিশু তার হাতে তুলে নিয়েছে সবারই মৃত্যুবাণ।

উদ্‌ভ্রান্তের মত আমি এগিয়ে গেলাম। তাকের উপর থেকে তুলে নিলাম চিনির পাত্র। চামচে করে ভরে তুলে দিলাম শিশুর মুখে। কান্না বন্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গল্প শুনেছি পালাবার সময় শিশুর কান্না থামাতে না পেরে তারা নাকি গলা টিপে হত্যা করেছে! আমি কি তাদেরই উত্তরসূরী? এদিকে দরজায় তুমুল করাঘাত। অনেকগুলি পরিচিত কণ্ঠস্বর। ড্রাইভারের গলাই শোনা যাচ্ছে বেশী, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, বেরিয়ে দেখুন, ইণ্ডিয়ানরা এসে গেছে। জয় বাংলা, জয় বাংলা!

হামাগুড়ি দিয়ে সবাই বেরিয়ে এল। খাবার টেবিলের নিচে এবং আশে-পাশের থেকে। আমরা এতক্ষণ মুক্তিবাহিনীর জয়ের উল্লাস শুনছিলাম। শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আমাদের দামাল ছেলেরা তাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে। রাস্তা দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে মিত্রবাহিনীর জীপগুলো ছুটে যাচ্ছে। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। তখনও চলছে অজস্র গোলাগুলি, একটা স্বস্তি, একটা আরাম যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। শ্রান্তিতে, ক্লান্তিতে আমি যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। আমার দু চোখ ভরে নেমে আসছে ঘুম, অনেক ঘুম। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছেলেরা ছাদ থেকে নেমে খবর দিল স্বাধীন বাংলার একখানা জীপ বাবুলদের বাসায় এসে থেমেছে। মহল্লার মানুষ ভেঙে পড়েছে। সেখানে সবাই শ্লোগান দিচ্ছে—'শহীদ বাবুল জিন্দাবাদ।'…খুব সম্ভব সেই দিনটি ছিল ২৩শে ডিসেম্বর। মেজর হায়দারের কাছে চলেছি রমনা থানায়। হঠাৎ দেখলাম দুইজন ভদ্রলোক আমাদের গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। অনুরোধ করছে তাদের একটু পৌঁছে দেবার জন্য। আর দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ ডি· পি· ধর এসে পৌঁছবেন। এঁরা কোন গাড়ি, ট্যাক্সি কিছুই পাচ্ছেন না। আমি তো দু' হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের চোখে তখন ভারতীয় বন্ধুরা মিত্র বাহিনীর ভাইয়েরা

দেবদূতের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ···আমাদের গাড়িতে স্বল্পক্ষণের দুজন অতিথি, —একজন কেরলের, একজন বোম্বাই-এর অধিবাসী।

এয়ারপোর্টে পেঁাছে মিঃ ওয়াদিয়ার আহ্বানে আমরা মিঃ ধরকে অভিনন্দন জানাবার জন্য রয়ে গেলাম। আমার নিজের আগ্রহও কম ছিল না। কারণ আমাদের পুরো অভিযান চলাকালীন বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী, বিভিন্ন পদক্ষেপে আমাদের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী এই আপন জনটিকে দেখার জন্য আমার ইচ্ছা কম ছিল না।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে রমনা থানায় (ভাইএর সন্ধানে) গিয়ে দেখি, মেজর হায়দার বেরিয়ে গেছেন। মনের ভিতর ঝড় চলছিল ভাইএর কি হল? —শুনলাম প্রেস ক্লাবে ভাইএর খবর পাওয়া যাবে। তখনই ছুটলাম। সেখানে চট্টগ্রাম থেকে সুসাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেবের ছেলে আবুল মঞ্জুর এসেছেন। আমার ভাই এবং মঞ্জুর একই গাড়িতে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে ঢুকেছে। ১৭ তারিখে ভাই এখন ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লিয়াজেঁা রয়েগেছে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে। আমার ব্যাকুলতায় 'হলিডে'র সম্পাদক এনায়েৎ উল্লাহ্ সাহেব সান্ত্বনা দিচ্ছেন,—পাশে দাঁড়িয়েছেন টেলিভিশনের অজুল ইসলাম। একটু পরেই আবুল মঞ্জুর এসে দাঁড়ালেন। আমি তো তাঁকে জড়িয়ে ধরেছি। আর কত কি যে জিজ্ঞাসা করছি, মঞ্জুর একটু একটু হাসছেন আর উত্তর দিচ্ছেন। আমি যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনে ভাসছে শুধু একখানা মুখ আর মনের মধ্যে ঘুরছে একটা কথা,— "আমার ছোট্ট ভাইটি, মায়ায় ভরা মুখটি।"

আমাদের সরকার যুদ্ধ থামামাত্র ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৭১ সালে যত শরণার্থী এসেছে সবাইকে দেশে ফিরতে হবে। ভারত আর শরণার্থীদের স্থান দিতে পারবে না। অতএব আমাদের কাছেও চিঠি এসেছে—**Return the children of Bangladesh to Bangladesh.** আমরা খুব মুস্কিলে পড়েছি। মানুষ নিয়ে কাজ করবার প্রধান বিপদ এই যে ভালবাসা জন্মে যায়। তখন কে বা বাংলাদেশের কে বা এ দেশের এ সব বোধ থাকতে পারে না। বাংলাদেশে যুদ্ধে সব লণ্ডভণ্ড। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেসামাল। এখন এই সব ছোট ছোট শিশু যাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কলেরায় মৃত মায়ের পাশে হামাগুড়ি দিচ্ছিল যে শিশু, সে আজ প্রাণবন্ত হাসিখুশী। এদের কার হাতে সমর্পণ করব? **Deputy**

Magistrate-এর Officeএ? এই সব দিন-রাত ভাবছি।

কিছুদিন থেকে আমার সখ হচ্ছিল যে বাংলাদেশে একটা শান্তিনিকেতনের মত আশ্রম গড়ি। দু দেশের যোগসূত্র হবে সেখানে। ওয়ালির সঙ্গে যশোরে পরামর্শ করি। ওয়ালি বললে, যশোরে পছন্দসই জায়গা দেখুন আমি ব্যবস্থা করে দেব।

যশোরে বিমল রায় বলে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা অনেক দিনের জমিদার। তাঁর পৈতৃক বাড়িটি এ হাঙ্গামার সময় আক্রান্ত হয়েছিল। সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে। এখন তাই তাঁরা শহরে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন। বিমল রায় বললেন,—বাড়িটা আপনি নিন। এই বাড়ি মেরামত করা আমার সাধ্য নয়। বাড়িটা ভাল কাজে লাগুক। আমরা গ্রামের মধ্যে সেই বাড়ি দেখতে গেলাম। এত বড় দালান সহসা চোখে পড়ে না। অনেকটা সেই নীলকর সাহেবদের বাড়ির মতন। কিন্তু দরজা জানলা একখানাও নেই। সব উৎখাত করে নিয়ে গেছে। কিভাবে যে অত বাড়ি ভেঙেচুরে ফেলেছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বাড়ি ভাঙার কি নারকীয় উৎসবই না হয়েছিল। কত লোক কত দিন ধরে ভেঙেছে কে জানে? বিমলবাবু বললেন তাঁর পৈতৃক সমস্ত জিনিসপত্র, বিশেষ করে রূপোর, তামার, কাঁসার জিনিস সমস্ত লুঠ হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের কাঁসার বাসন, তামার পূজোর বাসন খুব সুন্দর। বিরাট বিরাট তাম্রপাত্র সব নিয়ে গেছে। অত বড় বাড়িতে খাট, পালঙ্ক কত ছিল তা অনুমান করা যায়। বিমলবাবু বললেন এ বাড়ি আপনারা নিতে পারেন। আমাদের কারুর সাধ্য নাই যে মেরামত করি। এত বড় সম্পত্তি উনি অনায়াসে দান করতে চাইছেন, কারণ এর আর কোন মূল্য নেই। আমিই বা ভগ্ন প্রাসাদ নিয়ে কি করব? যাক্, সেখান থেকে জীপে করে আমরা একটা বনের মধ্যে ঢুকলাম। বন বটে তবে সেখানে বসতি করবার পরিকল্পনা হয়েছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড নর্দমার ব্যবস্থা হয়েছে। রাস্তা হয়েছে। রাস্তার ধারে ম্যানহোল বসানো হয়েছে। ওয়ালি বলেছিলেন, এখানে একটা কি দুটো প্লট আমায় দিতে পারেন আশ্রমের জন্য। আমরা জীপে ঢুকছি, চারদিকে জঙ্গল। সঙ্গীরা বলতে লাগলেন, এই বনে বহু মানুষকে ধরে এনে মারা হয়েছে। চারদিকে বড় বড় গাছ। ঝোপঝাড়, নির্জন জায়গা। মানুষ মারার উপযুক্ত স্থান বটে। কিরকম গা ছম্‌ছম্ করে উঠল। হঠাৎ আমাদের সঙ্গের একটি ছেলে বললে—মাসীমা দেখুন দেখুন, মানুষের হাড়। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত হাড়। ছেলেটি বললে,—বাচ্চার হাত। আমি বললুম,—রঙটা সবুজ কেন? ওরা বললে,—শ্যাওলা পড়েছে।

কি আশ্চর্য ! মৃত হাড়ের উপর প্রকৃতি জীবনের বিস্তার করেছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি আর ছেলেটি মানুষের নিষ্ঠুরতার কাহিনী বলছে। কিরকম ছায়াঘন সেই ভয় দেখানো বন। অবশেষে একটা গাছতলায় জীপটা রেখে সবাই প্ল্যান নিয়ে জমি মিলিয়ে দেখছে। আমি জীপে বসে আছি। গাছের ছায়ায় দিনের আলো প্রায় ঢাকা। হঠাৎ দেখি দূরে কতগুলো মানুষ ঘোরা-ফেরা করছে। তুটি অল্পবয়সী মেয়ে, একটি প্রৌঢ়া ও তু'একটি ছোট ছেলে। আমি ভাবছি, এ দিকে তো কোনো পথ নেই, ওরা কোথায় যাচ্ছে? এমন সময় দেখি ওরা একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলছে। বুঝতে পারলাম ছেলে তুটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কাজ করছে। আমি ড্রাইভারকে পাঠালাম দেখতে ওরা কি করছে। সে ফিরে এসে বললে, ওরা কিছু বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে ম্যানহোলের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে দেখে, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। নিজেই এগিয়ে গেলাম,—আপনারা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে কি খুঁজছেন?

খুঁজছি আমার ছেলেকে।

প্রৌঢ়া আমার দিকে আবিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি তো চম্‌কে উঠেছি।

ম্যানহোলের মধ্যে ছেলেকে খুঁজছেন?

সঙ্গের মেয়েরা বললেন—দেখুন মাকে বোঝানো যাচ্ছে না।

কাহিনী যা শুনলাম তা হচ্ছে এই ২৫শে মার্চ যেদিন ঢাকায় গুলি চলে সেইদিনই এই ছেলে মাসীমার বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে আর ফেরেনি। তার কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। এঁরা শুনেছেন এখানে অনেক লোককে মেরে ম্যানহোলে ভরে দেওয়া হয়েছে। তাই খুঁজতে এসেছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম,—আজ ন' দশ মাস পরে আপনি কি ছেলেকে ম্যানহোলের মধ্যে খুঁজে পাবেন?

মহিলা আমার দিকে তেমনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। বললেন,—পাব না? একটা বোতাম, একটা আংটি, কিছু তো পেতে পারি?

অনেকদিন পর্যন্ত এ ভয়ানক তুঃখের ছবি ভুলতে পারিনি। পরে শুনেছি যে যখন নানা জায়গায় **Mass grave** খোঁড়া হয়েছে, তখন অনেকে এই সব জিনিস দেখে প্রিয়জনের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

বাংলাদেশে ঢুকে ইস্তক শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা খুব হচ্ছিল। আমি ভাবছি আমাকে যখন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে আসতেই

হবে তখন খুব একটা ভালো জায়গা দেখে আমাদের এই আশ্রমটি করতে হবে। মনে মনে সাধ ছিল যদি শিলাইদহে কিছু করা যায় তাহলে সেখানে রবীন্দ্রচর্চার একটা কেন্দ্র গড়া যেতে পারবে। বাংলাদেশের মানুষরা এখন খুব রবীন্দ্রভক্ত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বাধা দেবার ফলেই তো লড়াই বাধলো আয়ুব খাঁর সঙ্গে। অন্য অনেক কারণের সঙ্গে এটাও যে একটা প্রধান কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আয়ুব খাঁ নাকি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যাপারটা কি? এরা এ নিয়ে এত খেপে উঠেছে কেন? অতএব এখানে যদি শান্তিনিকেতনের একটি replica করতে পারি তাহলে এরা তো সাহায্য করবেই—বিশ্বের লোক দেখতে আসবে। নাই বা হল দুটি দেশ political ভাবে এক, অন্তরে তারা মিলে যাবে—হায়রে দুরাশা!

আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনেকদিন থেকে হিরণকুমার সান্যাল যাকে সবাই হাবুলদা বলে জানে,—যিনি একদা রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছের মানুষ ছিলেন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তিনি যেতে চান কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত হিজলবট বলে একটি গ্রামে। কিন্তু প্রথম যাত্রায় তাঁর যাওয়া হল না। আমি, আমার স্বামী ও প্রফেসর চ্যাটার্জী কুষ্ঠিয়ায় রওনা হলাম। সেখানে সরকারী গেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা দ্বিপ্রহরে কুষ্ঠিয়ায় পেঁছলাম। গেস্ট হাউসটি মন্দ নয়। কিন্তু সেখানে কোনো জিনিসপত্র নেই বললেই হয়। খাবার অত্যন্ত কষ্ট। বাংলাদেশের রান্নার মধ্যে কুষ্টিয়ার রান্নাই বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ।

কুষ্ঠিয়া বাজারের অনেক বাড়িঘর অর্ধদগ্ধ ও ভগ্ন অবস্থায় তখনও আছে। অন্যত্র এরকম দেখিনি। পরদিন খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা শিলাইদহের উদ্দেশ্যে যাবার কথা।

কুষ্ঠিয়াতেও অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। তার মধ্যে লালনের মাজার একটি অত্যন্ত সুন্দর সমাধি। মসজিদের মতো আকৃতি, মিনারও রয়েছে। কিন্তু মসজিদ নয়। আকারে ছোট, ওর ভিতরে ঢোকার পথ নেই। বৌদ্ধ চৈত্য বা হিন্দু সমাধির মতো। রং আকর্ষণীয় নীল, ওরকম নীল সচরাচর চোখে পড়ে না। সারা গায়ে Crazy Chinaর মতো নানা আকৃতির পাথর আটকানো রয়েছে। রোদে ঝলমল করছে। এটাই লালনের দেশ। তবে তাঁর বাড়ি যে ঠিক কোথায় তা আমাদের কেউ দেখায়নি। সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন দেখা করতে এলেন। তাঁরা অধ্যাপক। কুষ্ঠিয়া আমার পিতার জন্মস্থান বলে

আমার সঙ্গে তাঁরা একটা বিশেষ সম্পর্ক অনুভব করেছিলেন। এঁরা সকলেই মুসলমান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ লালনকে নিয়ে কাজ করছেন। অর্থাৎ লালন কোথায় জন্মেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা লালনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা লালনের প্রতিকৃতি তাঁকে দেখেই কিনা—এই সমস্ত বিষয় ছিল আলোচ্য। এসবের মীমাংসা এখন কি করেই বা হবে!

যাই হোক, আমার ভারি আশ্চর্য লাগছিল। আমি জানতুম আমার পিতার জন্মস্থান কুষ্টিয়া। তবে সেটা তো কখন কি করে যেন বিদেশ হয়ে গেছে। সেখানে যে আর পেঁাছানো যায় তা জানতুম না। কুষ্টিয়া আর গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর ছিল আমার পিতার বাল্যকালের স্থান। ছোটবেলা থেকে নাম শুনে এসেছি।

কুষ্টিয়াতে আর একটি দ্রষ্টব্য জোড়াসাঁকোর জমিদারদের শহরের বাড়ি—অর্থাৎ সদরের কাজকর্ম এখান থেকে তো হতই, কর্তারাও এসে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ এ বাড়িতে অনেকদিন থেকেছেন। লাল রংঙের সাদাসিধে আকৃতি। মনে হয়, সেই আদিকাল থেকেই এই রং আছে।

আর দেখলাম কাছাকাছি বিরাট মোহিনী মিল্‌স্‌। এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কলকাতায় চিনতাম বলেই আগ্রহ হল দেখবার। এত বড়ো-প্রতিষ্ঠান সব ফেলে চলে গেছেন তাঁরা। আমার মনে পড়ে যশোরে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন দেশ ভাগ হওয়ামাত্র সমস্ত বড়ো লোক সর্বস্ব ফেলে কিভাবে চলে গেল। তিনি বিশেষ করে নাটোরের কথা বলছিলেন—নাটোর, যাদের বলা হত অর্ধবঙ্গেশ্বর। তাঁরা তাঁদের বিপুল ঐশ্বর্য ফেলে অনায়াসে দেশত্যাগ করলেন। পড়ে রইল তাঁদের সিন্দুক ভর্তি মহামূল্য দ্রব্যসম্ভার, ঝাড়লণ্ঠন, কার্পেট-ফার্নিচার, সোনা-রূপো, বাসন-বই, সমস্তই অক্লেশে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এমন কেন হল? কি করে তাঁরা যেতে পারলেন? কেনই বা গেলেন? তাঁদের আবার কিসের ভয়? আমি মনে মনে ভাবছি তোমাকে কি করে বোঝাব তাই একটি কলমের আঁচড়ে সমস্ত হিন্দুর কাছে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে, তাদের মাতৃভূমি সম্পূর্ণ বিদেশ হয়ে গিয়েছে। তাদের পায়ের নিচে শ্যামলা ভূমি, তাদের আশ্রয়স্থান হঠাৎ চোরাবালি হয়ে গিয়েছে।

কুষ্টিয়া শহর থেকে গড়াই নদী পার হয়ে ওপারে শিলাইদহ। পরের দিন যাওয়া স্থির হল। নির্মল চ্যাটার্জী, আমি, ডাঃ সেন ছাড়াও বাংলাদেশের দুএকটি ছেলে আমাদের সঙ্গ নিল। তাদের অনেক দিনের ইচ্ছা শিলাইদহ

যায়। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। সকলে মিলে পরের দিন দুপুরে জীপে করে রওনা হওয়া গেল। গড়াই নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। এই নদীর কথা কত শুনেছি। কিন্তু চোখে না দেখলে এর আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই হবে না। রবীন্দ্রনাথের লেখায়, চিঠিপত্রে সর্বত্রই কেন গড়াই নদীর কথা আছে, পদ্মার মত না হলেও গড়াই নদী রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জীবনে বেশ অনেকটা জায়গা নিয়েছে। কি বিস্তৃত বালুচর—জীপ থেকে নেমে আমরা সেই বালুরাশির উপর দিয়ে নদীর দিকে দৌড়লাম। খুব চওড়া নদী। জল কূল ছুঁয়ে আছে। ছলছল করে বয়ে চলেছে। বালুর উপর দিয়ে অতি কষ্টে ও সাবধানে আমাদের জীপ নেমে এল জলের ধারে। কিনারায় কিনারায় তখনও ইতস্ততঃ মানুষের মাথার খুলি ভাসছে। আমাদের সঙ্গের একটি ছেলে বললে, পাকিস্তানীরা, রাজাকারেরা এই জায়গাটার নাম দিয়েছিল স্বাধীন বাংলা। ওরা বহু মানুষকে এখানে এনে বধ করেছে। বলত, চল্, তোদের স্বাধীন বাংলায় নিয়ে যাব। একদিন এই ছেলেটি গড়াই নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে, একটি অল্পবয়সী ছেলেকে রাজাকারেরা বেঁধে এনেছে। ছেলেটি আর্তনাদ করছে—আর ওরা তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে। সেখান থেকে সে বিস্মিত হয়ে শুনতে পায় মৃত্যুপথযাত্রী সেই যুবক চিৎকার করে বলছে, হে পূর্ণিমার চাঁদ, তুমি সাক্ষী থেকো, এরা মহাপাপ করছে।

সেদিন স্বচ্ছ নির্মল আকাশের মাঝখানে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছিল। এই বিস্তীর্ণ বালুচরের উপর জ্যোৎস্না ঝক্‌ঝক্ করছে। এই আশ্চর্য সৌন্দর্যের মাঝখানে কি বিস্ময়কর সেই আর্তনাদ—গড়াই নদী, তুমি সাক্ষী থেকো, মহাকাশ, তুমি সাক্ষী থেকো, এরা নিরপরাধ আমাকে বধ করছে। হে আকাশের অসংখ্য তারা, তোমরা এই মহাপাপের সাক্ষী থেকো।

এই বর্ণনা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য এই কবিমন! এত কষ্টের মধ্যেও যার কাছে বিশ্বের এই সৌন্দর্যসত্তা এত বাস্তব।

নদীর তীরে পৌঁছে শুনলাম নৌকোয় করে জীপ ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। দুটো নৌকো এক করে বাঁধা হল। তার উপরে জীপ তুলে, দুধারে বাঁশ দিয়ে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধলে। এ রকম অভূতপূর্ব ঘটনা পূর্বে দেখিনি। সবাই বললে, এ জীপে আমরা বসতেও পারি, কোন ভয় নেই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এলেও অত সাহস আমার ছিল না। আমরা অন্য একটা নৌকোয় বসলাম। ওপারে পৌঁছে পারের খাড়াইটা জীপে বসেই ওঠা

হল। এও বেশ বিপজ্জনক। কাঁচা, কাদা, খাড়া রাস্তা।

ওপারে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের লোকেরা আমাকে বললে, বাঁ দিকে একটা রাস্তা গেছে, ডান দিকে আর একটা। দুটো দিয়েই শিলাইদহে পেঁছানো যায়। তবে ডানদিকের রাস্তাটা এখন মেরামত হচ্ছে। হয়ত পঁচিশে বৈশাখ নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। ও রাস্তা দিয়ে যাওয়া এখন একেবারেই অসম্ভব বলে আমরা বাঁ দিকেরটা ধরলাম। কিছুটা পথ গিয়ে জীপ মাঝে মাঝে লাফ মারতে লাগল। বিরাট বিরাট গর্ত রাস্তার মাঝখানে। এইভাবে কিছুদূর চলতে চলতে অর্থাৎ প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দূরে পদ্মা নদী। সেখানটায় রাস্তা খুব সরু হয়ে গেছে। ঐখানে যদি জীপকে লাফ মারতে হয়, তবে সোজা পড়বে পদ্মায়। ঐ গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম শিলাইদহ দেখবার উৎসাহে কি ভয়ানক কাণ্ডই না করেছি আমরা। ঝোঁকের মাথায় যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথ দিয়ে আর ফিরবার সাহস নেই। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আমি আমাদের সঙ্গী বাংলাদেশের ছেলে দুটিকে বকাবকি করছিলাম। এত বড় একটা জায়গায় পেঁছবার কোন ব্যবস্থাই নেই? আর এত গর্তই বা কেন রাস্তায়? শুনলাম আশেপাশের লোকেরা খুবলে মাটি নিয়ে গিয়েছে বাড়ি মেরামত করবে, বাসন মাজবে,—এই সব মহামূল্যবান কাজের জন্য। আমাদের এই যাত্রাটিকে দুঃসাহসী অভিযান বলা যায়। জীপ থেকে মাঠের মধ্যে নেমে এলাম। সুদক্ষ ড্রাইভার ধীরে ধীরে খালি জীপটি মাঠে নিয়ে এল। দেখলাম পথ থেকে মাঠ ভাল। মাঠের উপর দিয়ে, ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রত্যাবর্তন অতটা বিপজ্জনক হয়নি। সকলেরই মন খারাপ শিলাইদহ দেখা হল না বলে। এর কিছুদিন পরে বাংলাদেশ সরকারের নিমন্ত্রণে আমরা শিলাইদহে যেতে পেরেছিলাম। তখন ডান দিকের পথটি মেরামত হয়েছে। যদিও কাঁচা পথে গ্রীষ্মকালে খুব ধুলো ভোগ করতে হয়েছিল।

আমার বোধ হয় এই নিমন্ত্রণের কারণ, মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে কাহিনী পরে লিখছি। আপাতত শিলাইদহ প্রসঙ্গ শেষ করে নিই। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ১৯৭৩-এর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হবে সে কথা যে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল তা অবশ্য আমার জানা ছিল না। দু'জন ভদ্রলোক কলকাতায় এসে বলে গেলেন যে পঁচিশে বৈশাখ আমার শিলাইদহে যাওয়া চাই। ঐদিন ওখানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আসবেন। এই উৎসবে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে হিরণকুমার সান্যালও

চললেন। তিনি পরে ঐ কদিনের কথা একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন। এখন শিলাইদহের কুঠিবাড়ির একটু বর্ণনা করে নিই। অনেক ধুলোর পথ পেরিয়ে, হঠাৎ দূরে মরুভূমিতে মরীচিকার মত একটা সুন্দর বাড়ি দেখা গেল। এর আগে চারপাশে কোথাও বিশেষ পাকা বাড়ি দেখা যায়নি। এক বাঘা যতীনের বাড়িটি ছাড়া। গাছপালা নেই, মাঠে শস্য নেই তখন। যে দু-একটি গাছ আছে, তার ডালপালা নেই। সব কেটেকুটে জ্বালানী করে ফেলেছে। বাংলাদেশে কয়লা নেই। বুঝলাম বাড়িটা সম্প্রতি রং করা হয়েছে। খুব লালের আধিক্য দেখা গেল। এই কম্পাউণ্ডেও বিশেষ গাছপালা নেই। শুধু দুটি বকুল গাছ। এক জল নেমে যাওয়া পুকুরের ঘাটের দু'পাশে ছোট্ট ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম এই সেই বকুল গাছ। বোধ হয় এই বকুল তলাতেই কবি চেয়ার নিয়ে লিখতে বসতেন, আর বোষ্টমী ফুল নিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে হাতে মোজার বাধা পেয়ে বিষণ্ণ হতো। সব সময় জুতো মোজা পরে থাকা যে মাটির সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে বাধা তা কবি বুঝতে পারলেন।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ি অন্যান্য নীলকর কুঠিবাড়ির কাছে কিছুই নয়। নীলকর সাহেবদের বাড়িগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, বিরাট বিরাট দরজা জানলা, মস্ত মস্ত কম্পাউণ্ড। পরে এই কুষ্টিয়ারই হিজলবটে দেখেছি হেরম্ব মৈত্রের বাড়ি। ওটা নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে কেনা। তার কাঠের সিঁড়িগুলো হবে প্রায় আট ফুট প্রশস্ত। শ্রীনিকেতনের অফিস বাড়িটাও ছিল কুঠিবাড়ি। সেটাও শিলাইদহের বাড়ি থেকে বড়। একতলায় মাঝখানে একটি হলঘর। দু ধারে দুটি ঘর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে উপরেও সেই রকমই তিনখানা ঘর। দু পাশে দুটি বেডরুম, সঙ্গে তার বড় বড় বাথ-রুম। সামনে বড় বারান্দা। পাশে সরু বারান্দা। তার সঙ্গে পাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। যে বেডরুমটায় রবীন্দ্রনাথ থাকতেন সেই ঘরটায় আমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাথরুমেই চিনতে পারলাম ঠাকুরবাড়ির পরিচিত স্টাইল। ছোট একটা নীচু দেওয়াল দিয়ে স্নানের জায়গাটি ঘেরা। তার ওপরে সাবান, মগ, তোয়ালে রাখার ব্যবস্থা। এ আমার অত্যন্ত পরিচিত। শোবার ঘরটিতে দুটি করে খাট ছাড়া আর এক টুকরো ফার্নিচারও নেই।

রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘরে বসে ভাবছিলাম, এই ঘরে তিনি সপরিবারে বাস করে গেছেন। এইটাই তাঁর সংসারজীবনের আনন্দময় ক্ষেত্র। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তিনি যত নীরব আমাদের তত ঔৎসুক্য। কিন্তু সে

ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য ওখানে কোথাও এক টুকরো জিনিস নেই। তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে দেখলাম ছোট একটি ঘর। তার পাশে একটি ছোট ছাদ। ঘরে একটা গোল লেখবার টেবিল এবং একটি ইজিচেয়ারের ফ্রেম। ভিতরের বেত কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে? এটা দেখেই যেন চিনতে পারলাম, কারণ এই ঘরের বর্ণনা অনেক জায়গায় লেখা আছে। এগুলি শুনেওছি। পরে ওখানকার অনেকেই বললেন এ বাড়ি বহু সুন্দর সুন্দর জিনিসে সাজানো ছিল। পরে একে একে ওখানে যতো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা এসেছেন বা যতো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাবধানে রাখবেন বলে কিছু কিছু জিনিস বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ফলে একটু একটু করে জিনিসপত্তর অন্যের বাড়িতে চলে গেছে। সেই ছোট ঘরটির পাশে তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের পদ্মা দেখতে পেলাম। প্রথমটা চমকে গেছি—পদ্মা এত দূরে? গাছপালার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য। তার পরেই মনে পড়ল কবি নিজেই লিখেছেন তাঁর প্রেয়সী পদ্মার সঙ্গে বিরহের কথা—

"আগে পদ্মা কাছে ছিল। এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে। আমার তেতলা ঘরের জানলা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি। অথচ একদিন ঐ নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্রি ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত। রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত······এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমায় চেনে না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যত দূরে দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি মাঝখানে কত মাঠ কত গ্রামের আড়ালে, সব শেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতম পাড়ের মত একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখার কাছে ঐ যে একটা ঝাপসা বাষ্প লেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়। জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে। আর যে স্রোত বন্যার মত প্রাণ মনকে প্লাবিত করেছে সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।"

এই লেখাটির মধ্যে আর একটি লাইন আছে; "আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে। ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি।" বেতশূন্য যে আরাম কেদারাটির কথা আগে বলেছি সম্ভবত সেটি এই কেদারার

ভগ্নাংশ। ঐ চেয়ারটি স্পর্শ করে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবহমান কালের ধারাকেই যেন একটুখানি স্পর্শ করলুম।

দোতলার গাড়িবারান্দার ছাদে এসে বসা গেল। ইতিমধ্যে হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় দুখানি বড়ো বড়ো মাদুর যোগাড় করে ফেলেছেন। ঘরের ভিতর অসহ্য গরম। আমরা ভাবছি এইবেলা সুখাদ্য আসবে। খিদেয় ছটফট করছি। সেই দুপুরে কুষ্টিয়া থেকে ভাত খেয়ে বেরোনো হয়েছে। তারপর একপেয়ালা চাও মেলেনি। শুনলাম রান্না হচ্ছে কুঠিবাড়ির অফিসে, যেখানে পূর্বে গোমস্তারা বসবাস করত। চারদিক নির্জন ছিল। আকাশে জ্যোৎস্না ছিল। পরিবেশ সুন্দর, বন্ধুত্ব মনোরম। আমরা তিনজনে গল্প করে ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করতে লাগলাম। অবশেষে রাত্রি এগারোটার সময় এলো ভাত আর একটা মাছের শুকনো তরকারী। মাছে আঁশটে গন্ধ। মুখে দেওয়া গেল না। তবু এমন জায়গায় এসেছি, মনের আনন্দ হরণ করে কে! আমরা তিনজনে বারান্দায়ই শুয়ে রইলাম। সে রাত্রি বেশ ভালোই কাটলো। তার-পরের দিনের অবস্থা ভয়ানক। কোনমতে তো মিটিং সারা গেল—কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে লোক এসে আগের দিনের শ্রান্তিকে ঝড়ে উড়িয়ে দিল। এ বর্ণনা হিরণকুমার সান্যাল মহাশয়ের লেখাতে আছে। সেখান থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি ঃ—

"গোড়াই নদীর বালি ঠিক আগের মতোই। ঠিক কুড়ি বছর আগে যা দেখেছিলাম—হিজলাবটে। এই তো কুষ্টিয়া থেকে ভাঁটিয়ে গেলে মাত্র বারো মাইল।—বহুদূর থেকে দেখা যায় ঝাউ গাছের সার। গোটা অঞ্চলে বড়ো ঝাউ গাছ—সেই সাহেবদের আমলের—আর কোথাও নেই।

জীপ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিলাম প্রায় জলের ধারে। আমি একা নই, অভিভাবিকা রয়েছেন মৈত্রেয়ী দেবী, আর আছেন ডক্টর সেন। অনেক বছর মংপুতে সিনকোনা উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করেও ডক্টর সেনের কথায় বার্তায়, ব্যবহারে কোথাও এতটুকু তিক্ততার লেশ নেই। মধুর ভাষী, রসিক ও পরের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে সতত সজাগ।

—খেয়া এসে ঘাটে লাগলো। কিন্তু এ তল্লাটে কোনো ঘাটে কোনো দিন চোখে পড়েনি নৌকোতে মোটরগাড়ি পারাপার। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুঠিবাড়ি থেকে পালকি করে আসতেন ওপারে কয়ারঘাটে। তারপর পার হয়েই কুষ্টিয়া রেলস্টেশন। তখন চর পড়তো ওপারে কয়াতে। স্টেশনের প্রায় গায়ে সে দোতলা কুঠিবাড়িটি এখনও আছে। দুপুরে সাইকেল রিকশা করে

প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গিয়ে দেখে এসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের তুই ভাইপো স্থরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ এই বাড়িটিকে করেছিলেন তাঁদের পাটের ব্যবসা-কেন্দ্র। ব্যবসা অবশ্য টেকেনি। এদের রক্তে নেই ব্যবসা করা…আছে শুধু দেউলে হওয়া সেই দ্বারকানাথের আমল থেকে।

…বেরিয়েছি কোন ভোরে কলকাতা থেকে। যশোরে মৈত্রেয়ী দেবীর অনাথ আশ্রম খেলাঘরে ঘণ্টাখানেক আশ্রয় না পেলে এতক্ষণ দাঁড়াবার শক্তি থাকতো না।…হিজলাবট আমায় টানছিল। তাই এদিক ওদিক খোঁজ করলাম কি ভাবে ডাঙা পথে যাওয়া যায়। কুড়ি বছর আগে যেতে হত নৌকায় বা রেলে গিয়ে গোড়াইর ওপারের কুমারখালি বা খোকসা স্টেশনে নেমে আবার নদী পার হয়ে কুঠিবাড়ির পথ ধরা। এখন এক খাল গিয়েছে কুষ্ঠিয়ার পাশ দিয়ে হিজলাবট হয়ে আরও অনেক দূর। তার পাশ দিয়ে ইটে বাঁধানো রাস্তা। কিন্তু আপাততঃ শিলাইদা—শিলাইদা যাবার প্রায় মেঠো পথকে কোনোরকমে একটু চওড়া করে মোটরের সড়ক বানাবার চেষ্টা হয়েছে। মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ এই পথ দিয়ে পাল্কিতে কুষ্টিয়া আসতে আসতে রাজসিংহ পড়ে শেষ করেছিলেন।—অনেকটা পথ এগোনো গেল। এমন সময় মৈত্রেয়ী দেবী বলে উঠলেন—ঐ যে দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি কিছু দূরে বেশ বড়ো গোছের লাল বাড়ি। মনে পড়ল সত্যেন দত্তের কবিতা—যাত্রীরা সবে গাহিয়া উঠিল—দেখা যায় বারানসী? আমরাও তো আজ তীর্থযাত্রী। শিলাইদহর বাড়িটা কিন্তু খুব একটা বিরাট কিছু নয়। যে নীলকর সেলী সাহেবের নামে শিলাইদহর নাম তাঁর বিরাট কুঠি আজ কীর্তিনাশার গর্ভে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহতে থেকে জমিদারীর তদারক করতেন তখন বালক রবীন্দ্রনাথ এসে এই বাড়িতে ছিলেন। তারপর এই বর্তমান কুঠিবাড়ি তৈরী হয় স্থতরাং বাড়িটা তেমন সেকেলে নয়। প্রাচীন নীলকুঠির জমজমা ভাব এতে নেই।

পিতৃঋণ শোধ করবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারদের কাছে দ্বারকানাথের বিপুল সম্পত্তি প্রায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বিলিয়ে দিলেন বলছি কারণ পাওনাদারদের কাছে এমন দলিলপত্র ছিল না যার জোরে মামলা হতে পারে।

…মহর্ষি ও বিশেষ করে তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই সব টুকরো টাকরা জমিদারী থেকে বেশ একটু মোটা আয়ের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। এই জমিদারীরই একটা পরগণা বিরাহিমপুর আর তার সদর হল

শিলাইদহ। সাজাদপুর পরগণার সাজাদপুরেও ছিল—এখনও আছে—একটি কুঠিবাড়ি। তৃতীয় পরগণা কালীগ্রাম। এখানে কোনো কুঠিবাড়ি ছিল না। নাগর নদীর ধারে পতিসর গ্রামে ছিল একটি কাছারী। রবীন্দ্রনাথ এখানে গেলে থাকতেন নাগর নদীর উপরে বজরায়।...সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা বসেছিলাম পশ্চিমের পুকুরের বাঁধানো ঘাটে। মৈত্রেয়ী দেবী মনে করিয়ে দিলেন এই বকুলতলাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোষ্টমীর সাক্ষাতের কথা। ...এ বোষ্টমী যে কাল্পনিক নয় তা আমরা জানি। তবে গল্পের বোষ্টমী হয়তো অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো শিলাইদহ যান ১৯২৩ সালে। মনে পড়ে ঐ বৎসর শান্তিনিকেতনে কবিকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি শিলাইদহতে আর তেমন যান না কেন? উনি শুধু বলেছিলেন—'আমার নদী চলে গেছে দূরে।' ...সেই নদীর দূরে যাবার বেদনা নিবিড়ভাবে ফুটেছে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে শ্রীযুক্ত অমিয়-চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে, "পুরোনো শিলাইদহ" সবই তেমনি আছে। কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদহ ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে—তার আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এ বিচ্ছেদ সামান্য নয়—যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই। —সোনার নূপুরগুলি রয়েছে পড়ে, মুরজ-মুরটী-মৃদং কিছুরই অভাব নেই—কেবল যে পা দুখানি নিরন্তর নৃত্য করে বেড়াতো তারাই গেছে কোথায় চলে। যেখান থেকে কিছুদিনের জন্যও চলে যাই ঠিক সেখানটিতে কিছুতেই আর পৌঁছতে পারিনে। রেলের স্টেশন ঠিক আছে, রেলগাড়িও চলছে কিন্তু আসল জায়গাটি লুকিয়ে কোথায় যে সরে যায় তার ঠিকানা পাবার জো থাকে না।" ...পদ্মা এখন শিলাইদহ থেকে কিছুদূরে গেলেও একেবারে অদৃশ্য হয়নি। কুঠিবাড়িতে থাকলে যে ঘরটি ছিল কবির আস্তানা তিনতলার সেই সিঁড়িঘর থেকে দেখলাম পদ্মার জলরাশি চিক্‌চিক্ করছে বেলাশেষের ম্লান আলোয়। ওপারে এক সময় দেখতে পাওয়া যেত পাবনা শহর। কিন্তু এখন মাঝখানে বিরাট চর। আর তার উপরে হয়েছে গ্রামের পত্তন। যে চরের উপর এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াতেন ও নিজের গান শিখিয়ে শুনতেন চিত্তরঞ্জন দাসের ভগ্নী অমলা দাশের জোরালো গলায়। সে চরের সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সব গান আজও ধ্বনিত হচ্ছে দুই বাংলার প্রান্ত থেকে প্রান্তে।...পরদিন পঁচিশে বৈশাখ। কুঠিবাড়ির পূর্বদিকের আম-বাগানে কবির জন্মবার্ষিকীর উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হল সকাল ও সন্ধ্যায়।

…বিকেল হতে না হতে সে কি ভীড়! সবারই লক্ষ্য কুঠিবাড়ি। …রাতের খাওয়ার পর্ব শেষ হলো ভালোয় ভালোয়। কিন্তু ঘুমোবার উপায় ছিল না। বাড়ি গিজগিজ করছে লোকে। নিচের বাগানেরও সেই একই অবস্থা। বেশীর ভাগই যুবক, প্রায় কিশোর। প্রচণ্ড তাদের উৎসাহ। গানের পর গান, বেসুরো গান যে যার মতো গাইছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। সিনেমার গান যা শোনা যায় এপার বাংলায় অবিকল তাই। বুঝলাম তুই বাংলার কিশোর সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো হেতু নেই।

ভোর হতে না হতে মৈত্রেয়ী দেবী বললেন—যথেষ্ট হয়েছে। এবার সরে পড়া যাক। আমি করুণ স্বরে বললাম—তবে কি হিজলাবট হয়ে আমরা ফিরব? মৈত্রেয়ী দেবী প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। জীপ যখন ছাড়লো তখন অনেকটা ফর্সা হয়েছে। কুষ্টিয়ার এক বাংলার অধ্যাপক হলেন আমাদের সঙ্গী। সারা পথ তাঁর সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা। ডক্টর সেন ও আমি শ্রোতা। অধ্যাপক মহাশয়কে কুষ্টিয়ায় পৌঁছিয়ে দিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে জলযোগ সেরে আমাদের জীপ রওনা হল হিজলাবটের অপরিচিত পথে খালের ধার দিয়ে। যশোর থেকে কুষ্টিয়াতে আসতে যে খাল পার হয়ে এসেছিলাম কুড়ি বছর আগে তার চিহ্নও ছিল না। খালের ধারের পথটি ইঁট বাঁধানো হলেও খুব আরামের নয়। মৈত্রেয়ী দেবীর বেশ কষ্টই হচ্ছিল (রৌদ্র ছিল প্রখর)…আমি গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করতে করতে যাচ্ছিলাম।—এটা কি গ্রাম?—চাঁপড়া। শুনেই বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি ছিল এখানে। কিন্তু আজ তা গোড়াইএর গর্ভে। কীর্তিনাশার দুহিতারও দাপট কম নয়। …এটা কি গ্রাম? এনায়েৎপুর। তাই তো, এর পরই তো হিজলাবট। ঐ যে দেখা যাচ্ছে কুঠিবাড়ির লাউ গাছ। …জীপ গিয়ে থামলো বড়ো বড়ো তেঁতুল গাছের ছায়ায়। …এর পর ফেরবার পালা। আবার সেই ইঁট বাঁধানো পথ দিয়ে কুষ্টিয়া ও তারপর সোজা যশোর। ফেরবার পথে মৈত্রেয়ী দেবী দেখলেন ছোট ছোট নূতন খড়ের চালের বাড়ি—পাকবাহিনী যেসব ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো আবার নূতন করে গড়ে দিয়েছেন ক্যানন সুবীর বিশ্বাসের পরিচালনায় ক্যাথেড্রাল রিলিফ সোসাইটি। আশ্চর্য লোক এই সুবীর বিশ্বাস। দিনের পর দিন অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের গৃহহারা দুর্গতদের নূতন ভিটে গড়ে দেবার জন্যে।

এর পর হুদিন কাটলো যশোরের খেলাঘরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের নিয়ে এই খেলাঘরের সৃষ্টি। এর পত্তন হয়েছিল পশ্চিম-বাংলাতেই। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠলো যে বাংলাদেশের নিরাশ্রয় শিশুদের আশ্রয় দিতে হবে বাংলাদেশের মাটিতেই। তাই খেলাঘর হল দু ভাগ। যশোরের খেলাঘরে রোজই প্রায় আসে নতুন নতুন আশ্রয়-প্রার্থী। তাদের বেছে নেওয়া একটা সমস্যা।...সিদ্দিকীদের বাড়ির বৌ আর তার দেওর তরুণ সিদ্দিকীও এই খেলাঘরের কাজে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ। অতি করুণ এই পরিবারটির কাহিনী। সবচাইতে ছোট ছেলেটি নিখোঁজ হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়। পরে খোঁজ পাওয়া যায় সে নিহত হয়েছে। কিন্তু কি করে একথা তার মাকে বলা যায়। তিনি পথ চেয়ে আছেন ছেলে ফিরবে বলে। বাংলাদেশের অগণিত পরিবারেরই হয়েছে এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সারা বাংলাদেশের প্রাণস্পন্দন অনুভব করছিলাম এই খেলাঘরে বসে।”

[বাংলাদেশে চারদিন, হিরণকুমার সান্যাল। নবজাতক ১৩৮০, ১ম সংখ্যা]

বাংলাদেশের খেলাঘরের কাহিনীও এখানে আর লিখছি না। ১৮ই মার্চ আমরা সত্তর-আশিটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এ আশ্রমের জিনিসপত্র সব ট্রাকে বোঝাই করে করে যশোরে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে আমাদের একটি সুন্দর বাংলোয় সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের রিলিফ-মন্ত্রী কামরুজ্জমান সাহেব। সেখান থেকে পরে আমরা ঢাকায় যাই। মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পূর্বে ১৯৭৪ সালে দেশে ফিরে আসি। এ দু’ বছরের ঘটনা এখানে লিখছি না। শুধু একটি কাহিনী লিখছি যাতে বোঝা যাবে যে স্বস্থান-বিচ্যুত এই সব ছেলেমেয়েদের কি বিপদই না হয়েছিল এবং এদের সাহায্য করতে পেরে আমরা কতোটা সার্থকতা লাভ করেছিলাম। কল্যাণীতে থাকা-কালীন পুলিস কলকাতা থেকে দু-একটি বড়ো মেয়ে নিয়ে এসেছিল। এদের মধ্যে স্বপ্না সাহা বলে একটি পনেরো বছরের মেয়ে ছিল। মেয়েটির গায়ে কিছু গয়না, সে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। গয়না পুলিস জিম্মায় নিয়ে গেল, মেয়ে রইল আমাদের জিম্মায়। মেয়েটি আমাদের বলেছিল তার বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে পাক সৈন্যদের গুলিতে। ওরা দল বেঁধে আসছিল ভারত-সীমান্তের দিকে। এমন সময় পাকিস্তানী টহলদার সৈন্যরা বললে—হল্ট্। লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গুলি করতে লাগলো। সে দেখলে তার মা এবং বাবা গুলি খেয়ে দুজনেই মাটিতে ঝুপঝুপ করে পড়ে গেল।

সে একটু পিছনে ছিল। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে সে একটা গর্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল। যখন তার জ্ঞান হয় তখন দেখে একটি বৃদ্ধা তাকে ঠেলাঠেলি করছে। তারই সঙ্গে ও 'ইণ্ডিয়া'য় এসেছে। এ মেয়ে যে সম্পূর্ণ অনাথ তাতে আর সন্দেহ কি। তবু যশোরে এসে আমরা প্রত্যেক বালক-বালিকার গ্রামের ঠিকানায় চিঠি দিলাম। অবশ্য যারা ঠিকানা বলতে পারলো তাদেরই। স্বপ্না সাহার বাড়িতে খবর গেল। কয়েকদিন পরই ডেপুটি কমিশনার বললেন স্বপ্নার বাবা তাঁর কাছে এসেছেন এবং মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চান। আশ্রমের মেট্রন স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি নিশ্চিত জানো যে তোমার বাবা মারা গেছেন? সে বললে—সে আবার কি? আমার চোখের সামনে আমি তাঁকে গুলি খেয়ে পড়তে দেখেছি। সবাই পরামর্শ করলেন হঠাৎই এই ভদ্রলোককে উপস্থিত করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া ঐ ভদ্রলোক এর পিতা কিনা কে জানে! এই সব আশঙ্কায় তাঁরা মেয়েটিকে একটু একটু করে প্রস্তুত করছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন—কাল সকালবেলা তোমার গ্রামের এক ভদ্রলোক আসবেন। তাঁর কাছে তোমার বাড়ির সব খবর পাবে। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠেই মেয়েটি তৈরি হয়েছে। অপেক্ষা করছে—হঠাৎ দেখে তার বাবা গেটের কাছে সাইকেল রিকশা থেকে নামছেন। মাঝখানে একটা প্রশস্ত মাঠ। স্বপ্না দূর থেকে তার বাবাকে দেখে কাঁদতে শুরু করেছে। ওর বাবা মাঠ পেরিয়ে দৌড়ে আসছেন। পিতা-পুত্রীর সে অভিনব মিলন-দৃশ্য আমি দেখিনি। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। পিতা যদিও আশা রেখে থাকেন মেয়ের জীবন সম্বন্ধে কিন্তু মেয়ে তো এতটুকু আশা রাখেনি। এরকম ঘটনা আরও শুনেছি। লাইন করে দাঁড় করিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করা হচ্ছে—ভয় পেয়ে অনেকে পড়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা ভেবেছে গুলি খেয়ে পড়েছে। কেউ কেউ গুলি খেয়েও বেঁচেছে। রক্তাপ্লুত দেহগুলির মধ্যে রক্ত-মাখা হয়েও পড়ে থেকে অনেক পরে সুযোগ পেয়ে উঠে গেছে। এদেরও সেরকম হয়েছিল। এ হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দ-দৃশ্যে সেদিন খেলাঘর আনন্দে মেতে উঠেছিল।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়টা মুজিবর রহমান বাংলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা হিসেবে আমাদের মনের সামনে জ্বলজ্বল করতেন। সেই যে পঁচিশে মার্চ তাঁকে ধরে নিয়ে গেল—তিনি কোথায় গেলেন কেউ জানে না। তিনি জীবিত কি মৃত কে বলতে পারে? অনেকটা যেন সুভাষচন্দ্রের উধাও হবার

পরে যেমন অবস্থা হয়েছিল সেইরকম। অবশ্য এখানে সকলেই জানতো পাকিস্তানীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সকলেই জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল কবে তিনি আসবেন বা আসবেন কিনা। যুদ্ধ শেষ হবার পরে পরেই শোনা যাচ্ছিল যে পাকিস্তানে তাঁর বিচার হবে। বঙ্গবন্ধু পরে বলেছিলেন বিচার হয়েছিল এবং কবরও খোঁড়া হয়েছিল কিন্তু কবরে যেতে হয়নি। ১৯৭২-এর ৩রা জানুয়ারী তাঁকে জুলফিকার আলি ভুট্টো বিনাসর্তে মুক্তি দেন। আজ মনে হয় পাকিস্তানের কবরে গেলে ভালোই হত—তিনি শহীদ হতেন। এভাবে পুত্রতুল্য বাঙালী ছেলেদের চক্রান্তে মধ্যরাত্রে সপরিবারে নিহত হবার মতো পরিতাপজনক ঘটনা ঘটতো না। মুজিব এত কাজ করলেন—কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সময়মতো মরতে পারলেন না।

ঢাকায় যাবার কথা হতেই ভেবেছিলাম মুজিবরকে নিজের হাতে কিছু উপহার দেব। একটা চামড়ার কেস কিনলাম। তার এক পাশে রবীন্দ্রনাথের নিজের সই করা ফটোগ্রাফ—অন্য পাশে তাঁর নিজের হাতে লেখা সেই প্রসিদ্ধ গান—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।' এর সঙ্গে মুজিবকে উদ্দেশ্য করে আমি একটি অভিনন্দন লিখেছিলাম। তাতে কি লিখেছিলাম তা আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে তাকে আমি 'নরোত্তম' বলে সম্বোধন করেছিলাম।

এসে অবধি ভাবছি কি করে তাঁর হাতে এই মহামূল্য উপহারটি দেব। তিনি এত ব্যস্ত, তাঁর কাছে এত জনসমাগম যে কথাটা উত্থাপন করতেই লজ্জা করে। তবু আমি একদিন আমিনুল হক বাদশাকে বললাম—দিদির একটা অনুরোধ রাখবে? সে বললে—আপনার অনুরোধ রাখার জন্য কি পীড়াপীড়ি করতে হবে? আমি বললাম—আমি মুজিবরকে একটা উপহার দিতে চাই। উপহারটি কিন্তু সামান্য নয়। আমি ছাড়া এই দুনিয়ার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যে ওঁকে এমনটি দিতে পারে, ইন্দিরা গান্ধীও নয়। বাদশা তো চমকে উঠেছে। আমাকে এত অহংকারী বলে সে জানতো না। তারপর উপহার দেখে তো তার চক্ষু স্থির। বললে—এটা আপনি দিয়ে দেবেন? আমি বললুম—বাদশা, ওনাকে দেব না তো কাকে দেব। মুসলমানের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবার জন্য ওনার মতো কষ্ট আর কে করেছে?

অবশেষে যথাসময় বাদশা, আমিরুল ইসলাম, মৌদুদ ও আমরা তিনজনে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে উপস্থিত হলাম। এটা মুজিবরের নিজের বাড়ি নয়। ইয়াহিয়া খাঁ এখানে থাকতেন। তাঁরই জিনিসপত্রে বাড়ি সাজানো

রয়েছে। এখানেই মার্চের মাঝামাঝি ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঘরে ঢুকলাম। চারদিকে রিপোর্টার ক্যামেরাম্যান তাক করে রয়েছে। মুজিব আমাকে পাশে বসতে বলে প্রথম কথাই বললেন দিদি, আপনার বই (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) আমি কলেজে থাকতে পড়েছি। আমার মনে আছে এই বইয়ের মতো বই—ইত্যাদি। আমি বুঝলাম এই মানুষ মানুষকে খুশি করার মন্ত্র জানেন। উনি যদি বলতেন—আপনি বাংলাদেশের জন্য অনেক করেছেন, আপনার জন্য একটা সোনার হার এনেছি, তাহলে কি আমি এত খুশি হতাম ? লেখককে খুশি করার এই একটি মন্ত্র—তোমার লেখা আমার ভালো লেগেছে। যাই হোক আমার উপহার পেয়ে উনি অবাক হলেন। তারপর আমি আমার অভিনন্দন পাঠ করলাম। উনি ছবি আর কবিতাটি নিয়ে দেখলেন। তার পরে অ্যালবামটি বন্ধ করে মাথায় ছুঁইয়ে বাদশার হাতে দিলেন। তিনি বললেন—বাদশা রাখো। আমাদের রবীন্দ্র মিউজিয়ম হবে, সেখানে রাখা হবে। এ আমার ব্যক্তিগত জিনিস হতে পারে না।—তিনি বললেন—দেখুন দিদি, আমরা বাঙালী হয়েও তাঁর জন্য কিছুই করতে পারি নাই এবার করব। আপনি কি জানেন উনিও বাংলা-দেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন শহীদ। আমি বললাম—জানি বইকি, ওঁর গান নিয়ে তো কম হাঙ্গামা হয়নি।

মুজিব বললেন—না না, তা নয়, উনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। একজনের বাড়িতে দেওয়ালে তাঁর মস্ত বড়ো ছবি টাঙানো ছিল। সৈন্যরা বাড়ি সার্চ করতে এসে সেই ছবি দেখে ঐদিকে বন্দুক তুলে গুলি করে দিলে ছবিখানা চৌচির হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমরা গল্পও শুনেছিলাম যখন পাক সৈন্যরা প্রতি বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখত এবং জিজ্ঞাসা করলেই শুনতো উনি আমাদের নানা, একবার তারা দারুণ চটে গিয়েছিল। বলেছিল শ্যালক বাঙালীদের সকলেরই এক নানা।—মুজিব বলে চলেছেন—আমাদের মুক্তি-যুদ্ধের চিন্তায় প্রেরণা, উনি আমাদের চরম শক্তি। আবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুলিও খেয়ে গেলেন।

আমার চোখে জল এসে গেল। আমি বললাম—শুধু শরীরের আঘাতই তো বড়ো আঘাত নয়। মুজিবর বললেন—আমার ইচ্ছা আছে তাঁর নামে একটা ইনস্টিটিউট করব।

শিলাইদহে করুন।

একটু গুছিয়ে নিয়েই চেষ্টা করব।

যদি সত্যই তাই করেন তবে সেখানে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব।

হয়তো এই কারণেই পরের বছর শিলাইদহে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। যখন আমি মুজিবরকে উপহারটি দিচ্ছিলাম এবং উনি দু হাত পেতে নিচ্ছিলেন তখন চতুর্দিক থেকে কি প্রচণ্ড আলো আর ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে চক্ষু কর্ণ সব বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু পরে বহু চেয়েচিন্তে শুধু একখানি ছবি পেয়েছি।

আমার কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছিল শিলাইদহে 'খেলাঘর' নিয়ে যাব ও তাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রচর্চার প্রতিষ্ঠান বা দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন গড়ে উঠবে। সে আশা পূর্ণ হবার প্রতিবন্ধকতা যে কত তা ঠিক মত অনুমান করতে পারি নি। আমাকে সুলতানা বললেন, শিলাইদহে যাওয়া নদীর উপর ব্রীজ না হওয়া পর্যন্ত সহজ হবে না। তার চেয়ে বংশী নদীর কাছে একটা জমির খবর পাওয়া গেছে সেটা দেখবেন চলুন। আমরা দল বেঁধে সাভারের কাছে একটা জায়গায় গেলুম।

বংশী নদী এই শীতকালেও একেবারে ভর-ভর। তীর ছুঁয়ে রয়েছে। কোন পাড় নেই। এমন সুন্দর মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে থাকা নদী কমই দেখা যায়। যে ধুলোর রাস্তাটা দিয়ে এখানে এসে পৌঁছলাম তার মাঝখানে একটি মন্দির। মন্দিরটির অবশ্য একেবারেই ভগ্নদশা। কিছু কিছু বাঁশের চাটাই বা চট দিয়ে ফাঁকফোকরগুলো ঢাকা। শুনলাম ওর ভিতরে একজন বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করেন। এই পাকিস্তানী যুদ্ধের সমস্ত কালটা তিনি ও তাঁর বিগ্রহ যে ছেঁড়া কাঁথায় মুখ ঢেকে লুকিয়ে বেঁচে আছেন! পাশে একটি বিরাট ভগ্ন বাড়ি। আশ্চর্য স্থাপত্য কিছু কিছু এখনও অটুট। বিরাট বিরাট কারু-কার্যময় থাম দেখলেই অনুমান করা যায় প্রাসাদটি কি রকম ছিল। শুনলাম এটি রাণী ভবানীর বাড়ি। তার থেকে অল্প দূরে ঐ বাড়িরই ভগ্নাংশ একটা ঘর আছে, ঘরটা প্রকাণ্ড। সেখানে কোন সরকারী অফিস চলছে। সুলতানা বলতে লাগলেন, ঐ অফিস ঘরটি সরকারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ঐখানে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের রেখে আস্তে আস্তে মনোমত বাড়িঘর করে নেওয়া যায়। পরিবেশটি এতই সুন্দর এবং আশ্রম গড়ার উপযুক্ত যে, আমার মনটা খুবই সায় দিল। এমন সময় দেখি আমাদের চার পাশে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। একজন বললে,—ওখানে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে। দিন সাতেক আগে একটা খুনও হয়েছে। যে লোকটি বলছিল, সে একজন বৃদ্ধ। ঠিক আমাদের ভয় দেখাবার জন্য যে বলেছিল সেরকম মনে হয় না। সে আরও

বললে, মুক্তিফৌজেরা যেসব বন্দুক পেয়েছিল তাও তাদের হাতেই আছে। তারা সেই বন্দুক নিয়ে এখন ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। সেই বরণীয় মুক্তিফৌজের ইতিমধ্যেই এই অবস্থা।

আমি তখনও জানতাম না যে, মুজিবের অভ্যর্থনার জন্য টাঙ্গাইলের বিরাট জনসভায় দেশী, বিদেশী সাংবাদিকদের ও মান্যগণ্য লোকের সামনে তথাকথিত বীর বিপ্লবী এক নায়ক রাজাকারদের কয়েকজনকে বন্দী করে মঞ্চের উপর এনে কিভাবে বেয়নেট দিয়ে মেরেছিল। বন্দীকে বধ করা যে কোন বীরত্বের কাজ নয় সেটুকু তার মাথায় ছিল না। যে কারণেই হোক হত্যার দ্বারা, রক্তপাতের দ্বারা কোন মহৎ ভাবই পুষ্ট হতে পারে না। রুধির-পিপাসী মানুষ একটা সত্য ভুলে যায় যে অত্যাচার বীরত্ব নয়। টাঙ্গাইলে এই বীভৎস নাটক সকলের চোখের সামনে অভিনীত হয়েছিল বটে কিন্তু সেটা যে গর্হিত তা অনুভব করে বাংলাদেশ তার প্রচারের ডঙ্কা থেকে এর সুরটা নামিয়ে দিয়েছিল। তাই খুব কম লোকই জানে সেদিনকার ঘটনা। যাই হোক মুক্তিফৌজের চারিত্রিক অবনতির কথা শুনে আমরা বিমর্ষ মনে ফিরে এলাম। যেখানে দিনরাত ডাকাতি হচ্ছে সেখানে আশ্রম গড়বার বেআক্কেলে কাজ করবার ইচ্ছে ছিল না। তা সে নদী যতই সুন্দর হোক।

১৩ই ডিসেম্বর নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন। ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের মুক্তি হল। ১৪ই ডিসেম্বর একদল ধর্মান্ধ ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা অধ্যাপকদের ও অন্যান্য পরিচিত বিশিষ্ট লোকদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের ডেকে নিয়ে যায়। তাঁদের ডাকার পদ্ধতি এই রকম—

স্যার, একটু বাইরে আসবেন।

স্যার বাইরে এলেন।

গাড়িতে উঠুন স্যার। একটু যেতে হবে।

কোথায় ?

এই এইখানেই।

গাড়িতে উঠলেই তাঁদের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। এই ভাবে খুঁজে খুঁজে শিক্ষিত সমাজের উজ্জ্বল রত্নগুলিকে যেন গাছ থেকে সেরা ফল তুলে নেবার মত করে তারা তুলে নেয়। তার মধ্যে বহু লেখক, চিন্তাশীল উন্নতমনা মুসলিম ছিলেন, হিন্দুও ছিলেন। যাঁদের আর কোন হদিশই পাওয়া গেল না। সবসমেত তিনশো জ্ঞানীগুণী এইভাবে নিখোঁজ হয়।

ঢাকার এক উপকণ্ঠে বেশ কিছুদিন পরে তাঁদের গলিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। যাঁদের ধরে আনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে জাহির রায়হানের দাদা কাইজার ছিলেন। তাঁর শরীর সনাক্ত হয়নি।

ভ্রাতৃভক্ত জাহির রায়হানের বিশ্বাস হল যে, সে কোথাও আছে। হয়ত তাঁকে কোথাও বন্দী করে রাখা হয়েছে। খুব প্রগতিশীল প্রডিউসার বলে তাঁর খ্যাতি। তাঁর কথা আমি আগেই লিখেছি। তিনি আমার বাড়ির ক্যাম্পে যখন ছিলেন তখন তাঁর একটা অপ্রকাশিত ফিল্ম চুরি যাওয়াতে খুব গণ্ডগোল হয়েছিল। জাহির রায়হান খুব মুক্তমনা ছিলেন ও আধুনিক ছিলেন। নামাজ রোজার ধারও ধারতেন না। সেই তিনি ভাই এঁর শোকে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এবং ধর্মের পাঠগুলি সব পালন করতে লাগলেন। এটা আমার বড় আশ্চর্য লাগে। অনেক বারই দেখেছি, শোক দুঃখ প্রভৃতি তীব্র ইমোশনের কাছে বুদ্ধি পরাজিত হয়ে যায়। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে যা পেয়েছি তা কেন পরিত্যাগ করে? মানুষ কি এমন কোনখানে পৌঁছতে চায় যেখানে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা নেই? যেখানে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে যুক্তিতর্ক কিছুই বুঝি না, আমাকে আমার প্রার্থিত বস্তুটি দাও। অল্প বয়সে মনে করতুম এটা বুঝি মানুষের একটা বোকামি বা দুর্বলতা। এখন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হয়েছে, এখন বুঝি এও মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। মানুষের মন কখনও কখনও বলে ওঠে, রাতকে দিন করা যায় না তবে আজ এই ঘন অন্ধকারে আমার যে সেই প্রভাতটির বড় প্রয়োজন।

জাহির রায়হান ভাইয়ের জন্য পাগলের মত ঘুরত। কোন্‌খান থেকে একটা খবর পেয়ে সে মহম্মদ কিংবা মীরপুরে ছুটে গেল। ওইখানে বিহারী মুসলমানদের অনেকটা কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের মত করে রাখা হয়েছিল। এরকম কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প বাংলাদেশের অন্যত্রও হয়েছিল বিশেষত রংপুরে। জাহির রায়হান মীরপুরের ক্যাম্পে ঢুকেছিল, আর ফিরল না। এই সব ক্যাম্পে ইউরোপীয়ানরা কাজ করত ও বিহারীদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিল। একসময় তারা অত্যাচার করেছে বলেই সুযোগ পেলে আবার তাদের উপর অত্যাচার করা অবশ্যই সুস্থ বুদ্ধি নয়। তবু কেন যেন এই বদলা নেবার লিপ্সা শিক্ষিত সুসংস্কৃত মানুষের মনেও বাসা বেঁধে থাকে। একটু উস্‌কানি পেলেই তা দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।

আমি লিখেছি যশোরে পাঁজিয়া গ্রামে যাবার পথে একটি নৃশংস মানুষের

নৃশংসতার বর্ণনা শুনেছিলাম। সে বর্ণনা শুনলে হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে। কিন্তু সেই লোকটাকে ধরে ঠিক ওইভাবে টুকরো টুকরো করা যাক। এরকম অভীপ্সা কি শিক্ষিত লোকের হওয়া উচিত? বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই বিহারী অর্থাৎ উর্দুভাষী ইসলামপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী অর্থাৎ বাঙালী জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংঘর্ষ তো ছিলই। এতে সন্দেহ নেই যে ওই বিহারীরাই বার বার দাঙ্গা বাধিয়েছে। এবং দাঙ্গার সময় ওদের হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন প্রাণও দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাঁদের আদর্শটিই মনুষ্যত্বের বিজয়-কেতন হয়ে উঠবে।

এটাও সত্য যে, বর্তমান যুদ্ধকালে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা এত অত্যাচার করতে পারত না যদি না এই সব, 'বেহারী' মুসলমানেরা তাদের সাহায্য করত। বাঙালী ও হিন্দু নিধনে এদের অত্যুৎসাহের কথা কারো অজানা নেই। এই সব গোঁড়া ধর্মান্ধ মূর্খ মানুষগুলো কোন প্রগতির পথে পা বাড়াতে পারেনি। তাদের চিত্তের দৈন্যের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা মিশে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। কিন্তু তাই বলে শিক্ষিত মার্জিত উদারপন্থী বলে কথিত মানুষরাও যখন বলেন যে, প্রতিশোধ চাই, ক্ষমা নাই তখন তাঁরা সেই বহু পুরাতন কালের যুক্তি প্রয়োগ করেন। যখন বলা হয়েছিল,—**'an eye for an eye, a tooth for a tooth',** তারপরে মানুষ, মানুষ হবার জন্য আসল কথা বলেছেন। যেমন, 'শত্রুকে ক্ষমা কর। কেউ যদি তোমার জামাটা নেয় তবে তোমার চাদরটাও দিয়ে দাও।' এসব কথা সব দেশেই বহু যুগ ধরে গুরুরা ক্রমাগত বলেছেন। তবু যেন বার বারই বলা দরকার যাতে জিঘাংসা বৃত্তি উৎপাটিত হতে পারে। যখন বাংলাদেশের ছেলেরা বলত যে দেশে ফিরে গিয়ে বদলা নেবে তখন আমি শঙ্কিত হতাম। বেশ কিছু মিশনারি রঙপুরে কাজ করছিল, তারাও এই আশঙ্কা প্রকাশ করছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় সৈন্যরাও সজাগ ছিল। বাংলাদেশীরা বলত ভারতীয় সৈন্যরা বন্দীদের জামাই আদরে রেখেছে। আমি ভাবতুম প্রতিশোধ স্পৃহা যদি উগ্র হয়ে ওঠে তাহলে বাংলাদেশ এই রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে বিশ্বের যে সহানুভূতি লাভ করেছিল তা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে যে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে সম্মানলাভ করেছিল তা অধর্ম যুদ্ধ বলে অখ্যাতি লাভ করবে। "বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা? স্বর্গ কি হবে না কেনা?"

তাই এরা যতই বীর হোক প্রতিশোধের খাঁড়া নিয়ে আবার রক্ত প্রবাহিত

করলে স্বর্গ নয়, নরকই সৃষ্টি হবে। আমরা যখন এই সব কথা ভাবছিলাম তখন একজন কলকাতার বিখ্যাত কবি একদিন যশোরে বেড়াতে গিয়ে সেই নৃশংস লোকটার নৃশংস কাহিনী শুনে একটি নামী পত্রিকায় 'ক্ষমা নাই' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন। ঐ রকম নৃশংসতার বর্ণনা লেখা এবং ক্ষমা নাই উক্তি আমার ভাল লাগল না। আমার মনে হল এতে বদলা নেবার যুক্তি সমর্থন পাবে। তাই আমি একটি চিঠিতে প্রতিবাদ করলাম। যদিও আমি বুঝতে পারি ঐ ধরনের প্রবন্ধ কতটা ক্ষতি করতে পারে তা পূর্বাপর ধারণা না থাকাতেই তিনি লিখেছেন। তবুও আমার মনে হল কোন কবির কাছ থেকে এই ভাবটা অপ্রত্যাশিত। এমন কোন অবস্থাই আমি কল্পনা করতে পারি না যখন মানুষ ক্ষমা করতে পারবে না। আমার চিঠিখানি নিয়ে অনেক উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছিল। বেশীর ভাগই আমার বিপক্ষে। তাতে দুঃখ পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম বাঙালী ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের দেশে বসে এ রকম উগ্র, ক্রূর কথা ভাবতে পারে কি করে? বিশেষত যাঁরা সাহিত্য জগতের মানুষ। যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই আশ্চর্য গানে একটি মহৎ সত্যকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন—

"ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা···"

তখন কোনখান থেকে আমার স্বপক্ষে একটি কথা লক্ষ্য করতে পারিনি বলে হতাশ হয়ে ভেবেছিলাম ঐ কবিতা কি ব্যর্থ হয়েছে? সম্প্রতি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর একটি কবিতা দেখিয়ে বললেন তিনি ঐ বিতর্কের সময় একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি তখন যদি হাতে পড়ত তাহলে আমার তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি ঝরে পড়ত। চিঠিতে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, ঠিক সেই কথাই এই কবিতাতে কবির ভাষায় আরও অর্থবহ হয়েছে।

কে ভালবাসার দিকে তুলেছ বন্দুক
দূরে যাও
ভালবাসা ছাড়া কি আর দ্বিতীয় কোন উচ্চারণ
মানায় কবির কণ্ঠে
অস্ত্র নিয়েছিলে হাতে এই দৃশ্য দেখেছে সবাই
কিন্তু কে না জানে
লক্ষ্যের বিচারে সেও শুদ্ধ ভালবাসাই

ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম
যে নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জান।
এখন সমস্ত মিথ্যা।
কদর্য অক্ষরে লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।

এ কথাটিই আমি বাংলাদেশের ছেলেদের বোঝাতে চেয়েছিলুম যে তাদের বন্দুকের লক্ষ্য মানুষের মৃত ভালবাসা উদ্ধার। কিন্তু কতটুকুই বা আমার গলার জোর, কেই বা তাতে মন দেবে?

এই বই যখন শেষ হয়ে আসছে তখন লজ্জায় মাথা নত করে দেখছি আর একবার ভারতভূমি রক্তে ভাসছে। এক অতুলনীয়া নারীর রক্ত। ৬৭ বছরের বৃদ্ধা তাঁর আপন রক্ষকের হাতে নিহত হয়েছেন। যে নাকি ধর্মের নামে শপথ নিয়েছিল এই দুষ্কর্ম করবে। এই চূড়ান্ত নিমকহারামি মাতৃবধ যদি ধর্মের নামে করাই যায় তবে ধর্মের অর্থ কি? তবু এই মর্মবিদারী মৃত্যুর সামনেও কোন সুস্থ লোক বদলার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু অসুস্থ লোকের সংখ্যাই তো বেশী। তাই অল্পক্ষণের জন্যও সেই 'ক্ষমা নাই'-এর ভাব আবার দেখতে পেলাম। জানি না 'রাজর্ষি'র সেই ছোট্ট মেয়েটা কবে তার প্রশ্নের উত্তর পাবে, "এত রক্ত কেন?"

সমাপ্ত

41350

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

13 SEP 1987

পৃ: 206